অতসী মামি প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

অতসী মামি

রচনাকাল অনুসারে গল্পগুলি সাজানো হয়েছে। অতসী মামি আমার প্রথম রচনা। তারপর লেখার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেটা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

অতসী মামি

যে শোনে সেই বলে, হ্যাঁ, শোনবার মতো বটে!

বিশেষ করে আমাব মেজমামা। তাঁর মুখে কোনো কিছুর এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা খুব কম শুনেছি।

শুনে শুনে ভারী কৌতূহল হল। কী এমন বাঁশি বাজায় লোকটা যে সবাই এমনভাবে প্রশংসা করে? একদিন শুনতে গেলাম। মামার কাছ থেকে একটা পরিচয়পত্র সঙ্গে নিলাম।

আমি থাকি বালিগঞ্জে, আর যাঁর বাঁশি বাজানোব ওস্তাদির কথা বললাম তিনি থাকেন ভবানীপুর অঞ্চলে। মামার কাছে নাম শুনেছিলাম, যতীন। উপাধিটা শোনা হয়নি। আজ পবিচয়পত্রের উপরে পুরো নাম দেখলাম, যতীন্দ্রনাথ রায়।

বাড়িটা খুঁজে বার করে আমার তো চক্ষুস্থির! মামার কাছে যতীনবাবুর এবং তাঁর বাঁশি বাজানোর যে রকম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছিলাম তাতে মনে হয়েছিল লোকটা নিশ্চয় একজন কেষ্টবিষ্টু গোছের কেউ হবেন। আর কেষ্টবিষ্টু গোছের একজন লোক যে বৈকুণ্ঠ বা মথুরার রাজপ্রাসাদ না হোক, অন্তত বেশ বড়ো আব ভদ্রচেহারা একটা বাড়িতে বাস করেন এও তো স্বতঃসিদ্ধ কথা। কিন্তু বাড়িটা যে গলিতে সেটার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, এ যে ইট-বার করা তিনকালের বুড়োর মতো নড়বড়ে একটা ইটের খাঁচা! সামনেটার চেহারাই যদি এ রকম, ভেতরটা না জানি কী রকম হবে।

উইয়ে ধবা দরজাব কড়া নাড়লাম।

একটু পরেই দরজা খুলে যে লোকটি সামনে এসে দাঁড়ালেন তাঁকে দেখে মনে হল ছাইগাদা নাড়তেই যেন একটা আগুন বার হয়ে পড়ল।

খুব বোগা। গায়ের রঙও অনেকটা ফ্যাকাশে হযে গেছে। তবু একদিন চেহারাখানা কী রকম ছিল অনুমান করা শক্ত নয়। এখনও যা আছে, অপূর্ব!

বছর ত্রিশেক বয়স, কী কিছু কম? মলিন হয়ে আসা গায়ের রং অপূর্ব, শরীরের গড়ন অপূর্ব; মুখের চেহারা অপূর্ব! আর সব মিলিয়ে যে রূপ তাও অপূর্ব। সব চেয়ে অপূর্ব চোখ দুটি। চোখে চোখে চাইলে যেন নেশা লেগে যায়।

পুরুষেরও তা হলে সৌন্দর্য থাকে! ইট-বার-করা নোনা-ধরা দেয়াল আর উইয়ে-ধবা দরজা, তার মাঝখানে লোকটিকে দেখে আমার মনে হল ভারী সুন্দর একটা ছবিকে কে যেন অতি বিশ্রী একটা ফ্রেমে বাঁধিয়েছে।

বললেন, আমি ছাড়া তো বাড়িতে কেউ নেই, সুতরাং আমাকেই চান। কিন্তু কী চান?

আমার মুগ্ধ চিত্তে কে যেন একটা ঘা দিল। কী বিশ্রী গলার স্বর! কর্কশ! কথাগুলি মোলায়েম কিন্তু লোকটির গলার স্বর শুনে মনে হল যেন আমায় গালি দিচ্ছেন! ভাবলাম, নির্দোষ সৃষ্টি বিধাতার কুণ্ঠিতে লেখে না। এমন চেহারায় ওই গলা! সৃষ্টিকর্তা যত বড়ো কারিগর হোন, কোথায় কী মানায় সে জ্ঞানটা তাঁর একদম নেই।

বললাম, আপনার নাম তো যতীন্দ্রনাথ রায়? আমি হরেনবাবুর ভাগনে।

পরিচয়পত্রখানা বাড়িয়ে দিলাম।

এক নিশ্বাসে পড়ে বললেন, ইস! আবার পরিচয়পত্র কেন হে? হরেন যদি তোমার মামা, আমিও তোমার মামা। হরেন যে আমায় দাদা বলে ডাকে! এসো, এসো, ভেতরে এসো।

আমি ভেতরে ঢুকতে তিনি দরজা বন্ধ করলেন।

সদর দরজা থেকে দু-ধারের দেয়ালে গা ঠেকিয়ে হাত পাঁচেক এসে একটা হাত তিনেক চওড়া বারান্দায় পড়ে ডান দিকে বাঁকতে হল। বাঁদিকে বাঁকবার জো নেই, কারণ দেখা গেল সেদিকটা প্রাচীর দিয়ে বন্ধ করা।

ছোট্ট একটু উঠান, বেশ পরিষ্কার। প্রত্যেক উঠানের চারটে করে পাশ থাকে, এটারও তাই আছে দেখলাম। দুপাশে দুখানা ঘর, এ বাড়িরই অঙ্গ। একটা দিক প্রাচীর দিয়ে বন্ধ করা, অপর দিকে অন্য এক বাড়ির একটা ঘরের পেছন দিক, জানালা দরজার চিহ্নমাত্র নেই, প্রাচীরেরই শামিল।

আমার নবলব্ধ মামা ডাকলেন, অতসী, আমার ভাগনে এসেছে, এ ঘরে একটা মাদুর বিছিয়ে দিয়ে যাও। ও ঘরটা বড়ো অন্ধকার।

এ-ঘর মানে আমরা যে ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। ও-ঘর মানে ওদিককার ঘরটা। সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এক তরুণী, মস্ত ঘোমটায় মুখ ঢেকে।

যতীন মামা বললেন, এ কী! ঘোমটা কেন? আরে, এ যে ভাগনে!

মামির ঘোমটা ঘুচবার লক্ষণ নেই দেখে আবার বললেন, ছি ছি, মামি হয়ে ভাগনের কাছে ঘোমটা টেনে কলাবউ সাজবে?

এবার মামির ঘোমটা উঠল। দেখলাম, আমার নতুন পাওয়া মামিটি মামারই উপযুক্ত স্ত্রী বটে।

মামি এ-ঘরের মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে দিলেন। ঘরে তক্তপোশ, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদির বালাই নেই। একপাশে একটা রং-চটা ট্রাঙ্ক আর একটা কাঠের বাক্সো। দেয়ালে এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্যন্ত একটা দড়ি টাঙানো, তাতে একটি মাত্র ধুতি ঝুলছে। একটা পেরেকে একটা আধ ময়লা খদ্দরের পাঞ্জাবি লটকানো, যতীন মামার সম্পত্তি। গোটা দুই দু-বছর আগেকার ক্যালেন্ডারের ছবি। একটাতে এখনও চৈত্রমাসের তারিখ লেখা কাগজটা লাগানো রয়েছে, ছিঁড়ে ফেলতে বোধ হয় কারও খেয়াল হয়নি।

যতীন মামা বললেন, একটু সুজিটুজি থাকে তো ভাগনেকে করে দাও। না থাকে এক কাপ চাই খাবেখন।

বললাম, কিচ্ছু দরকার নেই যতীন মামা। আপনার বাঁশি শুনতে এসেছি, বাঁশির সুরেই খিদে মিটবে এখন। যদিও খিদে পায়নি মোটেই, বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি।

যতীন মামা বললেন, বাঁশি? বাঁশি তো এখন আমি বাজাই না।

বললাম, সে হবে না, আপনাকে শোনাতেই হবে।

বললেন, তা হলে বসো, রাত্রি হোক। সন্ধ্যার পর ছাড়া আমি বাঁশি ছুঁই না।

বললাম, কেন?

যতীন মামা মাথা নেড়ে বললেন, কেন জানি না ভাগনে, দিনের বেলা বাঁশি বাজাতে পারি না আজ পর্যন্ত কোনোদিন বাজাইনি। হ্যাঁ গা অতসী, বাজিয়েছি?

অতসী মামি মৃদু হেসে বললেন, না।

যেন প্রকাণ্ড একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেল এমনিভাবে যতীন মামা বললেন, তবে?

বললাম, মোটে পাঁচটা বেজেছে, সন্ধ্যা হবে সাতটায়। এতক্ষণ বসে থেকে কেন আপনাদের অসুবিধা করব, ঘুরে-টুরে সন্ধ্যার পর আসব এখন।

যতীন মামা ইংরেজিতে বললেন, Tut ! Tut ! তারপর বাংলায় যোগ দিলেন, কী যে বল ভাগনে! অসুবিধেটা কী হে অ্যাঁ! পাড়ার লোকে তো বয়কট করেছে অপবাদ দিয়ে, তুমি থাকলে তবু কথা কয়ে বাঁচব।

আমি বললাম, পাড়ার লোকে কী অপবাদ দিয়েছে মামা?

অতসী মামির দিকে চেয়ে যতীন মামা হাসলেন, বলব নাকি ভাগনেকে কথাটা অতসী? পাড়ার লোকে কী বলে জানো ভাগনে? বলে অতসী আমার বিয়ে করা বউ নয় !—চোখের পলকে হাসি মুছে রাগে যতীন মামা গরগর করতে লাগলেন, লক্ষ্মীছাড়া বজ্জাত লোক পাড়ার, ভাগনে! রীতিমতো দলিল আছে বিয়ের, কেউ কি তা দেখতে চাইবে? যত স—

ত্রস্তভাবে অতসী মামি বললে, কী যা-তা বলছ?

যতীন মামা বললেন, ঠিক ঠিক, ভাগনে নতুন লোক, তাকে এ সব বলা ঠিক হচ্ছে না বটে। ভারী রাগ হয় কিনা! বলে হাসলেন। হঠাৎ বললেন, তোমরা যে কেউ কারু সঙ্গে কথা বলছ না গো!

মামি মৃদু হেসে বললে, কী কথা বলব?

যতীন মামা বললেন, এই নাও! কী কথা বলবে তাও কি আমায় বলে দিতে হবে নাকি? যা হোক কিছু বলে শুরু কর, গড়গড় করে কথা আপনি এসে যাবে।

মামি বললে, তোমার নামটি কী ভাগনে?

যতীন মামা সশব্দে হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে বললেন, এইবার ভাগনে, পালটা প্রশ্ন কর, আজ কী রাঁধবে মামি? ব্যস, খাসা আলাপ জমে যাবে। তোমাব আরম্ভটি কিন্তু বেশ অতসী।

মামির মখ লাল হয়ে উঠল।

আমি বললাম, অমন বিশ্রী প্রশ্ন আমি কক্‌খনো করব না মামি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার নাম সুবেশ।

সতীন মামা বললেন, সুরেশ কিনা সুরের বাজা, তাই সুর শুনতে এত আগ্রহ। নয় ভাগনে?

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ইস! ভুবনবাবু যে টাকা দুটো ফেরত দেবে বলেছিল আজ! নিয়ে আসি, দুদিন বাজাব হযনি। বসো ভাগনে, মামির সঙ্গে গল্প করো, দশ মিনিটেব ভেতর আসছি।

ঘরের বাইবে গিয়ে বললেন, দোবটা দিয়ে যাও অতসী। ভাগনে ছেলেমানুষ, কেউ তোমার লোভে ঘরে ঢুকলে ঠেকাতে পারবে না।

মামিব মুখ আবক্ত হয়ে উঠল এবং সেটা গোপন কবতে চট করে উঠে গেল। বাইরে তার চাপা গলা শুনলাম, কী যে বসিকতা কব, ছি! মামা কী জবাব দিলেন শোনা গেল না।

মামি ঘরে ঢুকে বললে, ওই রকম স্বভাব ওঁব। বাক্‌সে দুটি মোটে টাকা, তাই নিয়ে সেদিন বাজার গেলেন। বললাম, একটা থাক। জবাব দিলেন, কেন? রাস্তায় ভুবনবাবু চাইতে টাকা দুটি তাকে দিয়ে খালি হাতে ঘবে ঢুকলেন।

আমি বললাম, আশ্চর্য লোক তো!

মামি বললে, ওই রকমই। আর দ্যাখো ভাই—

বললাম, ভাই নয়, ভাগনে।

মামি বললে, তাও তো বটে! আগে থাকতেই যে সম্বন্ধটা পাতিয়ে বসে আছ! ওঁব ভাগনে না হয়ে আমার ভাই হলেই বেশ হত কিন্তু। সম্পর্কটা নতুন করে পাতো না? এখনও এক ঘণ্টাও হযনি, জমাট বাঁধেনি।

আমি বললাম, কেন? মামি-ভাগনে বেশ তো সম্পর্ক!

মামি বললে, আচ্ছা তবে তাই। কিন্তু আমার একটা কথা তোমায় রাখতে হবে ভাগনে। তুমি ওঁর বাঁশি শুনতে চেয়ো না।

বললাম, তার মানে? বাঁশি শুনতেই তো এলাম!

মামির মুখ গম্ভীর হল, বললে, কেন এলে? আমি ডেকেছিলাম? তোমাদের জ্বালায় আমি কি গলায় দড়ি দেব?

আমি অবাক হয়ে মামির মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। কথা জোগায় না।

মামি বললে, তোমাদের একটু শখ মেটাবার জন্য উনি আত্মহত্যা করছেন দেখতে পাও না? রোজ তোমরা একজন না একজন এসে বাঁশি শুনতে চাইবে। রোজ গলা দিয়ে রক্ত পড়লে মানুষ কদিন বাঁচে!

রক্ত!

রক্ত নয়? দেখবে? বলে মামি চলে গেল। ফিরে এল একটা গামলা হাতে করে। গামলার ভেতরে জমাট-বাঁধা খানিকটা রক্ত।

মামি বললে, কাল উঠেছিল, ফেলতে মায়া হচ্ছিল তাই রেখে দিয়েছি। রেখে কোনো লাভ নেই জানি, তবু—

আমি অনুতপ্ত হয়ে বললাম, জানতাম না মামি। জানলে কক্‌খনো শুনতে চাইতাম না। ইস, এই জন্যেই মামার শরীর এত খারাপ?

মামি বললে, কিছু মনে করো না ভাগনে। অন্য কারও সঙ্গে তো কথা কই না, তাই তোমাকেই গায়ের ঝাল মিটিয়ে বলে নিলাম। তোমার আর কী দোষ, আমার অদৃষ্ট!

আমি বললাম, এত রক্ত পড়ে, তবু মামা বাঁশি বাজান?

মামি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, হ্যাঁ, পৃথিবীর কোনো বাধাই ওঁর বাঁশি বাজানো বন্ধ করতে পারবে না। কত বলেছি, কত কেঁদেছি, শোনেন না।

আমি চুপ করে রইলাম।

মামি বলে চলল, কতদিন ভেবেছি বাঁশি ভেঙে ফেলি, কিন্তু সাহস হয়নি। বাঁশির বদলে মদ খেয়েই নিজেকে শেষ করে ফেলবেন, নয়তো যেখানে যা আছে সব বিক্রি করে বাঁশি কিনে না খেয়ে মরবেন।

মামির শেষ কথাগুলি যেন গুমরে গুমরে কেঁদে ঘরের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমি কথা বলতে গেলাম, কিন্তু ফুটল না।

মামি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, অথচ ওই একটা ছাড়া আমার কোনো কথাই ফেলেন না। আগে আকণ্ঠ মদ খেতেন, বিয়ের পর যেদিন মিনতি করে মদ ছাড়তে বললাম সেইদিন থেকে ও জিনিস ছোঁয়াই ছেড়ে দিলেন। কিন্তু বাঁশির বিষয়ে কোনো কথাই শোনেন না।

আমি বলতে গেলাম, মামি—

মামি বোধ হয় শুনতেই পেল না, বলে চলল, একবার বাঁশি লুকিয়ে রেখেছিলাম, সে কী ছটফট করতে লাগলেন' যেন ওঁর সর্বস্ব হারিয়ে গেছে।

বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ হল। মামি দরজা খুলতে উঠে গেল।

যতীন মামা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, দিলে না টাকা অতসী, বললে পরশু যেতে।

পিছন থেকে মামি বললে, সে আমি আগেই জানি।

যতীন মামা বললেন, দোকানদারটাই বা কী পাজি, একপো সুজি চাইলাম, দিল না। মামার বাড়ি এসে ভাগনেকে দেখছি খালি পেটে ফিরতে হবে।

মামি ম্লান মুখে বললে, সুজি দেয়নি ভালোই করেছে। শুধু জল দিয়ে তো আর সুজি হয় না। ঘি নেই?

কবে আবার ঘি আনলে তুমি?

তাও তো বটে! বলে যতীন মামা আমার দিকে চেয়ে হাসলেন। দিব্য সপ্রতিভ হাসি।

আমি বললাম, কেন ব্যস্ত হচ্ছেন মামা, খাবারের কিছু দরকার নেই। ভাগনের সঙ্গে অত ভদ্রতা করতে নেই।

মামি বললে, বসো তোমরা, আমি আসছি। বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মামা হেঁকে বললেন, কোথায় গো?

বারান্দা থেকে জবাব এল, আসছি।

মিনিট পনেরো পরে মামি ফিরল। দু হাতে দুখানা রেকাবিতে গোটা চারেক করে রসগোল্লা, আর গোটা দুই সন্দেশ।

যতীন মামা বললেন, কোত্থেকে জোগাড় করলে গো? বলে, একটা রেকাবি টেনে নিয়ে একটা রসগোল্লা মুখে তুললেন।

অন্য রেকাবিটা আমার সামনে রাখতে রাখতে মামি বললে, তা দিয়ে তোমার দরকার কী?

যতীন মামা নিশ্চিন্তভাবে বললেন, কিছু না! যা খিদেটা পেয়েছে; ডাকাতি করেও যদি এনে থাক কিছু দোষ হয়নি। স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে সাধ্বী অনেক কিছুই করে।

আমি কুণ্ঠিত হয়ে বলতে গেলাম, কেন মিথ্যে—

বাধা দিয়ে মামি বললে, আবার যদি ওই সব শুরু কর ভাগনে, আমি কেঁদে ফেলব।

আমি নিঃশব্দে খেতে আরম্ভ করলাম।

মামি ও ঘর থেকে দুটো এনামেলের গ্লাসে জল এনে দিলেন।

প্রথম রসগোল্লাটা গিলেই মামা বললেন, ওযাক্! কী বিশ্রী রসগোল্লা! বইল পড়ে, খেয়ো তুমি, নয় তো ফেলে দিয়ো। দেখি সন্দেশটা কেমন!

সন্দেশ মুখে দিয়ে বললেন, হ্যাঁ এ জিনিসটা ভালো, এটা খাব। বলে সন্দেশ দুটো তুলে নিয়ে রেকাবিটা ঠেলে দিয়ে বললেন, যাও তোমার সুজির ঢিপি ফেলে দিয়োখন নর্দমায়।

অতসী মামির চোখ ছলছল করে এল। মামার ছলটুকু আমাদের কারুর কাছেই গোপন রইল না। কেন যে এমন খাসা রসগোল্লাও মামার কাছে সুজির ঢিপি হয়ে গেল বুঝে আমার চোখে প্রায় জল আসবার উপক্রম হল।

মাথা নিচু করে রেকাবিটা শেষ করলাম। মাঝখানে একবার চোখ তুলতেই নজরে পড়ল মামি মামার রেকাবিটা দরজার ওপরে তাকে তুলে রাখছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে মামি ঘরে ঘরে প্রদীপ দেখাল, ধুনো দিল। আমাদের ঘরে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে মামি চুপ করে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবতে লাগল।

যতীন মামা হেসে বললেন, আরে লজ্জা কীসের! নিত্যকার অভ্যাস, বাদ পড়লে রাতে ঘুম হবে না। ভাগনের কাছে লজ্জা করতে নেই।

আমি বললাম, আমি না হয়—

মামি বললে, বসো, উঠতে হবে না, অত লজ্জা নেই আমার। বলে, গলায় আঁচল দিয়ে মামার পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

লজ্জায় সুখে তৃপ্তিতে আরক্ত মুখখানি নিয়ে অতসী মামি যখন উঠে দাঁড়াল, আমি বললাম, দাঁড়াও মামি, একটা প্রণাম করে নিই।

মামি বললে, না না ছি ছি—

বললাম, ছি ছি নয় মামি! আমার নিত্যকার অভ্যাস না হতে পারে, কিন্তু তোমায় প্রণাম না করে যদি আজ বাড়ি ফিরি রাত্রে আমার ঘুম হবে না ঠিক। বলে মামির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম।

যতীন মামা হো হো করে হেসে উঠলেন।

মামি বললে, দ্যাখো তো ভাগনের কাণ্ড!

যতীন মামা বললেন, ভক্তি হয়েছে গো! সকালসন্ধ্যা স্বামীকে প্রণাম করো জেনে শ্রদ্ধা হয়েছে ভাগনের।

কী যে বল!—বলে মামি পলায়ন করল। বারান্দা থেকে বলে গেল, আমি রান্না করতে গেলাম।

যতীন মামা বললেন, এইবার বাঁশি শোনো।

আমি বললাম, থাকগে, কাজ নেই মামা। শেষে আবার রক্ত পড়তে আরম্ভ করবে।

যতীন মামা বললেন, তুমিও শেষে ঘ্যানঘ্যান প্যানপ্যান আরম্ভ করলে ভাগনে? রক্ত পড়বে তো হয়েছে কী? তুমি শুনলেও আমি বাজাব, না শুনলেও বাজাব। খুশি হয় রান্নাঘরে মামির কাছে বসে কানে আঙুল দিয়ে থাকো গে।

কাঠের বাক্সোটা খুলে বাঁশির কাঠের কেসটা বার করলেন। বললেন, বারান্দায় চলো, ঘরে বড়ো শব্দ হয়।

নিজেই বারান্দায় মাদুরটা তুলে এনে বিছিয়ে নিলেন। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে বাঁশিটা মুখে তুললেন।

হঠাৎ আমার মনে হল আমার ভেতরে যেন একটা উন্মাদ একটা খ্যাপা উদাসীন ঘুমিয়ে ছিল আজ বাঁশির সুরের নাড়া জেগে উঠল। বাঁশির সুর এসে লাগে কানে কিন্তু আমার মনে হল বুকের তলেও যেন সাড়া পৌঁছেছে। অতি তীব্র বেদনার মধুরতম আত্মপ্রকাশ কেবল বুকের মাঝে গিয়ে পৌঁছায়নি, বাইরের এই ঘরদোরকেও যেন স্পর্শ দিয়ে জীবন্ত করে তুলেছে, আর আকাশকে বাতাসকে মৃদুভাবে স্পর্শ করতে করতে যেন দূরে, বহুদূরে, যেখানে গোটা কয়েক তারা ফুটে উঠেছে দেখতে পাচ্ছি, সেইখানে স্বপ্নের মায়ার মধ্যে লয় পাচ্ছে। অন্তরে ব্যথা বোধ করে আনন্দ পাবার যতগুলি অনুভূতি আছে বাঁশির সুর যেন তাদের সঙ্গে কোলাকুলি আরম্ভ করেছে।

বাঁশি শুনেছি ঢের। বিশ্বাস হয়নি এই বাঁশি বাজিয়ে একজন একদিন এক কিশোরীর কুল মান লজ্জা ভয় সব ভুলিয়ে দিয়েছিল, যমুনাতে উজান বইয়েছিল। আজ মনে হল, আমার যতীন মামার বাঁশিতে সমগ্র প্রাণ যদি আচমকা জেগে উঠে নিরর্থক এমন ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তবে সেই বিশ্ববাঁশির বাদকের পক্ষে ওই দুটি কাজ আর এমন কী কঠিন!

দেখি, মামি কখন এসে নিঃশব্দে ওদিকের বারান্দায় বসে পড়েছে। খুব সম্ভব ওই ঘরটাই রান্নাঘর, কিংবা রান্নাঘরে যাবার পথ ওই ঘরের ভেতর দিয়ে।

যতীন মামার দিকে চেয়ে দেখলাম, খুব সম্ভব সংজ্ঞা নেই। এ যেন সুরের আত্মভোলা সাধক, সমাধি পেয়ে গেছে।

কতক্ষণ বাঁশি চলেছিল ঠিক মনে নেই, বোধ হয় ঘণ্টা দেড়েক হবে। হঠাৎ এক সময়ে বাঁশি থামিয়ে যতীন মামা ভয়ানক কাশতে আরম্ভ করলেন। বারান্দার ক্ষীণ আলোতেও বুঝতে পারলাম, মামার মুখ চোখ অস্বাভাবিক রকম লাল হয়ে উঠেছে।

অতসী মামি বোধ হয় প্রস্তুত ছিল, জল আর পাখা নিয়ে ছুটে এল। খানিকটা রক্ত তুলে মামির শুশ্রূষায় যতীন মামা অনেকটা সুস্থ হলেন। মাদুরের ওপর একটা বালিশ পেতে মামি তাঁকে শুইয়ে দিল। পাখা নেড়ে নীরবে হাওয়া করতে লাগল।

তারপর এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আজ আসি যতীন মামা।

মামা কিছু বলবার আগেই মামি বললে, তুমি এখন কথা কয়ো না। ভাগনের বাড়িতে ভাববে, আজ থাক, আর একদিন এসে খেয়ে যাবে এখন। চলো আমি দরজা দিয়ে আসছি।

সদরের দরজা খুলে বাইরে যাব, মামি আমার একটা হাত চেপে ধরে বললে, একটু দাঁড়াও ভাগনে, সামলে নিই।

প্রদীপের আলোতে দেখলাম, মামির সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। একটু সুস্থ হয়ে বললে, ওঁর রক্ত পড়া দেখলেই আমার এরকম হয়। বাঁশি শুনেও হতে পারে। আচ্ছা এবার এসো ভাগনে, শিগগিব আর একদিন আসবে কিন্তু।

বললাম, মামার বাঁশি ছাড়াতে পাবি কি না একবার চেষ্টা করে দেখব মামি?

মামি বাগ্রকণ্ঠে বললে, পাববে! পারবে তুমি? যদি পাব ভাগনে, শুধু তোমার যতীন মামাকে নয়, আমাকেও প্রাণ দেবে।

অতসী মামি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে।

বাস্তায় নেমে বললাম, খিলটা লাগিয়ে দাও মামি।

কেবলই মনে হয়, নেশাকে মানুষ এত বড়ো দাম দেয় কেন। লাভ কী? এই যে যতীন মামা পলে পলে জীবন উৎসর্গ করে সুরের জাল বুনবার নেশায় মেতে যান, মানি তাতে আনন্দ আছে। যে সৃষ্টি করে তাবও, যে শোনে তাবও। কিন্তু এত চড়া মূল্য দিযে কী সেই আনন্দ কিনতে হবে? এই যে স্বপ্ন সৃষ্টি, এ তো ক্ষণিকের। যতক্ষণ সৃষ্টি করা যায শুধু ততক্ষণ এব স্থিতি। তাবপর বাস্তবেব কঠোরতার মাঝে এ স্বপ্নেব চিহ্নও তো খুঁজে পাওয়া যায় না। এ নিরর্থক মায়া সৃষ্টি করে নিজেকে ভোলাবার প্রয়াস কেন? মানুষের মন কী বিচিত্র! আমাবও ইচ্ছে করে যতীন মামাব মতো সুরের আলোয় ভুবন ছেযে ফেলে, সুবেব আগুন গগনে বেযে তুলে পলে পলে নিজেকে শেষ করে আনি! লাভ নেই? নাই বা বইল।

এতদিন জানতাম, আমিও বাঁশি বাজাতে জানি। বন্ধুরা শুনে প্রশংসাও করে এসেছে। বাঁশি বাজিয়ে আনন্দও যে না পাই তা নয়। কিন্তু যতীন মামার বাঁশি শুনে এসে মনে হল, বাঁশি বাজানো আমার জন্যে নয়। এক একটা কাজ করতে এক একজন লোক জন্মায়, আমি বাঁশি বাজাতে জন্মাইনি। যতীন মামা ছাড়া বাঁশি বাজাবার অধিকাব কারও নেই।

থাকতে পাবে কারও অধিকার। কারও কারও বাঁশি হয়তো যতীন মামার বাঁশিব চেয়েও মনকে উতলা কবে তোলে, আমি তাদের চিনি না।

একদিন বললাম, বাঁশি শিখিয়ে দেবে মামা?

যতীন মামা হেসে বললে, বাঁশি কি শেখাবার জিনিস ভাগনে? ও শিখতে হয।

তা ঠিক। আর শিখতেও হয় মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, সমগ্র সত্তা দিযে। নইলে আমার বাঁশি শেখার মতোই সে শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়।

অতসী মামিকে সেদিন বিদায় নেবার সময় যে কথা বলেছিলাম সে কথা ভুলিনি। কিন্তু কী করে যে যতীন মামার বাঁশি ছাড়াব ভেবে পেলাম না। অথচ দিনের পর দিন যতীন মামা যে এই সর্বনাশা নেশায় পলে পলে মরণের দিকে এগিয়ে যাবেন এ কথা ভাবতেও কষ্ট হল। কিন্তু করা যায কী? মামির প্রতি যতীন মামার যে ভালোবাসা তার বোধ হয় তল নেই, মামির কান্নাই যখন ঠেলেছেন তখন আমার সাধ্য কী তাকে ঠেকিয়ে রাখি!

একদিন বললাম, মামা, আর বাঁশি বাজাবেন না।

যতীন মামা চোখ বড়ো বড়ো করে বললেন, বাঁশি বাজাব না? বল কী ভাগনে? তাহলে বাঁচব কী করে?

বললাম, গলা দিয়ে রক্ত উঠছে, মামি কত কাঁদে।

তা আমি কি করব? একটু-আধটু কাঁদা ভালো। বলে হাঁকলেন, অতসী! অতসী!

মামি এল।

মামা বললেন, কান্না কী জন্যে শুনি? বাঁশি ছেড়ে দিয়ে আমায় মরতে বল নাকি? তাতে কান্না বাড়বে, কমবে না।

মামি ম্লানমুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মামা বললেন, জানো ভাগনে, এই অতসীর জ্বালায় আমার বেঁচে থাকা ভার হয়ে উঠেছে। কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন, নড়বার নাম নেই। ওর ভার ঘাড়ে না থাকলে বাঁশি বগলে মনের আনন্দে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতাম। বেড়ানো-টেড়ানো সব মাথায় উঠেছে।

মামি বললে, যাও না বেড়াতে, আমি ধরে রেখেছি?

রাখোনি? বলে মামা এমনিভাবে চাইলেন যেন নিজের চোখে তিনি অতসী মামিকে খুন করতে দেখেছেন আর মামি এখন তাঁর সমুখেই সে কথা অস্বীকার করছে।

মামির চোখে জল এল। অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে বললে, অমন কর তো আমি একদিন—

মামা একেবারে জল হয়ে গেলেন। আমার সামনেই মামির হাত ধরে কোঁচার কাপড় দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললেন, ঠাট্টা করছিলাম, সত্যি বলছি অতসী,—

চট করে হাত ছাড়িয়ে মামি চলে গেল!

আমি বললাম, কেন মিথ্যে চটালেন মামিকে?

যতীন মামা বললেন, চটেনি। লজ্জায় পালাল।

কিন্তু একদিন যতীন মামাকে বাঁশি ছাড়তে হল। মামিই ছাড়াল।

মামির একদিন হঠাৎ টাইফয়েড জ্বর হল।

সেদিন বুঝি জ্বরের সতেরো দিন। সকাল নটা বাজে। মামি ঘুমুচ্ছে, আমি তার মাথায় আইসব্যাগটা চেপে ধরে আছি। যতীন মামা একটু টুলে বসে ম্লানমুখে চেয়ে আছেন। রাত্রি জেগে তাঁর শরীর আরও শীর্ণ হয়ে গেছে, চোখ দুটি লাল হয়ে উঠেছে। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, চুল উশকোখুশকো।

হঠাৎ টুল ছেড়ে উঠে মামা ট্রাঙ্কটা খুলে বাঁশিটা বার করলেন। আজ সতেরো দিন এটা বাক্সেই বন্ধ ছিল।

সবিস্ময়ে বললাম, বাঁশি কী হবে মামা?

ছেঁড়া পাম্পশুতে পা ঢুকোতে ঢুকোতে মামা বললেন, বেচে দিয়ে আসব।

তার মানে?

যতীন মামা ম্লান হাসি হেসে বললেন, তার মানে ডাক্তার বোসকে আর একটা কল দিতে হবে।

বললাম, বাঁশি থাক, আমার কাছে টাকা আছে।

প্রত্যুত্তরে শুধু একটু হেসে যতীন মামা পেরেকে টাঙানো জামাটা টেনে নিলেন।

যদি দরকার পড়ে ভেবে পকেটে কিছু টাকা এনেছিলাম। মিথ্যা চেষ্টা। আমার মেজো মামা কতবার কত বিপদে যতীন মামাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে চেয়েছেন, যতীন মামা একটি পয়সা নেননি। বললাম, কোথাও যেতে হবে না মামা, আমি কিনব বাঁশি।

মামা ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন, তুমি কিনবে ভাগনে? বেশ তো!

বললাম, কত দাম?

বললেন, একশো পঁয়ত্রিশে কিনেছি, একশো টাকায় দেব। বাঁশি ঠিক আছে, কেবল সেকেন্ড হ্যান্ড এই যা।

বললাম, আপনি না সেদিন বলছিলেন মামা, এ রকম বাঁশি খুঁজে পাওয়া দায়, অনেক বেছে আপনি কিনেছেন? আমি একশো পয়ঁত্রিশ দিয়েই ওটা কিনব।

যতীন মামা বললেন, তা কি হয়! পুরনো জিনিস—

বললাম, আমাকে কি জোচ্চোর পেলেন মামা? আপনাকে ঠকিয়ে কম দামে বাঁশি কিনব?

পকেটে দশ টাকার তিনটে নোট ছিল, বার করে মামার হাতে দিয়ে বললাম, ত্রিশ টাকা আগাম নিন, বাকি টাকাটা বিকেলে নিয়ে আসব।

যতীন মামা কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে নোটগুলির দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, আচ্ছা!

আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। যতীন মামার মুখের ভাবটা দেখবার সাধ্য হল না।

যতীন মামা ডাকলেন, ভাগনে—

ফিরে তাকালাম।

যতীন মামা হাসবার চেষ্টা করে বললেন, খুব বেশি কষ্ট হচ্ছে ভেব না, বুঝলে ভাগনে?

আমার চোখে জল এল। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে মামির শিয়রে গিয়ে বসলাম।

মামির ঘুম ভাঙেনি, জানতেও পারল না যে রক্তপিপাসু বাঁশিটা ঝলকে ঝলকে মামার রক্ত পান করেছে, আমি আজ সেই বাঁশিটা কিনে নিলাম।

মনে মনে বললাম, মিথ্যে আশা। এ যে বালির বাঁধ! একটা বাঁশি গেল, আর একটা কিনতে কতক্ষণ? লাভের মধ্যে যতীন মামা একান্ত প্রিয়বস্তু হাতছাড়া হয়ে যাবার বেদনাটাই পেলেন।

বিকালে বাকি টাকা এনে দিতেই যতীন মামা বললেন, বাড়ি যাবার সময় বাঁশিটা নিয়ে যেও।

আমি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললাম, থাক না এখন কদিন, এত তাড়াতাড়ি কীসের?

যতীন মামা বললেন, না। পরের জিনিস আমি বাড়িতে রাখি না। বুঝলাম, পরের হাতে চলে যাওয়া বাঁশিটা চোখের ওপরে থাকা তাঁর সহ্য হবে না।

বললাম, বেশ মামা, তাই নিয়ে যাবখন।

মামা ঘাড় নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, নিয়েই যেও। তোমার জিনিস এখানে কেন ফেলে রাখবে। বুঝলে না?

উনিশ দিনের দিন মামির অবস্থা সংকটজনক হয়ে উঠল।

যতীন মামা টুলটা বিছানার কাছে টেনে টেনে মামির একটা হাত মুঠো করে ধরে নীরবে তার রোগশীর্ণ ঝরা ফুলের মতো ম্লান মুখের দিকে চেয়েছিলেন. হঠাৎ অতসী মামি বললে, ওগো আমি বোধ হয় আর বাঁচব না।

যতীন মামা বললেন, তা কি হয় অতসী, তোমায় বাঁচতে হবেই। তুমি না বাঁচলে আমিও যে বাঁচব না?

মামি বললে, বালাই, বাঁচবে বইকী। দ্যাখো, আমি যদি নাই বাঁচি. আমার একটা কথা রাখবে?

যতীন মামা নত হয়ে বললেন, রাখব। বলো।

বাঁশি বাজানো ছেড়ে দিয়ো। তিলতিল করে তোমার শরীর ক্ষয় হচ্ছে দেখে ওপারে গিয়েও আমার শান্তি থাকবে না। রাখবে আমার কথা?

মামা বললেন, তাই হবে অতসী। তুমি ভালো হয়ে ওঠো। আমি আর বাঁশি ছোঁব না।

মামির শীর্ণ ঠোঁটে সুখের হাসি ফুটে উঠল। মামার একটা হাত বুকের ওপর টেনে শ্রান্তভাবে মামি চোখ বুজল।

আমি বুঝলাম যতীন মামা আজ তাঁর রোগশয্যাগতা অতসীর জন্য কত বড়ো একটা ত্যাগ করলেন। অতি মৃদুস্বরে উচ্চারিত ওই কটি কথা, তুমি ভালো হয়ে ওঠো, আমি আর বাঁশি ছোঁব না,

অন্যে না বুঝুক আমি তো যতীন মামাকে চিনি, আমি জানি, অতসী মামিও জানে ওই কথা কটির পেছনে কতখানি জোর আছে! বাঁশি বাজাবার জন্য মন উন্মাদ হয়ে উঠলেও যতীন মামা আর বাঁশি ছোঁবেন না।

শেষ পর্যন্ত মামি ভালো হয়ে উঠল। যতীন মামার মুখে হাসি ফুটল। মামি যেদিন পথ্য পেল সেদিন হেসে মামা বললেন, কী গো, বাঁচবে না বলে? অমনি মুখের কথা কি না! যে চাঁড়াল খুড়োর কাছ থেকেই তোমায় ছিনিয়ে এনেছি, যম ব্যাটা তো ভালোমানুষ।

আমি বললাম, চাঁড়াল খুড়ো আবার কী মামা?

মামা বললেন, তুমি জান না বুঝি? সে এক দ্বিতীয় মহাভারত।

মামি বললে, গুরুনিন্দা কোরো না।

মামা বললেন, গুরুনিন্দা কী? গুরুতর নিন্দা করব। ভাগনেকে দেখাও না। অতসী তোমার পিঠের দাগটা।

মামির বাধা দেওয়া সত্ত্বেও মামা ইতিহাসটা শুনিয়ে দিলেন। নিজের খুড়ো নয়, বাপের পিসতুতো ভাই। মা বাবাকে হারিয়ে সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত ওই খুড়োর কাছেই অতসী মামি ছিল। অত বড়ো মেয়ে, তাকে কিলচড় লাগাতে খুড়োটির বাধত না, আনুষঙ্গিক অন্য সব তো ছিলই। খুড়োর মেজাজের একটি অক্ষয় চিহ্ন আজ পর্যন্ত মামির পিঠে আছে। পাশের বাড়িতেই যতীন মামা বাঁশি বাজাতেন আর আকণ্ঠ মদ খেতেন। প্রায়ই খুড়োর গর্জন আর অনেক রাতে মামির চাপা কান্নার শব্দে তাঁর নেশা ছুটে যেত। নিতান্ত চটে একদিন মেয়েটাকে নিয়ে পলায়ন করলেন এবং বিয়ে করে ফেললেন।

মামার ইতিহাস বলা শেষ হলে অতসী মামি ক্ষীণ হাসি হেসে বললে, তখন কি জানি মদ খায়! তাহলে কক্‌খনো আসতাম না।

মামা বললেন, তখন কী জানি তুমি মাথার রতন হয়ে আঠার মতো লেপটে থাকবে! তাহলে কক্‌খনো উদ্ধার করতাম না। আর মদ না খেলে কি এক ভদ্রলোকের বাড়ি থেকে মেয়ে চুরি করার মতো বিশ্রী কাজটা করতে পারতাম গো! আমি ভেবেছিলাম, বছরখানেক—

মামি বললে, যাও, চুপ করো। ভাগনের সামনে যা তা বকো না।

মামা হেসে চুপ করলেন।

মাস দুই পরের কথা।

কলেজ থেকে সটান যতীন মামার ওখানে হাজির হলাম। দেখি, জিনিসপত্র যা ছিল বাঁধাছাঁদা হয়ে পড়ে আছে।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, এ সব কী মামা?

যতীন মামা সংক্ষেপে বললেন, দেশে যাচ্ছি।

দেশে? দেশ আবার আপনার কোথায়?

যতীন মামা বললেন, আমার কী একটা দেশও নেই ভাগনে? পাঁচশো টাকা আয়ের জমিদারি আছে দেশে, খবর রাখ?

অতসী মামি বললে, হয়তো জন্মের মতোই তোমাদের ছেড়ে চললাম ভাগনে। আমার অসুখের জন্যই এটা হল।

বললাম, তোমার অসুখের জন্য? তার মানে?

মামা বললেন, তার মানে বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছি। যিনি কিনেছেন পাশের বাড়িতেই থাকেন, মাঝখানের প্রাচীরটা ভেঙে দুটো বাড়ি এক করে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

আমি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললাম, এত কাণ্ড করলে মামা, আমাকে একবার জানালে না পর্যন্ত! কবে যাওয়া ঠিক হল?

বাঁধা বিছানা আর তালাবন্ধ বাক্সের দিকে আঙুল বাড়িয়ে মামা বললেন, আজ। রাত্রে ঢাকা মেলে রওনা হব। আমরা বাঙাল হে ভাগনে, জানো না বুঝি? বলে মামা হাসলেন। অবাক মানুষ! এমন অবস্থায় হাসিও আসে!

গম্ভীরভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আচ্ছা, আসি যতীন মামা, আসি মামি। বলে দরজার দিকে অগ্রসর হলাম।

অতসী মামি উঠে এসে আমার হাতটা চেপে ধরে বললে, লক্ষ্মী ভাগনে, রাগ কোরো না। আগে থাকতে তোমায় খবর দিয়ে লাভ তো কিছু ছিল না, কেবল মনে ব্যথা পেতে। যে ভাগনে তুমি, কত কী হাঙ্গামা বাধিয়ে তুলতে ঠিক আছে কিছু?

আমি ফিরে গিয়ে বাঁধা বিছানাটার ওপর বসে বললাম, আজ যদি না আসতাম, একটা খবরও তো পেতাম না। কাল এসে দেখতাম, বাড়িঘর খাঁখাঁ করছে।

যতীন মামা বললেন, আরে রামঃ! তোমায় না বলে কি যেতে পারি? দুপুরবেলা সেনের ডাক্তারখানা থেকে ফোন করে দিয়েছিলাম তোমাদের বাড়িতে। কলেজ থেকে বাড়ি ফিরলেই খবর পেতে।

বাড়ি আর গেলাম না। শিয়ালদহ স্টেশনে মামা-মামিকে উঠিয়ে দিতে গেলাম। গাড়ি ছাড়ার আগে কতক্ষণ সময় যে কী করেই কাটল! কারও মুখেই কথা নেই। যতীন মামা কেবল মাঝে মাঝে দু-একটা হাসির কথা বলছিলেন এবং হাসাচ্ছিলেনও। কিন্তু তাঁর বুকের ভেতর যে কী করছিল সে খবর আমার অজ্ঞাত থাকেনি।

গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা বাজলে যতীন মামা আর অতসী মামিকে প্রণাম করে গাড়ি থেকে নামলাম। এইবার যতীন মামা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আর বোধ হয় মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না।

জানালা দিয়ে মুখ বার করে মামি ডাকলে, শোনো। কাছে গেলাম। মামি বললে, তোমাকে ভাগনে বলি আর যাই বলি, মনে মনে জানি তুমি আমার ছোটো ভাই। পার তো একবার বেড়াতে গিয়ে দেখা দিয়ে এসো। আমাদের হয়তো আর কলকাতা আসা হবে না, জমির ভারী ক্ষতি হয়ে গেছে। যেও, কেমন ভাগনে?

মামির চোখ দিয়ে টপটপ করে জল ঝরে পড়ল। ঘাড় নেড়ে জানালাম, যাব।

বাঁশি বাজিয়ে গাড়ি ছাড়ল। যতক্ষণ গাড়ি দেখা গেল অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। দূরের লাল সবুজ আলোকবিন্দুর ওপারে যখন একটি চলন্ত লাল বিন্দু অদৃশ্য হয়ে গেল তখন ফিরলাম। চোখের জলে দৃষ্টি তখন ঝাপসা হয়ে গেছে।

মানুষের স্বভাবই এই যখন যে দুঃখটা পায় তখন সেই দুঃখটাকেই সকলের বড়ো করে দেখে। নইলে কে ভেবেছিল, যে যতীন মামা আর অতসী মামির বিচ্ছেদে একুশ বছর বয়সে আমার দুচোখ জলে ভরে গিয়েছিল সেই যতীন মামা আর অতসী মামি একদিন আমার মনের এক কোণে সংসারের সহস্র আবর্জনার তলে চাপা পড়ে যাবেন।

জীবনে অনেকগুলি ওলট-পালট হয়ে গেল। যথাসময়ে ভাগ্য আমার ঘাড় ধরে যৌবনের কল্পনার সুখস্বর্গ থেকে বাস্তবের কঠোর পৃথিবীতে নামিয়ে দিল। নানা কারণে আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ল। বালিগঞ্জের বাড়িটা পর্যন্ত বিক্রি করে ঋণ শোধ দিয়ে আশি টাকা মাইনের একটা চাকরি

নিয়ে শ্যামবাজার অঞ্চলে ছোটো একটা বাড়ি ভাড়া করে উঠে গেলাম। মার কাঁদাকাটায় গলে একটা বিয়েও করে ফেললাম।

প্রথম সমস্ত পৃথিবীটাই যেন তেতো লাগতে লাগল, জীবনটা বিস্বাদ হয়ে গেল, আশা-আনন্দের এতটুকু আলোড়নও ভেতরে খুঁজে পেলাম না।

তারপর ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে গেল। নতুন জীবনে রসের খোঁজ পেলাম। জীবনের জুয়াখেলায় হারজিতের কথা কদিন আর মানুষ বুকে পুষে রাখতে পারে?

জীবনে যখন এই সব বড়ো বড়ো ঘটনা ঘটছে তখন নিজেকে নিয়ে আমি এমনি ব্যাপৃত হয়ে পড়লাম যে কবে এক যতীন মামা আর অতসী মামির স্নেহ পরমসম্পদ বলে গ্রহণ করেছিলাম সে কথা মনে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে গেল। সাত বছর পরে আজ ক্বচিৎ কখনও হয়তো একটা অস্পষ্ট স্মৃতির মতো তাদের কথা মনে পড়ে।

মাঝে একবার মনে পড়েছিল, যতীন মামাদের দেশে চলে যাওয়ার বছর তিনেক পরে। সেইবার ঢাকা মেলে কলিশন হয়। মৃতদের নামের মাঝে যতীন্দ্রনাথ রায় নামটা দেখে যে খুব একটা ঘা লেগেছিল সে কথা আজও মনে আছে। ভেবেছিলাম একবার গিয়ে দেখে আসব, কিন্তু হয়নি। সেদিন আপিস থেকে ফিরে দেখি আমার স্ত্রীর কঠিন অসুখ। মনে পড়ে যতীন মামার দেশের ঠিকানায় একটা পত্র লিখে দিয়ে এই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম, ও নিশ্চয় আমার যতীন মামা নয়। পৃথিবীতে যতীন্দ্রনাথ রায়ের অভাব তো নেই। সে চিঠির কোনো জবাব আসেনি। স্ত্রীর অসুখের হিড়িকে কথাটাও আমার মন থেকে মুছে গিয়েছিল।

তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে আরও চারটে বছর কেটে গেছে।

আমার ছোটো বোন বীণার বিয়ে হয়েছিল ঢাকায়।

পুজোর সময় বীণাকে তারা পাঠালে না। অগ্রহায়ণ মাসে বীণাকে আনতে ঢাকা গেলাম। কিন্তু আনা হল না। গিয়েই দেখি বীণার শাশুড়ির খুব অসুখ। আমি যাবার আগের দিন হু হু করে জ্বর এসেছে। ডাক্তার আশঙ্কা করছেন নিউমোনিয়া।

ছুটি ছিল না, ক্ষুণ্ণ হয়ে একাই ফিরলাম। গোয়ালন্দে স্টিমার থেকে নেমে ট্রেনের একটা ইন্টারে ভিড় কম দেখে উঠে পড়লাম। দুটি মাত্র ভদ্রলোক, এক-কোণে র‍্যাপার মুড়ি দেওয়া একটি স্ত্রীলোক, খুব সম্ভব এঁদের একজনের স্ত্রী, জিনিসপত্রের একান্ত অভাব। খুশি হয়ে একটা বেঞ্চিতে কম্বলের ওপর চাদর বিছিয়ে বিছানা করলাম। বালিশ ঠেসান দিয়ে আরাম করে বসে, পা দুটো কম্বল দিয়ে ঢেকে একটা ইংরেজি মাসিকপত্র বার করে ওপেনহেমের ডিটেকটিভ গল্পে মনঃসংযোগ করলাম।

যথাসময়ে গাড়ি ছাড়ল এবং পরের স্টেশনে থামল। আবার চলল। এটা ঢাকা মেল বটে, কিন্তু পোড়াদ পর্যন্ত প্রত্যেক স্টেশনে থেমে থেমে প্যাসেঞ্জার হিসাবেই চলে। পোড়াদ-র পর ছোটোখাটো স্টেশনগুলি বাদ দেয় এবং গতিও কিছু বাড়ায়।

গোয়ালন্দের পর গোটা তিনেক স্টেশন পার হয়ে একটা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতে ভদ্রলোক দুটি জিনিসপত্র নিয়ে নেমে গেলেন। স্ত্রীলোকটি কিন্তু তেমনিভাবে বসে রইলেন।

ব্যাপার কী? একে ফেলেই দেখছি সব নেমে গেলেন। এমন অন্যমনস্কও তো কখনও দেখিনি! ছোটোখাটো জিনিসই মানুষের ভুল হয়, একটা আস্ত মানুষ, তাও আবার একজনের অর্ধাঙ্গ, তাকে আবার কেউ ভুল করে ফেলে যায় নাকি?

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম পিছনে দৃক্‌পাত-মাত্র না করে তাঁরা স্টেশনের গেট পার হচ্ছেন। হয়তো ভেবেছেন, চিরদিনের মতো আজও স্ত্রীটি তার পিছু পিছু চলেছে।

চেঁচিয়ে ডাকলাম ও মশায়—মশায় শুনছেন?

গেটের ওপারে ভদ্রলোক দুটি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বাঁশি বাজিয়ে গাড়িও ছাড়ল।

অগত্যা নিজের জায়গায় বসে পড়ে ভাবলাম, তবে কি ইনি একাই চলেছেন নাকি? বাঙালির মেয়ে নিশ্চয়ই, র‍্যাপার দিয়ে নিজেকে ঢাকবার কায়দা দেখেই সেটা বোঝা যায়। বাঙালির মেয়ে, এই রাত্রিবেলা নিঃসঙ্গ যাচ্ছে, তাও আবার পুরুষদের গাড়িতে!

একটু ভেবে বললাম, দেখুন, শুনছেন?

সাড়া নেই।

বললাম, আপনার সঙ্গীরা সব নেমে গেছে, শুনছেন?

এইবার আলোয়ানের পোঁটলা নড়ল, এবং আলোয়ান ও ঘোমটা সরে গিয়ে যে মুখখানা বার হল দেখেই আমি চমকে উঠলাম।

কিছু নেই, সে মুখের কিছুই এতে নেই। আমার অতসী মামির মুখের সঙ্গে এ মুখের অনেক তফাত। কিন্তু তবু আমার মনে হল, এ আমার অতসী মামিই!

মৃদু হেসে বললে, গলা শুনেই মনে হয়েছিল এ আমার ভাগনের গলা। কিন্তু অতটা আশা করতে পারিনি। মুখ বার করতে ভয় হচ্ছিল, পাছে আশা ভেঙে যায়।

আমি সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, অতসী মামি!

মামি বললে, খুব বদলে গেছি, না?

মামির সিঁথিতে সিঁদুর নেই, কাপড়ে পাড়ের চিহ্নও খুঁজে পেলাম না।

চার বছর আগে ঢাকা-মেল কলিশনে মৃতদের তালিকায় একটা অতি পরিচিত নামের কথা মনে পড়ল। যতীন মামা তবে সত্যিই নেই।

আস্তে আস্তে বললাম, খবরের কাগজে মামার নাম দেখেছিলাম মামি, বিশ্বাস হয়নি সে আমার যতীন মামা। একটা চিঠি লিখেছিলাম, পাওনি?

মামি বললে, না। তারপরেই আমি ওখান থেকে দু-তিন মাসের জন্য চলে যাই।

বললাম, কোথায়?

আমার এক দিদির কাছে। দূর সম্পর্কের অবশ্য।

আমায় কেন একটা খবর দিলে না মামি?

মামি চুপ করে রইল।

ভাগনের কথা বুঝি মনে ছিল না?

মামি বললে, তা নয়, কিন্তু খবর দিয়ে আর কী হত! যা হবার তা তো হয়েই গেল। বাঁশিকে ঠেকিয়ে রাখলাম, কিন্তু নিয়তিকে তো ঠেকাতে পারলাম না। তোমার মেজোমামার কাছে তোমার কথাও সব শুনলাম, আমার দুর্ভাগ্য নিয়ে তোমায় আর বিরক্ত করতে ইচ্ছে হল না। জানি তো, একটা খবর দিলেই তুমি ছুটে আসবে!

চুপ করে রইলাম। বলবার কী আছে। কী নিয়েই বা অভিমান করব? খবরের কাগজে যতীন মামার নাম পড়ে একটা চিঠি লিখেই তো আমার কর্তব্য শেষ করেছিলাম।

মামি বললে, কী করছ এখন ভাগনে?

চাকরি। এখন তুমি যাচ্ছ কোথায়?

মামি বললে, একটু পরেই বুঝবে। ছেলেপিলে কটি?

আশ্চর্য! জগতে এত প্রশ্ন থাকতে এই প্রশ্নটাই সকলের আগে মামির মনে জেগে উঠল!

বললাম, একটি ছেলে।

ভারী ইচ্ছে করছে আমার ভাগনের খোকাকে দেখে আসতে। দেখাবে একবার? কার মতো হয়েছে? তোমার মতো, না তার মার মতো? কত বড়ো হয়েছে?

বললাম, তিন বছর চলছে। চলো না আমাদের বাড়ি মামি, বাকি প্রশ্নগুলির জবাব নিজের চোখেই দেখে আসবে?

মামি হেসে বললে, গিয়ে যদি আর না নড়ি?

বললাম, তেমন ভাগ্য কি হবে! কিন্তু সত্যি কোথায় চলেছ মামি? এখন থাক কোথায়?

মামি বললে, থাকি দেশেই। কোথায় যাচ্ছি, একটু পরে বুঝবে। ভালো কথা, সেই বাঁশিটা কী হল ভাগনে?

এইখানে আছে।

এইখানে? এই গাড়িতে?

বললাম, হুঁ। আমার ছোটো বোন বীণাকে আনতে গিয়েছিলাম, সে লিখেছিল বাঁশিটা নিয়ে যেতে। সবাই নাকি শুনতে চেয়েছিল।

মামি বললে, তুমি বাজাতে জান নাকি? বার করো না বাঁশিটা?—

ওপর থেকে বাঁশির কেসটা পাড়লাম। বাঁশিটা বার করতেই মামি ব্যগ্র হাতে টেনে নিয়ে এক দৃষ্টিতে সেটার দিকে চেয়ে রইল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, বিয়ের পর এটাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছিলাম, মাঝখানে এর চেয়ে বড়ো শত্রু আমার ছিল না, আজ আবার এটাকে বন্ধু মনে হচ্ছে। শেষ তিনটা বছর বাঁশিটার জন্য ছটফট করে কাটিয়েছিলেন। আজ মনে হচ্ছে বাঁশি বাজানো ছাড়তে না বললেই হয়তো ভালো হত। বাঁশির ভেতর দিয়ে মরণকে বরণ করলে তবু শান্তিতে যেতে পারতেন। শেষ কটা বছর এত মনঃকষ্ট ভোগ করতে হত না।

বাঁশির অংশগুলি লাগিয়ে মামি মুখে তুলল। পরক্ষণে ট্রেনের ঝমঝমানি ছাপিয়ে চমৎকার বাঁশি বেজে উঠল। পাকা গুণীর হাতের স্পর্শ পেয়ে বাঁশি যেন প্রাণ পেয়ে অপূর্ব বেদনাময় সুরের জাল বুনে চলল।

আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। এ তো অল্প সাধনার কাজ নয়। যার তার হাতে বাঁশি তো এমন অপূর্ব কান্না কাঁদে না। মামির চক্ষু ধীরে ধীরে নিমীলিত হয়ে গেল। তার দিকে চেয়ে ভবানীপুরের একটা অতি ক্ষুদ্র বাড়ির প্রদীপের স্বল্পালোকে বারান্দার দেয়ালে ঠেস দেওয়া এক সুর-সাধকের মূর্তি আমার মনে জেগে উঠল।

মাঝে সাতটা বছর কেটে গেছে। যতীন মামার যে অপূর্ব বাঁশির সুর একদিন শুনেছিলাম, সে সুর মনের তলে কোথায় হারিয়ে গেছে। আজ অতসী মামির বাঁশি শুনে মনে হতে লাগল সেই হারিয়ে-যাওয়া সুরগুলি যেন ফিরে এসে আমার প্রাণে মৃদুগুঞ্জন শুরু করে দিয়েছে।

এক সময়ে বাঁশি থেমে গেল। মামির একটা দীর্ঘনিশ্বাস ঝরে পড়ল। আমারও।

কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বললাম, এ কথাটাও তো গোপন রেখেছিলে!

মামি বললে, বিয়ের পর শিখিয়েছিলেন। বাঁশি শিখবার কী আগ্রহই তখন আমার ছিল! তারপর যেদিন বুঝলাম বাঁশি আমার শত্রু সেইদিন থেকে আর ছুঁইনি। আজ কতকাল পরে বাজালাম। মনে হয়েছিল, বুঝি ভুলে গেছি!

ট্রেন এসে একটা স্টেশনে দাঁড়াল। মামি জানালা দিয়ে মুখ বার করে আলোর গায়ে লেখা স্টেশনের নামটা পড়ে ভেতরে মুখ ঢুকিয়ে বললে, পরের স্টেশনে আমি নেমে যাব ভাগনে।

পরের স্টেশনে! কেন?

মামি বললে, আজ কত তারিখ, জান?

বললাম, সতেরোই অঘ্রান।

মামি বললে, চার বছর আগে আজকের দিনে—বুঝতে পারছ না তুমি?

মুহূর্তে সব দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ হয়ে গেল। ঠিক! চার বছর আগে এই সতেরোই অঘ্রান ঢাকা মেলে কলিশন হয়েছিল। সেদিনও এমনি সময়ে এই ঢাকা মেলটির মতো সেই গাড়িটা শত শত নিশ্চিন্ত আরোহীকে পলে পলে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

বলে উঠলাম, মামি!

মামি স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললে, সামনের স্টেশনের অল্প ওদিকে লাইনেব ধারে কঠিন মাটির ওপর তিনি মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করেছিলেন। প্রত্যেক বছর আজকের দিনটিতে আমি ওই তীর্থদর্শন করতে যাই। আমার কাছে আর কোনো তীর্থের এতটুকু মূল্য নেই।

হঠাৎ জানালার কাছে সরে গিয়ে বাইরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে মামি বলে উঠল, ওই ওই ওইখানে! দেখতে পাচ্ছ না? আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তিনি যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে একটু স্নেহশীতল স্পর্শের জন্য ব্যগ্র হয়ে রয়েছেন। একটু জল, একটু জলের জন্যেই হয় তো!—উঃ মাগো, আমি তখন কোথায়!

দু-হাতে মুখ ঢেকে মামি ভেতরে এসে বসে পড়ল।

ধীরে ধীরে গাড়িখানা স্টেশনের ভেতর ঢুকল।

বিছানাটা গুটিয়ে নিয়ে আমি বললাম, চলো মামি, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

মামি বললে, না।

বললাম, এই রাত্রে তোমাকে একলা যেতে দিতে পারব না মামি।

মামির চোখ জ্বলে উঠল, ছিঃ! তোমার তো বুদ্ধির অভাব নেই ভাগনে। আমি কি সঙ্গী নিয়ে সেখানে যেতে পারি? সেই নির্জন মাঠে সমস্ত রাত আমি তাঁর সঙ্গ অনুভব করি, সেখানে কি কাউকে নিয়ে যাওয়া যায়! ওইখানের বাতাসে যে তাঁর শেষ নিশ্বাস রয়েছে! অবুঝ হয়ো না—

গাড়ি দাঁড়াল।

বাঁশিটা তুলে নিয়ে মামি বললে, এটা নিয়ে গেলাম ভাগনে! এটার ওপর তোমার চেয়ে আমার দাবি বেশি।

দরজা খুলে অতসী মামি নেমে গেলেন। আমি নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

আবার বাঁশি বাজিয়ে গাড়ি ছাড়ল। খোলা দরজাটা একটা করুণ শব্দ করে আছড়ে বন্ধ হয়ে গেল।

নেকি

পূর্ববঙ্গের মহকুমা শহর।

শহর সন্দেহ নেই, তবে বিশুদ্ধ নয়। গ্রামের খাদ আছে। চারিদিক ঘুরে এলে মনে হয় এ যেন শহর আর গ্রামেব আলিঙ্গনবদ্ধ মূর্তি।

বাজার আর আপিস অঞ্চলটুকু দিব্যি শহর। আপটুডেট বাজার,—কলকাতার কোনো নতুন ফ্যাসি জিনিস উঠলে এক মাসের ভেতরে স্থানীয় মনিহারি দোকানগুলিতে আত্মপ্রকাশ করে। একটি মাত্র বাঁধানো রাস্তা, মাইলখানেক লম্বা,—বাজারের বুক ভেদ করে, আদালতের গা ঘেঁষে গিয়ে মাটির রাস্তায় আত্মগোপন করেছে। বাজারের কাছে ছোটো ছোটো কয়েকটা শাখাও আছে।

বাজারেব কিছু দূরে পাকা রাস্তার ধারে একটি হাইস্কুল। কাছাকাছি পাবলিক লাইব্রেরি, টাউন হল, অফিসারদের ক্লাব, ক্লাব সংলগ্ন টেনিসকোর্ট ইত্যাদি। অভাব নেই কিছুরই। শহর যেমন হয় আর কি।

বাকিটুকু কিন্তু গ্রামছাড়া কিছু নয়। বাড়িঘর সবই প্রায় চাঁচের বেড়া এবং টিনের ছাদ দেওয়া। কোনো কোনোটার ভিটেটুকু মাত্র পাকা বাঁধানো। শুধু তাই নয়, গ্রামের যা প্রধান প্রধান লক্ষণ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আমকাঁঠালের বাগান পুকুর-ডোবা ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল বেতবন থেকে আরম্ভ করে সাপ, ব্যাঙ, শিয়াল, বেজি এবং টিকটিকির রাজসংস্করণ গোসাপ পর্যন্ত সমস্তই আছে।

শহরের পশ্চিমপ্রান্তে আগাগোড়া চুনকাম-করা একটি পাকা বাড়ি। বাড়িটা বরাবব স্থানীয় প্রথম মুনসেফ দখল করে থাকেন। এখন আছেন হেমন্ত মুখার্জি।

বাড়িটির পিছনে প্রকাণ্ড এক আমবাগান, তারই একদিকে ডোবাসংস্করণ একটি পুকুব। এ গল্পের আরম্ভ ওইখানে, একদিন বেলা প্রায় দশটার সময়।

ষোলো-সতেরো বছরের একটি মেয়ে স্নান করছিল। পুকুরের চারিদিকে প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া গাছপালার প্রাচীর। এত ঘন যে আট-দশহাতের ভেতরে এলেও বুঝতে পাবা যায় না এখানে পুকুর আছে। আশেপাশে বাড়িঘরও বেশি নেই,—একান্ত নির্জন। মেয়েটির শঙ্কা ছিল না, নিত্যকার মতো সমস্ত পুকুরটা সাঁতরে এসে নিশ্চিন্তচিত্তে অঙ্গমার্জনা করছিল। হঠাৎ ওপারে নজর পড়তে দেখল, বছর বাইশ তেইশের একটি ছেলে, চোখে সোনার চশমা, একটা আমগাছের গুঁড়ি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে।

ত্রস্তভাবে নিজেকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করে দিয়ে মেয়েটি সংযত হয়ে নিল। জড়োসড়ো হয়ে তেমনিভাবে গলা পর্যন্ত জলে ডুবে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবল, ভদ্রলোকের ছেলে, সরে যাবে।

ছেলেটির কিন্তু নড়বার লক্ষণ দেখা গেল না। তেমনিভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

রাগে বিরক্তিতে মেয়েটি ঠোঁট কামড়ে ধরল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে জল থেকে উঠে এল। তাবপর ধীরেপদে ছেলেটির কাছে এগিয়ে গেল।

ছেলেটি নিবিষ্টচিত্তে গাছের উপর কী দেখছিল, যেন পৃথিবীর আর কোনো দিকে তার লক্ষ নেই!

রাগে গা জ্বলে গেল। তিক্তস্বরে মেয়েটি বললে, দেখুন—

ছেলেটি চমকে তার দিকে তাকাল।

মেয়েটি বললে, এত দূর থেকে দেখতে আপনার বোধ হয় অসুবিধা হচ্ছে, ঘাটের পাড়েই চলুন না? আমার স্নানের এখনও বাকি আছে।

আমায় বলছেন?

দ্বিতীয় ব্যক্তি তো কাবুকে দেখছি না এখানে। আপনি ভদ্রলোকেব ছেলে, আপনাব যদি এ রকম প্রবৃত্তি—রাগে দুঃখে মেয়েটির কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল।

ছেলেটি অকৃত্রিম বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মেয়েটি আবাব বললে, আর একদিন আপনি উঁকি মারছিলেন, কিছু বলিনি, কিন্তু এ আপনার কোন দেশি ভদ্রতা? আপনার বাধে না, কিন্তু আমরা লজ্জায় মরে যাই। মানুষকে এত নীচ ভাবতেও যে কষ্ট হয়!

বিবর্ণ মুখে ছেলেটি বললে, এ সব আপনি কী বলছেন? আমি—

ন্যাকামি! ছেলেটিব মুখ দেখে মন একটু নরম হয়েছিল, এই ন্যাকামিতে আবার কঠিন হযে গেল। কটুকণ্ঠে বললে, অন্যায় বলেছি। দুচোখ বড়ো বড়ো করে দেখুন, আপনাকে আমি লজ্জা করব না। স্নানের সময় গোরু মহিষও তো মাঝে মাঝে জল খেতে আসে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল। পেছনে ব্যাকুল কণ্ঠ শোনা গেল, দাঁড়ান।

মেয়েটি ফিবে দাঁড়াল।

আমায বিশ্বাস কবুন, আপনি স্নান করছিলেন আমি তো দেখিনি। আর একদিনেব কথা বললেন, কিন্তু আমি কাল মোটে কলকাতা থেকে এখানে এসেছি। আশেপাশে যদি দু-একটা পাখি মেলে এই আশায় সকালে বন্দুকটা নিয়ে বেরিয়েছিলাম। একটা ঘুঘু এই দিকে উড়ে এসেছিল, কোথায বস্‌ল তাই দেখছিলাম, আপনাকে নয়।

হাতের বন্দুকটা দেখিয়ে বললে, এটা দেখে আপনার বিশ্বাস হওয়া উচিত।

পিছন ফিবে ঘাটের দিকে চলতে চলতে মেযেটি বললে, ন্যাকামি করবেন না, আমি কচি খুকি নই।

ছেলেটিব মুখ কালো হয়ে গেল। সকালবেলার উজ্জ্বল আলো পর্যন্ত যেন এক সুন্দবী তবুণীর দেওয়া কুৎসিত অপবাদেব ছাপে মলিন হয়ে উঠল।

ছেলেটি নিশ্বাস ফেলে সরে গেল। পলাতক ঘুঘুটা চোখের সামনে দিয়ে উড়ে গিয়ে কাছেই একটা ডালে বসল, বন্দুক তুলতে ইচ্ছা হল না। আঁকাবাঁকা সবু পথটি ধবে বাগান পার হয়ে খিড়কির দবজা দিয়ে সাদা বাড়িটায় ঢুকল। বন্দুকটা বড়ো ঘরেব কোণে ঠেস দিয়ে রেখে বিরস মুখে খাটেব একধারে বসে পড়ল।

মা বললেন, কী শিকার করলি বে অশোক?

অপবাদ।

অপবাদ?

হুঁঃ, বলে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অশোক বলে গাঁয়ের মেয়েগুলি ভারী ঝগড়াটে হয়, না মা?

কারু সঙ্গে ঝগড়া করে এলি নাকি?

অশোক বললে, আমায় করতে হয়নি, একাই করেছে। বাবু স্নান কবছিলেন, ঘুঘু খুঁজতে যেই পুকুরপাড়ে গেছি, জল থেকে উঠে এসে যা মুখে এল শুনিয়ে দিল। ওত পেতে ছিল বোধ হয়। বাপ্, থাকো তোমরা এখানে, কাল আমি কলকাতা চম্পট দিচ্ছি।

মা বললেন, কোন পুকুর? বাগানের ভেতরেরটা?

অশোক ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

তবে বোধ হয় হৃদয় মোক্তারের ভাগনি। খুব সুন্দর দেখলি?

দেখলাম? না দেখতেই যা শোনাল, দেখলে বোধ হয় খেয়েই ফেলত।

অশোকের ক্রুদ্ধ মুখের দিকে চেয়ে মা হেসে ফেললেন, না রে, ও খুব ভালো মেয়ে। দোষেব ভেতর একটু তেজি আর ঠোঁটকাটা।

অশোক বললে, হুঁঃ!

মা বললেন, মেয়েদের একটু তেজ থাকা ভালো রে, কাজ দেয়। অন্যায় ও মোটে সহ্য করতে পারে না।

অশোক বললে, জানি। খুব ন্যায়বান ও! কাল এলাম আমি এই জঙ্গলে, আর বলে কিনা আরেকদিন উঁকি মারছিলেন!

চিনতে পারেনি। নেকি তো প্রায়ই আসে আমার কাছে, চিনলেই দেখিস ক্ষমা চেয়ে নেবে।

নেকি? ওর নাম নেকি না কি?

হ্যাঁ, ছেলেবেলা নাকে কাঁদত বলে ওর পিসি ওই নাম রেখেছিল। মা হেসে ফেললেন।

অশোক বললে, নাকে কাঁদত? যে রকম বলছিল মা, আমি আব একটু হলে কেঁদে ফেলতাম।

আজও যে সন্ধ্যার পর কালবৈশাখী দেখা দেবে দুপুববেলার প্রচণ্ড গুমোট সে সত্যটা নিঃসংশয়েই জানিয়ে দিচ্ছিল। কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজ ভাপসা গবমে যেন সিদ্ধ করে দিচ্ছে। শুকনো খটখটে গরম বরং সহ্য হয়, এই ভিজে গরম এমন উৎকট লাগে।

বিছানায় শীতলপাটি বিছিয়েও অত্যধিক উত্তপ্ত হয়ে অশোক ঘামছিল। মা বাড়ি নেই, কাছেই এক মুনসেফের বাড়ি বেড়াতে গেছেন। রোদবৃষ্টিতে আর যা কিছু আটকাক মেয়েদেব বেড়ানোটা আটকায় না। ছোটো ভাই পুলকের সকালে স্কুল, আমবাগানে তার খোঁজ মিলতে পারে।

হাতের বইটা টেবিল লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিয়ে অশোক উঠে বসল। ভিজে তোয়ালে দিয়ে সর্বাঙ্গের ঘাম মুছে অর্ধোন্মুক্ত বাতায়ন পথে বাইরের গুমোট স্তব্ধ পৃথিবীর ওপর সূর্যালোকের নিষ্ঠুব অত্যাচারেব দিকে চেয়ে রইল।

দুপুরবেলা,—কিন্তু চারিদিকে গভীর রজনীর স্তব্ধতা ব্যাপ্ত হয়ে আছে। প্রকৃতির অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য যেন স্পর্শ করা যায়, অনুভূতির সীমার মাঝে যেন আপনি হাত বাড়িয়ে ধরা দিতে চায়। রাতদুপুরের যা নিজস্ব, আজ দিনদুপুরে চমৎকার মানিয়ে গেছে।

হঠাৎ চাপা দীর্ঘশ্বাসের মতো সামান্য একটু বাতাস বয়ে যেতেই ভেজানো দরজাটা মৃদু শব্দ করে খুলে গেল। মুখ ফিরিয়ে চাইতেই অশোক অবাক হয়ে দেখল খানদুই বই হাতে করে নেকি উঠান দিয়ে আসছে। ভিজে চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে, রোদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য শাড়ির আঁচলটুকু মাথায় তুলে দিয়েছে।

বড়ো ঘরে উঁকি মেরে অশোকের মাকে না দেখে মাসিমা বলে ডাক দিয়ে নেকি অশোকের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। বিছানার উপরের লোকটির দিকে নজর পড়তেই সে রীতিমতো চমকে উঠল।

আপনি! ও হ্যাঁ। ঠিক।

অশোক গম্ভীরভাবে বললে, মা বাড়ি নেই।

বাড়ি নেই? বই দুখানা ফেরত দিতে এসেছিলাম।

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি রেখে অশোক বললে, ও ঘরের টেবিলের ওপব রেখে যান।

নেকির যাবার লক্ষণ দেখা গেল না। সেইখানে দাঁড়িয়ে সপ্রতিভভাবে প্রশ্ন করলে, আপনি অশোকবাবু,--না?

হুঁ।

তাহলে কালকের ঘুঘুর কথাটা বিশ্বাস করতে হল।

নেকির মুখেব দিকে চেয়ে অশোক বললে, আমার সৌভাগ্য। বিশ্বাসটা হল কীসে? আমি অশোকবাবু বলে?

মৃদু হেসে নেকি বললে, হ্যাঁ। মাসিমার কাছে আপনার কথা এত শুনেছি যে, বিশ্বাস না করে উপায় নেই। আপনার আসবার কথা জানতাম, রাগের মাথায খেয়াল ছিল না। এখানকার কোনো ফাজিল ছোঁড়া মনে করেছিলাম আপনাকে।

বেশ করেছিলেন।

আপনি ভীষণ চটেছেন দেখছি।

অশোক কথা বললে না।

নেকি বললে, চটার কথাই। মিথ্যে অপবাদ কে আর সইতে পারে? আচ্ছা আমি হাত জোড় কবে ক্ষমা চাচ্ছি, তাহলে হবে তো?

হবে। কেউ বাড়ি নেই, বিকেলে এলে ভালো করতেন।

অর্থাৎ, আপনি এখন যান, এই তো?

অশোক নির্বিকার উদাসীনের কণ্ঠে বললে, সেই রকম মানেই তো দাঁড়ায়।

নেকিব মুখ ম্লান হয়ে গেল, কথা না খুঁজে পেযে বললে, তাড়িয়ে দিচ্ছেন?

না, না তাডাব কেন? অতখানি অভদ্রতা করতে পারি আপনার সঙ্গে? আমার বলবার উদ্দেশ্য— অশোক থেমে গেল।

উদ্দেশ্য?

উদ্দেশ্য মবুক। আসল কথা কী জানেন, আপনাকে আমি ভয করি। হয়তো বলে বসবেন, একলা পেয়ে আপনাকে আমি অপমান করেছি।

বাকিও তো রাখলেন না কিছু।

এ অপমান নয়, অন্যরকম।

অভদ্র উক্তি, কুৎসিত ইঙ্গিত! চারিদিকের নির্জনতা অন্যরকম অপমানের অর্থটাকে এমনই স্ফুটতব করে তুলল, যে অপমানে নেকির মুখ লাল হয়ে উঠল। বইদুটি মেঝেব ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললে, আপনি চাষা। নিজের মনে ময়লা থাকলে সমস্ত পৃথিবীটাকে কালো দেখায়। স্নানের ঘাটেই পরিচয় পেয়েছি। বলে ঝড়েব মতো চলে গেল।

মিথ্যা অপবাদের জ্বালা আছে, তাতে রাগ হওয়াটাও আশ্চর্য নয়। কিন্তু এইবার অশোক স্পষ্ট উপলব্ধি করল, সে ভুল করেছে। শ্রদ্ধা যার প্রাপ্য তাকে দিয়েছে অপমান। সে না হয় নজর দিতে যায়নি, কিন্তু অমন কি কেউ যায় না? বাঙালির মেয়ে, লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গিয়ে কোনো রকমে ক্ষুধিত দৃষ্টির সম্মুখ থেকে নিজের দেহটা সরিয়ে নিয়ে যায়। অমন মুখোমুখি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে কটি মেয়ে? ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত কবে কটি মেয়ে একান্ত নির্জনে একজন অপরিচিত যুবকের মুখের ওপর বলতে পারে, আপনি গোরু, মহিষ, আপনাকে আমি লজ্জা করব না! আজ তুচ্ছ আত্মাভিমানের বশে সেই মেয়েটিকেই সে অপমান করেছে। তাও সে যখন ক্ষমা চেয়েছে তখন।

বিকালে দুভাইকে খাবার দিয়ে মা বললেন, তোর নেকিদি দু দিন এল না কেন রে পুলক?

পুলক আমে কামড় দিয়েছিল, আমটা সরিয়ে সংক্ষেপে জবাব দিল, দাদা বকেছে। বলে আবাব আমটা মুখে তুলল।

দাদা বকেছে! সত্যি নাকি রে অশোক?

হুঁ।

আবার ঝগড়া হয়েছে তোদের? কী হয়েছিল?

অশোক বললে, পরশু তুমি বাড়ি ছিলে না, দুপুরবেলা বই হাতে করে এসে হাজির। যেমনি বলেছি মা বাড়ি নেই, বিকেলে আসবেন, যা মুখে এল বলে চলে গেল।

সবটুকু দোষ অশোক নির্বিকারে নেকির ঘাড়েই চাপিয়ে দিল। এমনি করে মানুষ নিজের অন্যায় করার জ্বালার সান্ত্বনা খোঁজে! বেদনা দেওয়া সহজ, আঘাত করা ততোধিক! কিন্তু অমন একটা সহজ কাজ কবেও সুখ মেলে না। সুন্দরী এবং তরুণী আর হাসিভরা মুখখানি যে কথার আঘাতে ম্লান করে দিয়েছিল, এই স্মৃতিটা কাঁটার মতো ব্রহ্মাগত বিঁধে চলে।

মা বললেন, কী ছেলেমানুষি যে তোরা করছিস অশোক। নেকি তো গায়ে পড়ে ঝগড়া করার মেয়ে নয়।

না। খুব ভালো মেয়ে!

রোদ পড়ে এলে পুলককে নিয়ে অশোক বেড়াতে বার হল। আমবাগানের পরেই বিস্তৃত মাঠ, আলে আলে পায়ে গড়ে ওঠা সবু পথটি দিয়ে চলতে তার এমনি ভালো লাগে। মাঝে মাঝে লাঙল দেওয়া খেতে নেমে পড়ে, মাটির ঢেলাগুলি পায়ের নীচে গুঁড়িয়ে যায়। খেতগুলি সমস্তদিন বৈশাখের বেহিসাবি সূর্যের তাপ চুবি করে সঞ্চিত করে রাখে, সূর্য বিদায় নিলে মৃদুভাবে সেই তাপ বিকীর্ণ করে। অশোক সর্বাঙ্গ দিয়ে সেটুকু অনুভর করে। চষা মাটির অস্পষ্ট সুবাস তার মনকে উদাস করে দেয়। পুলকের হাত ধবে চলতে চলতে অশোক ভাবে, এমনিভাবেই মাটি যেন নিজেকে চিনিয়ে দিতে চায়। নিশ্চল জড় যেন বলতে চায়, সারা জাগতেব জীবনের রস যোগাই আমি, আমায় চিনে রাখো!

মাঠের পরে বাড়ি থেকে মাইল খানেক তফাতে ছোটো একটা নদী, এখন স্রোত নেই। স্থানে স্থানে জল জমে আছে, বাকিটুকু বালিতে বোঝাই। সাদা ধবধবে বালি। এককালে স্রোতের নীচে ছিল, জলের গতি নিপুণ শিল্পীব মতো অপূর্ব নকশা এঁকে দিয়েছে। কোথাও বালির বুকে ঢেউয়ের ছবির হুবহু ছাপ পড়েছে, কোথাও বিচিত্র রেখার সমাবেশে সূক্ষ্ম আলপনা গড়ে উঠেছে। এমনি সূক্ষ্ম এমনি কোমল যে, দেখলে মনে হয় আঁকল কে? অশোক নিত্য এইখানে এসে বসে। পায়ের দাগে বালির কারুকার্য নষ্ট হয়ে যায়, অশোক ব্যথিত হয়ে ওঠে। অথচ ওই কারুকার্য শতকরা নিরানব্বই জনের চোখেই হয়তো পড়ে না। তুচ্ছ বলে নয়, সূক্ষ্ম সৌন্দর্য আবিষ্কার করবার মানুষের একটা বিপুল অক্ষমতা আছে বলে।

অশোক আজ সেইখানেই যাচ্ছিল। আমবাগানের ভেতরে একটা মোটা গাছের গুঁড়ি পাক দিতেই অশোক আর নেকি একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল। কাপড় গামছা নিয়ে নেকি স্নান করতে যাচ্ছিল, চোখাচোখি হতেই তার মুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠল। নিঃশব্দে একপাশে সরে গিয়ে সে অশোককে পথ দিল।

অশোক এগিয়ে গেল, কিন্তু পুলক নেকির সামনে দাঁড়িয়ে বললে, আর যে আমাদের বাড়ি যাও না নেকিদি? দাদা আর কিছু বলবে না, মা বকে দিয়েছে।

অশোক এগিয়ে গিয়েছিল, দাঁড়িয়ে ডাকল, পুলক আয়, দেরি হয়ে গেছে।

নেকি পুলককে কাছে টেনে নিয়ে কী বলতেই সে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। নেকির হাত থেকে গামছাটা টেনে নিয়ে বললে, তুমি যাও দাদা, আমি যাব না। নেকিদির সঙ্গে সাঁতার কাটব।

বেড়াতে যাবি না?

পুলক ঘাড় নেড়ে বললে, রোজ তো বেড়াই, আজ সাঁতার দেব। তুমিও এস না দাদা, তিনজনে সুইমিং রেস দেব, নেকিদির সঙ্গে পারবে না তুমি।

অশোক ধমক দিয়ে বললে, এই অবেলায় পচা ডোবায় স্নান করলে অসুখ হবে পুলক। এখন বেড়িয়ে আসি, কাল সকালে বড়ো পুকুরে সাঁতার কাটব।

পুকুরের ছোটো-বড়োত্বের জন্য পুলকের মাথা ব্যথা ছিল না, নেকিদির সঙ্গে সাঁতার দিতে পেলেই সে সুখী। নেকির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তার একটা হাত চেপে ধরে দাদার প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি জানিয়ে দিল। নেকি তার হাত ধরে পুকুরের দিকে অগ্রসর হল।

অশোক ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, এই অবেলায় ওকে যে পচা ডোবায় স্নান করবার জন্যে নাচালেন, অসুখ হলে দায়ি হবে কে?

মুখ না ফিরিয়ে নেকি জবাব দিল, আমি। ওর অভ্যাস আছে।

অভ্যাস আছে কী রকম? ও কি গেঁয়ো ভূত যে পচা ডোবায় স্নান করা অভ্যাস থাকবে?

গেঁয়ো ভূত না হোক, শহুরে বাবু নয়। বলে নেকি পুলককে নিয়ে মোটা আমগাছটার ওদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শহুরে বাবু! মেয়েটা শেষ পর্যন্ত তাকে শহুরে বাবু ঠাউরাল নাকি! নিতান্ত চটে যত দূর সম্ভব দূরে দূরে পা ফেলে হনহন করে বাগান পার হয়ে অশোক মাঠে পড়ল।

মাঠে বেড়ানোর আনন্দটুকু মাঠে মারা গেল। অশোক ভাবলে কী কুক্ষণেই মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল!

সন্ধ্যার অন্ধকার একটু অস্বাভাবিক রকম ঘন হয়ে এল। সেদিকে অশোকের নজর পড়ল না। নজর পড়লে নদীর চড়ায় বসে থাকবার মতো সাহস তার হত না।

ঈশান কোণের জমাট-বাঁধা কালো ছায়াটি যে রকম দ্রুতবেগে আকাশের অর্ধেকটা ঢেকে ফেললে তাতে আর অল্পক্ষণের ভেতরেই যে সমস্ত আকাশ ঢেকে ফেলবে সে বিষয়ে সন্দেহ করবার উপায় রইল না। হলও তাই। আকাশ যখন প্রায় সবটা ঢাকা পড়েছে তখন অশোক হঠাৎ ব্যাপারটা উপলব্ধি করল। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়ে দিল। যতবার শঙ্কিত দৃষ্টি তুলে আকাশের ভয়ানক কালো, ভয়ানক গম্ভীর মূর্তির দিকে চাইল ততবারই তার গতিবেগ বেড়ে গেল। নেকি তো নেকি, ঝড় শুরু হবার আগে কোনোরকমে বাড়ি পৌঁছানোর চিন্তা ছাড়া অন্য সব কথা তার মন থেকে বেমালুম লুপ্ত হয়ে গেল। এ সময় এক রকম নিতাকার ব্যাপার হলেও ইতিপূর্বে পূর্ববঙ্গের কালবৈশাখীর যে পরিচয় পেয়েছিল তাতে এই নির্জন মাঠে এই কালবৈশাখীর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াবার কল্পনা করেই সে ভয় পেয়ে গেল।

জমাট-বাঁধা অন্ধকারকে শিউরে দিয়ে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। অশোকের দ্রুত চলা দৌড়নোতে পরিবর্তিত হয়ে গেল।

অশোক পুরী গিয়েছিল, দূর থেকে সমুদ্রগর্জন কেমন শোনায় জানত। পিছন থেকে সেই রকম একটা অস্পষ্ট গর্জন কানে আসতেই সে বুঝতে পারল কালবৈশাখী তাড়া করে আসছে এবং তাকে ধরে ফেলতে মাত্র দু-তিন মিনিটের ওয়াস্তা।

হাঁফ ধরে গিয়েছিল। দৌড়ে বিশেষ লাভ নেই বরং উঁচু নিচু মাঠের ভেতর অন্ধকারে আছাড় খাওয়ার আশঙ্কা পুরো মাত্রায়। বাধ্য হয়ে দৌড়ানো বন্ধ করে অশোক দ্রুত চলা শুরু করল। আর একবার বিদ্যুৎ চমকাতে অশোক দেখলে আমবাগান তখনও পাঁচ-সাত মিনিটের পথ।

আমবাগান? ঝড় তো ধরে ফেলবে ঠিক, তখন আমবাগানের ভেতর দিয়ে যাওয়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? অশোকেব ইচ্ছা হল একবার থমকে দাঁড়িয়ে কথাটা ভালো করে চিন্তা করে নেয়। কিন্তু পিছনের গর্জনটা খুব কাছে এবং বেশি রকম স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেখে দাঁড়াবাব সাহস হল না। আর দ্বিতীয় পথের সন্ধান তো সে রাখে না! অন্যসময় ঘণ্টাখানেক ধরে খুঁজে অন্যদিক দিয়ে ঘুরে যাবার ভালো রাস্তা আবিষ্কার করা হয়তো সম্ভব হত, কিন্তু এখন সারারাত ধবে খুঁজলেও যে সে পথের খবর মিলবে না তা ঠিক। আমবাগান ছাড়া পথ নেই। কাঁচা পাকা ঢের ফল গাছগুলি খাইয়েছে, আজ যদি নিতান্তই চাপা দেয় কী আর করা যাবে!

পিছন থেকে মহাকলরব করতে করতে ঝড় এসে অশোককে এমনি জোরে ধাক্কা দিল যে, মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে কোনো রকমে সামলে নিল। আর জোরে চলবার চেষ্টা করবার প্রয়োজন হল না, বাতাসেই অশোককে ঠেলে নিয়ে চলল।

ঠিক যেন ভোজবাজি শুরু হয়ে গেল। চিরকাল মাথা উঁচু করেই আছে, কিন্তু গাছগুলি পর্যন্ত সটান শুয়ে পড়বার জন্য আকুলি-ব্যাকুলি শুরু কবে দিল। লাখখানেক ঢাকঢোল বাজিয়ে প্রকৃতি যেন বিদঘুটে রকমের ওয়ার-ডান্স আরম্ভ করে দিল, সব ভেঙে চুরমার করে ঠান্ডা হবে। মেঘেব সংযম রইল না, ফোঁটা ছেড়ে ধারাপাত আরম্ভ হয়ে গেল। সেই পতনশীল বাবিধারা নিয়ে পাগলা হাওয়া এমনি খেলা শুরু করে দিল যে, দেহের অনাবৃত অংশের স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে এবং বিদ্যুতের আলোতে দর্শনেন্দ্রিয় দিয়ে ভালো করে অনুভব করে অশোকের ইচ্ছে হতে লাগল সেই মাঠের ভেতবই মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে। ঝড়ের শব্দ তো আছেই, তার ওপরে আকাশে মেঘেদের অজস্র চকমকি ঠুকে আলো জ্বালাবার অবিশ্রাম চেষ্টায় ক্রমাগত যে আওয়াজ হতে লাগল তাতে অশোকের শ্রবণেন্দ্রিয় সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়বাব উপক্রম করল।

আমবাগানের শেষ প্রান্তে হৃদয় মোক্তারের বাড়ি, অশোকের পথ তার রান্নাঘরেব পাশ দিয়ে। চাঁচের বেড়ার গায়ে বসানো জানালার পাশে আসতেই সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠ শোনা গেল, অশোকবাবু দাঁড়ান। অশোক থমকে দাঁড়াল।

নেকি অশোকের প্রতীক্ষাতেই রান্নাঘরের জানালায় চোখ রেখে দাঁড়িয়েছিল, ডাক দিযেই বাইবে বেরিয়ে অশোকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বললে, গলা চিরে ডেকেছি, যে শব্দ! ভাবলাম বুঝি শুনতেই পাবেন না। ঘরে চলুন।

না। মা ভাববেন।

অশোকেব পথ আগলে দাঁড়িযে নেকি বললে, বাগানের ভেতর দিয়ে তো যাওয়া যাবে না, এর ভেতরেই তিন-চাবটা গাছ পড়ে গেছে শব্দ শুনেছি। দাঁড়াবেন না, আসুন।

অশোক তবু দ্বিধা করল, কিন্তু মা যে পাগল হয়ে উঠবেন।

নেকি ব্যাকুল হয়ে বললে, সে অল্পক্ষণের জন্য, কিন্তু যদি গাছ চাপা পডেন সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাবেন। বলে হাত জোড় করে বললে, অন্য সময় যত পারেন রাগ করবেন, আপনার পায়ে পড়ি, চলুন।

আকাশে বিদ্যুৎ চমকে গেল, সেই আলোতে নেকির মুখের যে ব্যাকুল ভাবটা অশোকের চোখে পড়ল তাতে আর দ্বিধা করবার অবকাশ রইল না। বললে, চলুন।

নেকি অশোককে পথ দেখিয়ে রান্নাঘরের পাশ দিয়ে উঠান পার হয়ে বড়ো ঘরের দাওয়ায় উঠল। দরজায় বাব থেকে শিকল লাগানো ছিল, ক্ষিপ্র হস্তে শিকল খুলে ফেললে। ঘরে প্রদীপ জ্বলছিল, দরজা খুলতেই বাতাসে নিভে গেল।

অশোককে হাত ধরে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে নেকি বললে, দাঁড়ান, আলো জ্বালছি। ঘরের একদিকের তাক হাতড়ে একটা ল্যাম্প নিয়ে এসে বললে, আপনার কাছে দেশলাই আছে?

না।

সিগারেট খান না?

না।

খুব ভালো ছেলে তো! নাঃ, আপনার সঙ্গে তা হলে পারা গেল না দেখছি। রান্নাঘরেই যেতে হল। থাকুন অন্ধকারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে। বলে নেকি বাইরে চলে গেল।

দেশলাই নিয়ে ফিরে এসে চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়েই বললে, হাত বাড়িয়ে দেশলাই নিয়ে আলোটা জ্বেলে ফেলুন অশোকবাবু! একবার তো দুজনেই খানিকটা করে জল ঢেলেছি, সর্বাঙ্গে যে রকম ধারা বইছে, এবার ঘরে ঢুকলে মেঝেতে নদী বয়ে যাবে।

নিকষ-কালো আঁধার, কিন্তু তারই ভেতর নেকির হাতের দুগাছি সোনার চুড়ি রান্নাঘরের অদৃশ্যপ্রায় আলোয় চিকচিক করছিল। দেশলাই নিয়ে অশোক একটা কাঠি জ্বালিয়ে বললে একেবারে ভিজে গেছেন যে!

সেটা উভয়ত, পরে দুঃখ করা যাবে, বাতিটা জ্বালুন।

আলো জ্বেলে অশোক বললে, মেঝেটা সত্যিই ভেসেছে।

তা হোক মুছে নিলেই হবে। আলনা থেকে লালপেড়ে শাড়িটা দিন। বাক্সো না খুললে আবার আপনার কাপড় জুটবে না।

অশোক শাড়িটা এনে দিলে। বারান্দার একদিকে একটু ঘেরা ছিল, শাড়ি নিয়ে নেকি সেখানে চলে গেল।

অশোকের জামা কাপড়ের অতিরিক্ত জলটুকু ইতিমধ্যে প্রায় সবটাই ঝরে গিয়েছিল, কিন্তু ভিজে জামার আলিঙ্গনটা বড়োই বিশ্রী লাগছিল। জামাটা খুলে হাতে নিয়ে নেকির প্রতীক্ষায় ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অশোক একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। প্রকাণ্ড ঘর। একপাশে দুটি বড়ো বড়ো খাট জোড়া লাগিয়ে পাতা রয়েছে। তাতে যে বিছানা আছে খাটের অর্ধেকটাও আবৃত করবার সাধ্য তার নেই। সেকেলে আসবাব, যেমন বিরাট তেমনি কদাকার। এক কোণে গোটা কুড়ি-পঁচিশ হাঁড়িকলসি তাতে সংসারের চাল-ডাল থাকে বোঝা গেল। পুরানো রংচটা একটা কাঠের আলনা, সোজা দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, হেলে পড়েছে। ফরসা, মলিন, আস্ত এবং ছেঁড়া নানা রকমের নতুন পুরাতন ধুতি শাড়ি শেমিজ যত্ন করে গোছানো রয়েছে। চাঁচের বেড়ার গায়ে বাঁশের পেরেকে একটা আয়না ঝুলছে, কাছেই একটা চিরুনি গোঁজা। আয়নার নিচে একটা টুল, তার কাছে হাতলভাঙা কাঠের চেয়ার। একটা আমকাঠের সিন্দুক একটা কোণের সবটুকু দখল করে আছে। মাথা নিচু করে অশোক খাটের নীচে উঁকি মারল। ধুলোয় মলিন বড়ো বড়ো পিতলের হাঁড়িকলসি ডেকচি ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে কুলো ধুচুনি পর্যন্ত সেখানে জমা হয়ে আছে।

সোজা হয়ে দাঁড়াতেই দরজার কাছে নেকি খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, ভূত দেখছিলেন না কি?

না বাঘ। অন্তত একটা শেয়াল যে খাটের নীচে—

চোখ তুলে অর্ধপথে সে থেমে গেল। মন থেকে রাগের জ্বালা নিঃশেষে মুছে গিয়েছিল, বিদ্বেষশূন্য দৃষ্টি তুলে লণ্ঠনের আলোতে সম্মুখের তরুণী নারীটির মুখের দিকে চেয়ে অশোক মুগ্ধ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে এসেছে, ভিজে চুল ভালো করে মোছা হয়নি। এক গোছা জলসিক্ত কুন্তল গালের পাশ দিয়ে লতিয়ে নেমে বুকের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। কপালে বিন্দু বিন্দু জল জমে আছে, আলো পড়ে মনে হচ্ছে কে যেন মেয়েটার কপাল বেড়ে মুক্তোর মালা পরিয়ে দিয়েছে। চোখের পাতা ভেজা, তার অন্তরাল হতে যে দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে তার যেন তুলনা নেই।

নেকি লাল হয়ে চোখ নত করলে হঠাৎ,—আচ্ছা তো আমি! ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছেন খেয়ালই নেই। বলে কাঠের সিন্দুকটার কাছে চলে গেল। ধোপদোরস্ত একখানা ধুতি এনে অশোকের হাতে দিয়ে ভিজে জামাটা নিয়ে বললে, কাপড় ছেড়ে ফেলুন, আমি আসছি। বলে বেরিয়ে গেল।

কাপড় ছেড়ে অশোক ডাকল, আসুন এবার।

নেকি এল। দরজা দিয়ে প্রথম থেকেই কিছুকিছু ছাঁট আসছিল। ঘরে এসে এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে নেকি দরজায় খিল লাগিয়ে দিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, আমাকে 'আপনি আপনি' করছেন এমন বিশ্রী লাগছে! এতটুকু সাহস নেই যে 'তুমি' বলেন?

অশোক বললে, সাহস আছে কিনা পরিচয় পাবে। ওটা কী হল? বলে রুদ্ধ দরজার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল।

নেকি বললে, এই সহজ কথাটা বুঝলেন না? ছাট আসছিল, বন্ধ করে দিলাম। মেঝেটা ভাসিয়ে দিয়ে তো লাভ নেই কিছু।

কিন্তু—

সে সব পরে বিবেচনা করা যাবে অশোকবাবু, আপনি কোঁচাব খুঁটটা গায়ে দিয়ে ভাঙা চেয়ারটাতে বসুন। আমাব নাম নেকি, কিন্তু ন্যাকামি দুচক্ষে দেখতে পাবি না। আপনাব সঙ্গে একা এক ঘরে যদি থাকতে পারি, দরজা খোলা-বন্ধয় বিশেষ আসবে যাবে না। খোলা থাকলে বরং ঘরটা ভিজবে।

অশোক বসে বললে, তুমিও বসো, কতকগুলি প্রশ্ন আছে।

খাটের কোনায বসে হাসিমুখে নেকি বললে, হুকুম করুন।

তুমি এখানে একা থাক?

নেকি হেসে উঠল,—তাই কি আপনি সম্ভব মনে করেন না কি? হাসি থামিয়ে বললে, থাকি তিনজনে, মামা পিসিমা আর স্বয়ং। মামা জমি দেখতে পরশুদিন মফস্বলে গেছেন, পিসি বিকেলে কাদের বাড়ি গিয়েছিল ঝড়ের জন্য আটকা পড়ে গেছে। যে আচমকা ঝড় এল আজ! আপনি ফিরছেন না দেখে আমার যা—ঝড়ের সময় মাঠের মাঝে ভারী ভয় হয় অশোকবাবু।

ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অশোক বললে, আমি চললাম।

নেকি বিস্মিত হয়ে বললে, কী হল আবার?

আমার মতো মূর্খ আর নেই। ছি ছি একবারও খেয়াল হল না।

কী হল বলুন না?

বুঝলে না? কেউ যদি হঠাৎ এসে পড়ে—সে ভারী বিশ্রী হবে, আমি যাই।

নেকি বললে, ভাববেন না, এই ঝড়ে কেউ আসবে না। যাবেনই বা কী করে?

না না তুমি বুঝছ না। তোমার কত বড়ো ক্ষতি হবে, জান?

নেকি দৃঢ়কণ্ঠে বললে, জানি, বসুন। সে ভয় করলে আপনাকে ডেকে আনতাম না। পাগল হয়েছেন, ভালো দিনে কেউ আসে না, আর ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে গোয়েন্দাগিরি করতে আসবে!

অশোক বসল। বললে, তোমার কিন্তু বেজায় সাহস। লোকে নাই জানুক, আমাকে তো একরকম জানই না, কী বলে ডেকে আনলে?

আপনাকে জানি না কে বললে?

আমি বলছি। এসেছি পাঁচদিন, দেখা হয়েছে তিনবার, তিনবারই ঝগড়া করেছি চেনবার সুযোগ পেলে কোথায়? পুকুরপাড়ে বরং—

নেকি খিলখিল করে হেসে উঠল। ওটা তার স্বভাব। বললে, পুকুরের ঘটনাটা ভোলেননি দেখছি।

না ভুলিনি। ঠাট্টা নয়, সত্যি বল কী করে চিনলে আমায়?

নেকি বললে, একজনকে চিনতে হলে তার সঙ্গে দু-চার বছর মিশবার দরকার হয় বলে মনে করেন নাকি আপনি? আমার সঙ্গে প্রথম থেকে যে অমনভাবে ঝগড়া করতে পারে তাকে ভয় করা আমি প্রয়োজন মনে করি না। বুঝলেন?

অশোক ঘাড় নেড়ে বললে, না।

তবে অন্যরকম করে বলি। আমাদের অনুভূতি বলে একটা জিনিস আছে অশোকবাবু, একবার দেখলেই আমরা মানুষকে চিনতে পারি। আর কি জানেন, মাসিমার ছেলেকে চিনবার দরকার হয় না।

নেকির কথায় তার মার প্রতি এমন একটা সহজ শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পেলে যে, অশোক খুশি হয়ে উঠল। একটু চুপ করে থেকে বললে, আচ্ছা নেকি, তোমার ভালো নামটা কী বলো তো?

নেকি নামটা পছন্দ হয় না? ও নামটা আমায় একেবারে মানায় না কী বলেন? আপনি না হয় আমাকে লীলা বলবেন।

লীলা? বেশ নাম।

সত্যি বেশ?

অশোক জবাব দিলে না, একটু হাসল।

হঠাৎ নেকি বললে, আপনার খিদে পেয়েছে? আম খাবেন?

অশোক ঘাড় নাড়ল।

আম খাবেন না? তাহলে কী দিই! কাল সন্দেশ করেছিলাম, গোটা চারেক আছে বোধ হয়, তাই খান তবে।

অশোক আবার ঘাড় নাড়ল।

ঘাড় নাড়ছেন যে খালি? ইচ্ছেটা কী?

ইচ্ছে কিছু না খাওয়া। বাড়ি থেকে যতদূর সাধ্য খেয়ে বার হয়েছিলাম, খিদে নেই।

নেকি মুখ গোঁজ করে বললে, হুঁ!

রাগ হল? আচ্ছা দাও, খাব।

থাক। খিদে না থাকলে খেতে নেই।

তৎক্ষণাৎ বললে, খিদে যেন পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। কী দেবে দাও, খেয়েনি।

নেকি হাসিমুখে খাবার নিয়ে এল। শুধু সন্দেশ নয়, আমও কেটে দিল। ঘরেই ছিল। কোণের কলসি থেকে জল গড়িয়ে দিল।

অশোক নিঃশব্দে আহারে মন দিল।

নেকি বললে, খেতে খেতে কথা বলুন, চুপ করে থাকতে ভালো লাগে না।

কী বলব?

যা খুশি।

যা খুশি নয়, অশোক নেকির কথাই পাড়ল। একটু একটু করে নেকির জীবনের যে ইতিহাস সে শুনল তাতে অবাক হয়ে গেল।

বড়োলোকের মেয়ে, কলকাতায় বাবার ব্যাবসা ছিল। মা কবে মারা গিয়েছিলেন, নেকির মনে নেই। পিসিই তাকে মানুষ কবেছে। কী সব কারণ ঘটেছিল নেকি জানে না, তার যখন ষোলো বছব বয়স, ব্যাবসা ফেল পডল। বাজারে দেউলিয়া নাম জাহির হবার আগেই বন্দুকের গুলিতে নিজের মাথাটা ফুটো করে দিয়ে নেকির বাবা সব দায় এড়িয়ে গেলেন। আপনার বলতে এই মামা, চোখ মুছতে মুছতে বছর দুই আগে পিসিকে নিয়ে এই মামাব আশ্রয়ে এল। পিছনে ফেলে এল আজন্ম-অভ্যস্ত শৌখিন জীবন।

—নতুন জীবনের ভয বাবার শোককে পর্যন্ত ছাপিয়ে উঠেছিল অশোকবাবু। পাডাগাঁ চক্ষে দেখিনি, পিসির কাছে শুনে দুচোখে খালি অন্ধকার দেখতে লাগলাম। গাঁয়ের মেয়েরা কীভাবে থাকে, ভোর পাঁচটায় উঠে গোবর দিয়ে কেমন করে ঘর নিকোয়, ডোবায় গিয়ে বাসন মাজে, লাউ-কুমড়োর চচ্চড়ি দিয়ে কেমন আরামে দুবেলা পেট ভরায়, পিসির কাছে লম্বা ফিরিস্তি শুনে মনে হয়েছিল, কাজ নেই বাবা বেঁচে থেকে, তার চেয়ে আপিং গুলে খাওয়া সহজ!

অশোক বললে, তারপর যখন সত্যি সত্যি এলে তখন কেমন লাগল?

নেকি বললে, এসে দেখলাম, ভয়েব কারণ নেই, ঘর নিকোবাব দবকাব হল না, বাসনও মাজতে হল না। রান্নার ভারটাও পিসিমা নিলেন। সেদিকে দিয়ে বিশেষ কষ্ট হল না, কিন্তু কপাল মন্দ, আমি আসার তিন মাসের ভেতরেই কয়েকটা মকদ্দমায় হেরে মামার অবস্থা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল। মামা অবশ্য বললেন না, অবস্থা বুঝে আমি নিজেই ঝিকে ছাড়িয়ে দিলাম। বুক বেঁধে একদিন যে ভয়ে আপিং খেতে ইচ্ছে হয়েছিল সেই গোবর-লেপা থেকে বাসন-মাজা পর্যন্ত সব কাজগুলি কবে ফেললাম। কোথায়ও কিন্তু বাধল না।

অশোক বললে, রান্নাটাও বোধ হয় এখন করতে হয়?

হ্যাঁ। পিসিমার বাতের শরীর, পারেন না।

ঝডেব বেগ কম পড়তেই নেকি বললে, আপনি এখন আসুন অশোকবাবু। একা ফেলে গেছে, পিসি হয়তো ঝড ঠেলেই এসে পড়বে। এ সামান্য ঝড়ে আর গাছ পড়বে না।

অশোক উঠে দাঁড়িয়ে বললে, পিসির আসার কথাই ভাবছ, আমি যদি সবাইকে বলে দিই সন্ধেটা কোথায় কাটিয়ে গেলাম?

নেকি হেসে বললে, ওইটুকু আপনি করতে পাবেন না, এই দু-ঘণ্টাব কথা সম্পূর্ণ গোপন থাকবে।

মাকে কিন্তু বলতে হবে।

তা তো হবেই, মাসিমাকে বলবেন বইকী! আমি অন্য লোকের কথা বলছিলাম। চলুন, আপনাকে বরং একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

অশোক হেসে বললে, তারপর তোমাকে কে এগিয়ে দিয়ে যাবে লীলা?

আমার দরকার হবে না, একাই আসতে পারব।

অশোক ঘরের বাইরে পা দিয়ে বললে, বাড়াবাড়ি কোরো না, আমি শিশু নই। দরজা দিয়ে বসো, এটুকু খুব যেতে পাবব।

আচ্ছা, আসুন তবে।

অশোক বাবান্দার সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাবে, নেকি বললে, বাড়ি গিয়েই কাপড় ছেড়ে ফেলবেন কিন্তু। দুবার ভিজতে হল, অসুখ না হয়।

আচ্ছা, বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে আবার উঠে এল। বললে তোমার ভয় করবে না তো? একটু একটু করবে। আর দাঁড়াবেন না, পিসি এলে ভারী মুশকিলে ফেলবে।

অশোক উঠানে নেমে গেল। নেকি চেঁচিয়ে বললে, আর একটা কথা অশোকবাবু, আপনাতে আমাতে সন্ধি তো?

উঠান থেকেই ঘাড় ফিবিয়ে অশোক বললে, সন্ধিপত্রের খসড়া করে রেখো সই করে দেব। বলে রান্নাঘরেব ওদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নেকি সেইখানে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। ঝড়েব বেগ কমেছিল কিন্তু বৃষ্টি সমভাবেই পড়ছিল। ছাঁট লেগে নেকির বসনপ্রান্ত ভিজে যেতে লাগল, কিন্তু সেদিকে তার খেয়ালই বইল না।

পরদিন সকালে অশোকেব জামা আর কাপড় হাতে করে যেতেই অশোকেব মা নেকিকে জড়িয়ে ধবে চুমো খেলেন। বললেন, বাগানের এক একটা গাছ-পড়ার শব্দ শুনছিলাম আর আমার বুকের পাঁজব যেন ভেঙে যাচ্ছিল মা। যে ছেলে, তুই না ডাকলে ওই বাগানের ভেতর দিয়েই আসত।

সুখে তৃপ্তিতে লজ্জায় নেকির মুকখানি আরক্ত হয়ে উঠল। মাথা নত কবল।

মা বললেন, বোস, খাবাব খেয়ে যাবি। ঠাকুরকে ভাঁড়াবটা বাব করে দিয়ে আসি। বলে চলে গেলেন।

আপনার জামার পকেটে এই কাগজপত্রগুলি ছিল অশোকবাবু। ভিজে চুপসে গেছে।

অশোক কাগজগুলি নিয়ে বললে, মনিব্যাগটা।

মনিব্যাগ? মনিব্যাগ তো ছিল না!

ছিল না কী বকম? কাগজ রইল, ব্যাগ উড়ে গেল?

নেকি হেসে ফেললে, যতই করুন অশোকবাবু, আর ঝগড়া বাধবে না, সন্ধি হয়ে গেছে। ঠাট্টা নয়, বেশি টাকা ছিল না কি?

না, গোটা পাঁচেক। দৌড়বাব সময মাঠে পড়েছিল। বুঝেছিলাম, তুলে নেবার সুযোগ হয়নি। ভালোই হয়েছে, সাবেব কাজ দেবে।

তা দেবে, টাকার মতো সাব আর নেই।

মাসখানেক কেটে গেছে।

সকালবেলা মা চা কবছিলেন, ঝরাফুলের মতো পবিম্লান মূর্তি নিযে নেকি এসে তাব গা ঘেঁষে বসে পড়ল।

মা বললেন, জ্বর ছেড়েছে? উঠে এলি যে?

জ্বর নেই। আমায় এক কাপ চা দিও মাসিমা।

এখনও খাসনি কিছু?

নেকি ঘাড় নাড়ল।

তবে আগে একটু দুধ খেয়ে নে, তারপর চা খাস। দুদিনের জ্বরে কী চেহারাই হয়েছে মেয়ের!

স্টোভেব ওপব কড়ায় দুধ জ্বাল হচ্ছিল, বাটিতে ঢেলে নেকির সামনে ধরলেন।

অশোক বললে, তিন-চারবার করে পচা ডোবায় স্নান করলে জ্বর হবে না?

নেকি বললে, প্রথম দিন থেকেই ও-পুকুবে স্নান কবাটা আপনাব চক্ষুশূল হয়েছে দেখছি!

কী মুশকিল! এ মেয়েটা প্রথম দিনের সেই ঘটনাটুকু নিজেও ভুলবে না, অশোককেও ভুলতে দেবে না।

মা কী কাজে উঠে যেতেই বাটির দুধ প্রায় সবটা কড়ায় ঢেলে দিয়ে চোখ কান বুজে বাকিটুকু নেকি উদরস্থ করে ফেললে। চায়ের কাপ তুলে নিয়ে বললে, দুধ তো না, বিষ!

তাই দেখছি। মাকে বলতে হবে।

না লক্ষ্মী, বলবেন না। এক্ষুনি একবাটি দুধ গিলিয়ে দেবেন।

ভালোই তো!

ভালো বইকী! চায়ের কাপটা শেষ করে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে, মার আসবার আগেই পালাই তাহলে।

অশোক বললে, না বসো, বলব না।

রাঁধতে হবে, পিসিমার অসুখ।

এই শরীরে রাঁধবে?

না রাঁধলে চলবে কেন? মামা দুদিন হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেয়েছেন। ওই যা, আসল কথাই ভুলে গেছি। বিকালে আপনার আম খাবার নেমন্তন্ন রইল, পুলককে নিয়ে যাবেন। বলে নেকি চলে গেল।

বিকালে প্রায় ছটার সময় পুলককে সঙ্গে নিয়ে অশোক আম খাবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেল। হৃদয় চক্রবর্তী একগাল হেসে অভ্যর্থনা করলেন। কী সৌভাগ্য—কথাটাই উচ্চারণ করলেন বার কুড়ি।

চক্রবর্তীর বয়স নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মাথার চুলে পাক ধরেছে। চুল বলা সংগত নয়, কদমফুলের পাপড়ি। মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল। হাসবার উপক্রম করলেই সেই জঙ্গল ফাঁক হয়ে তামাকের ধোঁয়ার বিবর্ণ কতকগুলি দাঁত আত্মপ্রকাশ করে। এমনি অতিরিক্ত বিনয় প্রকাশ করতে লাগলেন যে, সেগুলি প্রকাশ হয়েই রইল।

বড়ো ঘরের বারান্দায় সেই ভাঙা চেয়ার আর টুলখানা পাতা হয়েছিল, অশোক আর পুলককে বসিয়ে চক্রবর্তী নিজে একটা পিঁড়ি দখল করে উবু হয়ে বসে ডাকলেন, নেকি!

নেকি ভেতর থেকে সাড়া দিল, আম কেটে নিয়ে যাচ্ছি মামা।

দু-থালা বোঝাই আম দুজনের সামনে ধরে দিতেই অশোক বললে, এ কী ব্যাপার! এত আমি খাব কী করে?

চক্রবর্তী মাথা নেড়ে বললেন, কিছু না কিছু না। যুবাকাল, লোহা পেটে পড়লে হজম হয়ে যাবে। খান, লজ্জা করবেন না। আপনার মাঠাকুরুন নেকিকে স্নেহ করেন তাই, নইলে আমাদেব মতো লোকের বাড়ি আপনাকে খেতে বলা—সাহসই হত না!

নেকি মুচকে হেসে ভেতবে চলে গেল।

কী যে বলেন! বলে অশোক একটা আম মুখে তুলে নিলে। বললে, খা পুলক, উনি যখন ছাড়বেন না, যা পারি খাই, বাকি নষ্ট হবে।

চক্রবর্তী মোক্তার মানুষ বকতে পারেন, আসর সরগরম করে রাখলেন। অশোক কখনও হুঁ দিয়ে কাজ সারতে লাগল, কখনও বললে, নিশ্চয়! কখনও মৃদু হেসে বললে তা-বইকী! বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করে চক্রবর্তী কলিকালের লোকের ধর্মজ্ঞানহীনতা এবং উৎকট লোভ-পরায়ণতার কথা কীর্তন করলেন। বললেন, আদালতে এত মামলা মকদ্দমা কী জন্যে মশায়? ওই লোভ! মিথ্যে সাক্ষী তৈরি করে কার দুবিঘে জমি আছে তাই আত্মসাৎ করবার চেষ্টা! কেনরে বাপু? পরের জিনিস নিয়ে টানাটানি কেন? নিজের যা আছে তাই নেড়ে-চেড়ে খা না!

অশোক ঘাড় নেড়ে সায় দিলে, তা বইকী!

এইবার চক্রবর্তীর এই চিন্তার উৎসমুখের সন্ধান পাওয়া গেল। একটা পাজি লোক তাঁর পাঁচ বিঘে জমি যে কীরকমভাবে আত্মসাৎ করবার উপক্রম করেছে এবং অশোকের বাবার কাছেই মিথ্যে

দাবির মকদ্দমা রুজু করেছে, সবিস্তার বর্ণনা করে চক্রবর্তী ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললেন। শুনে অশোক আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করলেন।

থালা অর্ধেক খালি করে ঠেলে দিতেই চক্রবর্তী হাত জোড় করলেন। অশোক ব্যস্ত হয়ে বললে, ও কী? ও কী? সত্যি বলছি আর খাবার ক্ষমতা নেই, নইলে ফেলে রাখতাম না।

লোকটার প্রতি অশ্রদ্ধায় অশোকের অন্তর পূর্ণ হয়ে গেল। বাপের বয়সি ভদ্রলোক, বিনয়ের ছলে নিজেকে ক্রমাগত হীন করে ফেলছেন দেখে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করলে।

জোড়হাতেই চক্রবর্তী নিবেদন করলেন, তবে দুটি সন্দেশ মুখে দিন। বলে হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে হাঁকলেন, নেকি! নেকি!

নেকি নিঃশব্দে চৌকাঠের কাছে এসে দাঁড়াল।

দুটো আম ফেলে দিলেই হবে? একী হেঁজিপেঁজি লোক পেয়েছিস! বাপের তো টাকা ছিল, এটুকু শিক্ষাও হয়নি? সন্দেশগুলো কি তোর জন্যে এনেছি নাকি?

চারটে প্রশ্ন। নেকি নতমুখে শুধু সন্দেশের সংবাদটাই দিল, সন্দেশ নেই!

নেই? কী হল? পাখা গজিয়েছে?

আছে, দেওয়া যাবে না। হাঁড়ি ভেঙে সন্দেশ মাটিতে পড়ে গিয়েছিল।

হাঁড়ি ভাঙল কেন?

তাকের ওপর ছিল, বেড়ালে ফেলে দিয়েছে।

হুঁ! বলে চক্রবর্তী স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

অশোক হেসে বললে, বেড়াল ভালো কাজ করেছে, এর ওপর সন্দেশ খেলে ডাক্তার ডাকতে হত।

চক্রবর্তী সখেদে বললেন, ষোলো-সতেরো বছর বয়স হল, কোনোদিকে যদি নজর থাকে! আপনার জন্য কত যত্ন করে আনা! হায়! হায়! আগেই জানি অদৃষ্ট আমার নিতান্তই মন্দ!

অশোকের ভাগ্যে সন্দেশ জুটল না সে জন্য চক্রবর্তীর অদৃষ্ট মন্দ হতে যাবে কেন, ভেবে অশোকের হাসি পেল। লোকটির কী অপূর্ব বিনয়!

চক্রবর্তী বলে চললেন, অদৃষ্ট মন্দ না হলে এমনটা হয়! সাতপুরুষের জমি আমার, তাতে আর একজন ভোগা দেবার চেষ্টা করে! আপনার বাবার কাছে যতক্ষণ মকদ্দমা আছে ভাবনা নেই, উনি বিচক্ষণ হাকিম, চট করে সাজানো মামলা ধরে ফেলবেন। কিন্তু তা কি থাকবে! দেবে হয়তো এক দরখাস্ত ঝেড়ে, কোন কাঠখোট্টা হাকিমের হাতে গিয়ে পড়বে ঈশ্বরই জানেন!

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল, অশোক উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আজ আসি চক্রবর্তীমশাই।

চক্রবর্তীও উঠে দাঁড়ালেন, আসবেন? যা তো মা নেকি একটা আলো নিয়ে সঙ্গে।

না না, আলো লাগবে না, এখনও তেমন অন্ধকার হয়নি। এটুকু বেশ যেতে পারব।

চক্রবর্তী জিভ কেটে বললেন, আরে বাসরে! তা কি হয়? গ্রীষ্মকাল, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ। একটা লণ্ঠন নিয়ে এগিয়ে দিয়ে আসুক।

অশোকের ইচ্ছা হল বলে, আপনিই আলো নিয়ে চলুন না মশাই? রোগা মেয়েটাকে না হয় নাই পাঠালেন!

এ রকম ইচ্ছা দমন করতে হয়। অশোকও করল। নেকি একটা আলো জ্বেলে নিয়ে তার সঙ্গে চলল।

বাগানের মাঝখানে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে নেকি বললে, অশোকবাবু, আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?

অশোক হেসে বললে, মস্ত ভূমিকা, অনুরোধ ছোটো হলে চলবে না।

না, ছোটো নয়।

নেকি একটা ঢোঁক গিলল। আলোটা এমনভাবে ধরলে যে মুখ তার অন্ধকারেই রইল। একটু চুপ করে থেকে বললে, মামা যে জমির কথা বলছিলেন সেটা সত্যি সত্যি আমাদের। আপনার বাবাকে একটু বলবেন?

সম্মুখে সাপ দেখলে মানুষ যেমন চমকে ওঠে অশোক তেমনি চমকে উঠল।

অন্য অবস্থায় এ অনুরোধটা অশোকের কাছে এত কদর্য ঠেকত না। সরলভাবে নেকি যদি এই অনুরোধ জানাত অশোক মৃদু হেসে তাকে বিচারকের কর্তব্যের কথাটা বুঝিয়ে দিত। নেকির অজ্ঞতায় কৌতুক অনুভব করত। কিন্তু এ যে ষড়যন্ত্র! তাকে ভুলিয়ে আদর দিয়ে, যত্ন দিয়ে, নেমন্তন্ন করে খাইয়ে, শত রকমভাবে ঘনিষ্ঠতার বন্ধনে বাঁধবার চেষ্টা করে এমনিভাবে এই নির্জন আমবাগানে এ অনুরোধ করার আর কোনো অর্থই তো হয় না! টাকা নয়, কিন্তু আদর-যত্নও তো ঘুষের রূপ নিতে পারে! হয়তো এই মেয়েটার রূপ—চক্রবর্তীর নিজের মুখে না জানিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জনে সুন্দরী তরুণীকে দিয়ে এ অনুরোধ করার আর কী মানে হয়? ঘৃণায় অশোকের অন্তর সংকুচিত হয়ে গেল। গম্ভীর কণ্ঠে বললে, তোমার এ অনুরোধের অর্থ জান?

নেকির গলা কেঁপে গেল, আমরা বড়ো গরিব অশোকবাবু।

অন্য সময় এই কণ্ঠস্বর শুনলে অশোকের হয়তো করুণা হত, এখন হল রাগ। বললে, গরিব বলে তোমাদের জন্য আমাকে অন্যায় করতে হবে নাকি?

অন্যায় তো নয়। জমিটা আমাদের। আমার কথা আপনার বিশ্বাস হয় না?

তিক্তস্বরে অশোক বললে, না হয় না। হলেও, জমি তোমাদের কি অন্যের, সে মীমাংসা হবে আদালতে, সাক্ষী প্রমাণ দিয়ে। তোমার অনুরোধ যে আমাকে আর আমার বাবাকে কতদূর অপমান করতে পারে সে ধারণা তোমার নেই বলেই নিঃসংকোচে জানাতে পারলে।

নেকি কী বলতে গিয়ে সামলে নিল। একটা নিশ্বাস ফেলে বললে—চলুন।

থাক, তোমার আর কষ্ট করবার দরকার নেই।

নেকির মুখ দেখা গেল না, দেখলে অশোক ভয় পেয়ে যেত। বললে, অতিরিক্ত সাধুতা ফলাবেন না অশোকবাবু।

অহেতুক দংশন। অন্তরে জ্বালা ধরলে, কারণ যাই হোক, এই রকম যুক্তিহীন কথাই মুখ দিয়ে বার হয়। অশোক কিন্তু তা বুঝলে না, বললে, সাধুতা-অসাধুতার তফাত বুঝবার ক্ষমতা তোমার নেই, তাই এ কথার জবাব দিলাম না। আমার সব চেয়ে বড়ো দুঃখ লীলা, ভগবানের দেওয়া রূপকে তুমি তুচ্ছ ঘুষের মতো ব্যবহার করলে।

অন্তরে ওই কথাটাই বড়ো যন্ত্রণা দিচ্ছিল, তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো বিঁধছিল ; অসতর্ক মুহূর্তে অশোকের শিক্ষা-দীক্ষা মার্জিত বুদ্ধি সকলের বাধা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। এমন বিশ্রী শোনাল যে অশোক নিজেই চমকে উঠল।

নেকির হাত থেকে আলোটা পড়ে গিয়ে বার কয়েক দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলেই নিভে গেল।

পুলক ভয় পেয়ে গিয়েছিল, অশোকের একটা হাত ধরে বললে, বাড়ি চল দাদা।

বাড়ি? চল।

অশোক মনকে বোঝাল, নতুন একটা অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হল, মন্দ কী! ফুলে যে কীট থাকে সে তত্ত্বটা তো জানাই ছিল! এবার থেকে সাবধান হওয়া যাবে। উঃ কীরকম জড়িয়ে বাঁধছিল! মুক্তি পেলাম, বাঁচা গেল!

মুক্তিও বটে, বাঁচাও বটে! দুটোর একটার চিহ্নও অশোক খুঁজে পেল না। বাঁধন খসেছে মনে করতেই বাঁধনে টান পড়ল। যা নেই বলে জানল, তারই টানে টানে পাকে পাকে হৃদয় ভেঙে পড়তে চায় দেখে অশোক চমকে গেল।

অশোক দেখে অবাক হয়ে গেল, নেকিকে সে যেভাবে ভাবতে চায় নেকি সেভাবে ধরা দেয় না। মনে হয়, তার বিতৃষ্ণা যেন তার চোখের সামনে কুয়াশা রচনা করে দিয়েছে, সেই কুয়াশার ভেতর দিয়ে নেকিকে সে নিষ্প্রভ দেখছে কিন্তু কুয়াশার ওদিকে নেকি তেমনি উজ্জ্বল হয়েই আছে।

অশোক ধরতে পারে না, কিন্তু তার মনে হয় কোথায় যেন ভুল হয়েছে। খোঁজে। হদিস মেলে না।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে অন্ধকারে সে আগাগোড়া একবার ভেবে নিল। হঠাৎ ভুলটা ধরা পড়ে গেল।

চক্রবর্তী! হৃদয় চক্রবর্তী! ঠিক।

অশোক ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। মূর্খ, মূর্খ! নিতান্ত মূর্খ সে। সবটুকুই যে হৃদয় চক্রবর্তীর খেলা এটুকু বুঝবার ক্ষমতাও তার নেই! মামা আদেশ করলে তার কথা নেকি কেমন করে অস্বীকার করবে? আজ এক মাস যার সঙ্গে পরিচয়, যার চরিত্রের এতটুকু অংশ তার কাছে গোপন নেই, তাকে কী করে এতখানি হীন বলে সে মনে করল? নেকির তো বিন্দুমাত্র অপরাধ নেই! অশোকের বুক থেকে মস্ত একটা ভার নেমে গেল। বন্ধনের যে দড়িদড়াগুলো এতক্ষণ বেদনা দিচ্ছিল হঠাৎ সেগুলো হয়ে গেল ফুলের মালা।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙতেই অশোক আমবাগানে চলে গেল। পুকুরধারে ঘাটের কাছে একটা তালগাছ কাত হয়ে পড়েছিল, তার গুঁড়ির ওপর বসে সবু বাঁকা পথটির দিকে চেয়ে রইল।

একগোছা বাসন হাতে নিয়ে ঝোপ ঘুরে পুকুরের তীরে এসে অশোকের দিকে নজর পড়তেই নেকি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। একরাত্রে তার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। চোখ লাল, চোখের কোলে কালি। কাল বিকালে অতি যত্নে কবরী রচনা করেছিল, কার জন্যে—বুঝি কাল অশোকের খুশির সীমা থাকেনি। আজ সে কবরী বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে।

অশোকের বুক টনটন করে উঠল। কাছে এসে বললে, লীলা, আমায় মাপ করো।

নেকির সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। জবাব দিতে পারল না।

অশোক আবার বললে, আমি বুঝতে পারিনি লীলা। তোমার কোনো দোষ ছিল না।

ছিল না?

অশোক ভুল করলে, বললে, না। আমি জানি তোমার মামার জন্যেই—

আপনার পায়ে পড়ি অশোকবাবু, যে নীচ, ভগবানের দেওয়া রূপকে যে ঘুষের মতো ব্যবহার করে, দয়া করে তাকে নীচেই থাকতে দিন। বলে নেকি অগ্রসর হল, পথ ছাড়ুন।

অশোক পথ ছেড়ে দিল। তার অস্বাভাবিক বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে নেকি ঘাটে নেমে গেল।

পরদিন অশোক কলকাতা রওনা হল।

মাস তিনেক পরের কথা।

সকালে মার কাছ থেকে অশোক একখানা চিঠি পেলে। মা লিখেছেন, মাসখানেক ধরে তিনি জ্বরে ভুগছেন, খুব সম্ভব ম্যালেরিয়া ধরেছে। ডাক্তার চেঞ্জে যেতে বলেছেন, বাঁচি যাওয়া ঠিক হয়েছে।

অশোকের বাবার ছুটি নেই, রাঁচি পর্যন্ত যেতে পারবেন না। কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে তিনি ফিরে যাবেন, কলকাতা থেকে অশোককে সঙ্গে যেতে হবে। সে যেন প্রস্তুত হয়ে থাকে।

চিঠি পড়ে অশোক মিনিট পনেরো ভাবল, তারপর সুটকেস গোছাতে বসল। সেইদিন রাত্রের সিরাজগঞ্জ মেলে উঠে বসল।

মা বললেন, তোর আসবার দরকার ছিল না। আমরাই তো কলকাতা যাচ্ছিলাম। যাক, বেশ করেছিস।

অশোক মুখ নত করলে। কেন যে এল, সে প্রশ্নের বিরামহীন মহলা তো তার মনেই চলেছে! জবাব দেবে কী?

তোর কি কোনো অসুখ হযেছিল অশোক?

অশোক ঘাড় নেড়েই প্রশ্ন করল, পুলকের স্কুল তো ছুটি হয়নি? ও কি এখানে থাকবে?

কথা ঘুরিয়ে নেবার জন্য ছেলের প্রয়াস দেখে মাব চোখে জল এল। বললেন, থাকবে? থাকবার ছেলেই বটে। আর জানিস, নেকি আমাদের সঙ্গে যাবে।

অশোক চমকে উঠল।

মেয়েটা একেবারে শেষ হয়ে গেছে রে! তুই থাকতেই ম্যালেরিয়া ধরেছিল, এখন কালাজ্বরে দাঁড়িয়েছে। অত্যাচারের তো সীমা ছিল না। জ্বর গায়ে কবার যে স্নান করত ঠিক নেই। কী চেহারা হয়ে গেছে! মা একটা নিশ্বাস ফেলে চলে গেলেন।

মার চেঞ্জে যাওয়ার আসল উদ্দেশ্য এবার আর অশোকেব কাছে গোপন রইল না।

নেকি অল্প অল্প হাঁটতে পারত, কিন্তু আমবাগান পার হয়ে আসবার আর ক্ষমতা ছিল না। মা পালকি নিয়ে গিয়ে নিজে তাকে নিয়ে এলেন। অশোক উঠানে দাঁড়িয়েছিল, পালকির খোলা দরজা দিয়ে তার দিকে চেয়ে নেকি ম্লান হাসি হাসল। রাগ নেই, দ্বেষ নেই, অভিমান নেই, সারারাত্রি ঝড়ের আঘাত সয়ে রজনীগন্ধার দল ভোরবেলা যেমন শ্রান্ত ক্লান্ত হাসি হাসে সেই রকম হাসি। অশোক মুখ ফিরিয়ে নিল।

নেকির পিসির অসুখ, চক্রবর্তীর তাই এই সঙ্গে যাওয়া হল না। পিসি একটু ভালো হলেই যাবেন। যাত্রা করবার সময় ভদ্রলোক হাউহাউ করে কেঁদে ফেললেন, অশোকের মাকে উদ্দেশ করে বিকৃত কণ্ঠে বললেন, আমার আর কেউ নেই মা, ওকে আপনি ফিরিয়ে আনবেন।

চক্রবর্তীর ওপর অশোকের বিতৃষ্ণার সীমা ছিল না, আজ তার মনে হল এর চেয়ে ভালো লোক বোধ হয় পৃথিবীতে নেই!

শহরের প্রান্তবাহী ছোটো নদীটি বর্ষার জলে ভরে উঠেছে। স্টিমারঘাট পর্যন্ত গাড়ি যায় না, নৌকোয় যেতে হয়। স্টিমারঘাট শহর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে।

স্টিমারে উঠে নেকি কেবিনে ঢুকতে রাজি হল না। রেলিঙের পাশে ডেকচেয়ার পেতে তাকে বসিয়ে দেওয়া হল। অশোক আর তার মা কাছেই বসলেন। নেকি একদৃষ্টে মেঘনার জলরাশির দিকে চেয়ে রইল। স্টিমার এক তীর ঘেঁষে চলেছে, ওপারের তটরেখা অস্পষ্ট। দু বছর আগে এই পথ দিয়েই সে একটা অতিপরিচিত জীবনকে পিছনে ফেলে দুরুদুরু বুকে অজানা অচেনা জীবনের মাঝে গিয়ে পড়েছিল। আজ আবার সেই পথেই কোনো নতুন জীবনের সন্ধানে সে চলেছে কে জানে! দেনাপাওনা হয়তো মিটবে না, ওপারের তটরেখার মতোই অস্পষ্ট অনুভূতি তাকে চিরন্তন জীবনের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে সে জীবনে যেতে মন হয়তো তার কেঁদেই উঠবে। কিন্তু যেতে বোধ হয় হবেই।

অশোক শুষ্ক বিষণ্ণ মুখে ডেকের পাটাতনের দিকে চেয়ে রইল। মা-ই কেবল মাঝে মাঝে দু-একটা কথা বলতে লাগলেন। পুলকের এ সমস্ত উচ্চাঙ্গের সুখদুঃখের বালাই নেই, রেলিঙে ভর দিয়ে তন্ময় হয়ে সে ঢেউয়ের ওঠানামা দেখতে লাগল।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মা বললেন, তোরা গল্প কর অশোক, আমার ভারী মাথা ধরেছে, কেবিনে একটু ঘুমিয়ে নিই গে।

মা উঠে যেতেই অশোকের মুখের দিকে চেয়ে নেকি হাসল। যেন বলতে চায়, রাগ তো তোমারও নেই আমারও নেই, তবে কথা বলছ না কেন?

চেয়ারটা নেকির কাছে সরিয়ে এনে তার মুখের ওপর ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে অশোক বললে, আমায় মাপ করেছ লীলা?

নেকি তেমনিভাবে হেসে বললে, মাপ করবার কিছু নেই, সে সব আমি ভুলে গেছি। তুচ্ছ ব্যাপারকে বড়ো করে দেখবার আর আমার শক্তিও নেই, সময়ও বোধ হয় নেই।

অশোকের চোখে জল এল, বললে, আমিই তোমায় শেষ করে দিলাম লীলা।

নেকি তাড়াতাড়ি বললে, না না, ও কথা বলো না। হঠাৎ আকাশের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, কতকগুলো সাদা পাখি কেমন সার বেঁধে চলেছে দ্যাখো। বক তো নয়।

অশোক দেখলে। বললে, না। বুনোহাঁস।

হাঁস? ওমা! এ আবার কী রকম হাঁস। আচ্ছা ওরা দল বেঁধে কোথায় চলেছে? বেড়াতে বেরিয়েছে বুঝি?

অশোক বুঝলে, একেবারে নেকির পাশে সরে গেল। নেকির একখানা হাত নিজের হাতের ভেতর গ্রহণ করে বললে, ওদের তো বাড়িঘর নেই, ওরা বেড়িয়েই বেড়ায়। তুচ্ছ কথার অন্তরালে অনাড়ম্বর চেষ্টায় এতদিনের বিচ্ছেদের সংকোচ মুছে ফেলাই সব চেয়ে সহজ।

সত্যি? বাড়িঘর না থাকা কিন্তু বেশ। না?

বাতাসে একরাশি রুক্ষ চুল নেকির মুখের ওপর এসে পড়েছিল। অশোক সযত্নে চুলগুলো সরিয়ে দিলে। আরামে নেকির চোখ বুজে এল। নিঃশব্দে অশোকের আঙুলের মৃদু স্পর্শটুকু সমস্ত মন দিয়ে উপভোগ করে চোখ মেলে অশোকের মুখের দিকে চেয়ে লজ্জিত সুখের হাসি হেসে বললে, ঘুম পাচ্ছে, ঘুমোই?

ঘুমোও।

নেকির হাতখানি হাতের মুঠোতেই ধরা রইল। নেকির মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নীল আকাশের বুকে সঞ্চরণশীল শ্বেতচন্দনের ফোঁটার মতো গতিশীল বুনোহাঁসগুলোর দিকে চেয়ে রইল।

শ্রাবণের আকাশ, কিন্তু মেঘ নেই। ওপারের অস্পষ্ট তটরেখা অস্পষ্ট হয়েই রইল।

অশোক মনে মনে বললে, তাই থাক। যে তীর ঘেঁষে চলেছি সেই তীর স্পষ্টতর হোক, উজ্জ্বলতর হোক, ওপারের তটরেখা আরও অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যাক।

বৃহত্তর মহত্তর

আমাদের পাড়া থেকে উঠে যাওয়ার তিন বছর পরে একদিন নগেনের সঙ্গে পথে দেখা হল। লোকটার চেহারার না হোক, পোশাকের খুব উন্নতি হয়েছে দেখলাম। মাথায় চকচকে টেরি, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, পরনে কোঁচানো শান্তিপুরে ধুতি, পায়ে চকচকে ডার্বি। হাতে আবার একটা রিস্টওয়াচ বাঁধা!

একগাল হেসে পরমাত্মীয়ের মতো বললে, রেস্টুরান্টে ঢুকতে যাচ্ছিলাম, পকেটে হাত দিয়ে দেখি মনিব্যাগটা ভুলে এসেছি। এমন খিদে পেয়েছে ভায়া!

আশেপাশে শুধু দেশি খাবারের দোকান ছিল; বললাম, খাবার খাবেন?

অগত্যা! বলে সে একটা বিড়ি ধরাল। সঙ্গে করে তাকে খাবারের দোকানে নিয়ে গিয়ে বসালাম। সে নিজেই এটা ওটা ফরমাশ করল, আমি তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়ে টাকা তিনটে আর একবার গুনে নিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, দিদি কেমন আছে?

জানি না, বলে সে একটা রসগোল্লা গিলে ফেললে।

জানেন না মানে?

মানে আমায় কলা দেখিয়ে শালি ভেগেছে চারমাস!

আমি নীরবে উঠে দাঁড়ালাম। যাবার জন্য পা বাড়াতেই সে ব্যাকুল হয়ে বললে, চললেন যে?

সে কৈফিয়তে আপনার প্রয়োজন?

এহেঃ, চটেন কেন! খাবারের দামটা দিয়ে যান। আমার কাছে একটাও পয়সা নেই। মাইরি বলছি। কালীর দিব্যি।

দাম? দাম আমি জানি না, বলে পা বাড়ালাম।

সে উঠে এসে কাঁদোকাঁদো হয়ে বললে, এ কোন দেশি ঠাট্টা ভাই? বিপদে ফেলে পালাতে চান কীরকম? প্রতিজ্ঞা করছি আর খারাপ কথা বলব না। খুব সম্মান করে কথা কইব। কী জ্বালা, আপনার পায়ে পড়ছি দাদা, হল?

আমি ফিরলাম। সে আবার খেতে আরম্ভ করে অনুযোগের সুরে বললে, রাগের মাথায় একটা বেফাঁস কথা বার হয়ে গেছে বলে কি এমন করতে হয় রে দাদা! মাইরি আমার বুক কাঁপছে এখনও।

কাঁপুক। চট করে বলুন দিদির কী হয়েছে?

সে অনেকক্ষণ ধরে যা বললে তার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই : মাস চারেক আগে একদিন সকালে উঠেই মমতাদি বললে, আমি বিদায় হলাম। এ জীবনের ক্ষুদ্রতা আমার সইছে না। আমি মহত্তর বৃহত্তর জীবনে সার্থকতা খুঁজতে চললাম। বলে নগেনকে কথাটি কইবার (অর্থাৎ চুলের মুঠি ধরে আটকাবার) সুযোগ না দিয়েই ফস্ করে চলে গেল। নগেন প্রথমটা ভেবেছিল সে বুঝি আমায় ভর করেই অকূলে ভাসল। (এইখানে সে হাত জোড় করলে, পাছে আমি রাগ করি।) শেষে শুনলে, তা নয়, কী একটা নারী-সমিতিতে যোগ দিয়ে সে দেশের কাছে লেগেছে। চরকা ঘোরায়, ছোটো ছেলেমেয়েদের পড়ায়, বাড়ি বাড়ি মেয়েদের কাছে স্বদেশি প্রচার করে। এ কথা জেনে আমাকে মিথ্যা সন্দেহ করার জন্য দুঃখে লজ্জায় অনুতাপে—

আমি চুপ করে বসে রইলাম, সে আমার কানের কাছে দুঃখলজ্জা অনুতাপের জ্বলন্ত বর্ণনা করে চলল। আমি খানিক শুনলাম, খানিক শুনলাম না, শেষটা কিছুই শুনলাম না।

উদ্‌গারের শব্দে সচেতন হয়ে দেখলাম, তার খাওয়া ও বক্তৃতা শেষ হয়েছে। পুনরায় উদ্‌গার তুলে বললে, আর খাব না, দামটা দিয়ে দিন।

দিচ্ছি। এত ঘটা করে সাজ করেছেন কেন বলুন তো? দিদির শোকে না কি?

কালো দাঁত বার করে সে হাসল, আরে রামো, সে বৃহত্তর মহত্তর জীবনে সার্থক হতে গেছে তার জন্যে শোক কী! আবার বিয়ে করে ফেলেছি কি না—বুঝলেন না? দুটো পয়সা দিন তো, পান কিনব।

আমার হঠাৎ ইচ্ছা হল খাবারের দাম না দিয়ে চলে যাই; দোকানির হাতের অনেক মিষ্টি খেয়েছে, একটু প্রহারও থাক। কষ্টে সে সংগত ইচ্ছা সংযত করে দাম মিটিয়ে দিলাম। পান খাবার পয়সা দিয়ে নারী-সমিতির নাম টুকে নিয়ে পথে নেমে গেলাম। পথে মানুষের ভিড়। আমার মনে হল, একই পথ বেয়ে আমিও চলেছি এত লোকও চলেছে কিন্তু প্রত্যেকের মনোবেদনার উৎস কত বিভিন্ন! এতগুলো চিন্তা-জগতের একটিতেও কি মমতাদির মতো কেউ নীরব দুঃখের পদচিহ্ন এঁকে চলেছে?

নারী-সমিতিটির খোঁজ করে সম্পাদিকার সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি জানালেন মমতাদি মাঝে একমাস জেল খেটেছে এবং আবার জেলে যাবার জন্য বাড়াবাড়ি আরম্ভ করায় তাকে মফস্বলে কাজ করতে পাঠানো হয়েছে। এই সমিতির কাজ গঠনমূলক, ধ্বংস এর কর্মীদের ব্রত নয়, মমতাদিকে নিয়ে সম্পাদিকার বড়ো মুশকিল।

পরদিন আমি মমতাদি যে গ্রামে ছিল সেখানে গেলাম। কলকাতা থেকে চার পাঁচ ঘণ্টার পথ।

বেশ বড়ো গ্রাম। গ্রামের পাশে একটা নদী। খোঁজ করে, শোভার প্রাচুর্যে নদীতীর যেখানে আপনাতে-আপনি মুগ্ধ হয়ে আছে সেইখানে একটি ছোটো টিনের বাড়িতে মমতাদির দেখা পেলাম। মমতাদি এবং তার সঙ্গিনীদের জন্য গ্রামের কে এক সদাশয় ব্যক্তি এই বাড়িখানা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তখন দুপুর। শরতের প্রথম হলেও রোদের তেজ ছিল। সদরের বারান্দায় উঠে দাঁড়াতে চার-পাঁচটি চরকার শব্দ শুনতে পেলাম। মমতাদিকে ডাকতে চরকা থেমে গেল, সে বেরিয়ে এল।

হেসে বললে, এসেছ? আমি জানতাম খোঁজ পেলে তুমি আসবেই, দু-এক ঘণ্টা তর্ক করবেই। তোমার প্রতীক্ষা করছিলাম আমি।

তর্ক করব নিশ্চিত জান?

জানি। যে কাণ্ড করেছি, তর্ক না করে তুমি ছাড়বে?

যদি না করি তর্ক?

বিস্মিত হব! ভেবে পাব না বাঙালি হয়েও তর্কের এমন সুযোগ কী করে ত্যাগ করলে। কিন্তু তুমি করবে। তোমার চোখে-মুখে তর্ক উঁকি মারছে। অন্তত আলোচনা।

নদীতে নেমে মুখ-হাত ধুয়ে আমি বারান্দায় মাদুরে বসলাম। সেও বসল, অর্ধেক মাদুরে অর্ধেক মাটিতে। মেয়েরা অমনিভাবে বসে, বিনয়ের লক্ষণ ওটা। কথা আরম্ভ হওয়ার আগে আমি একবার ভালো করে তার মুখ দেখে বুঝবার চেষ্টা করলাম, এ জীবনে সে সুখী হয়েছে কিনা। কিছুই স্পষ্ট বোঝা গেল না। আগের জীবনে সে অসুখী ছিল কিন্তু মুখের একটু ম্লানিমা দেখে তার অসুখের পরিমাণ স্থির করা যেমন সম্ভব ছিল না, আজ সেই ম্লানিমার অন্তর্ধান এবং দেহে স্বাস্থ্য ও চোখে-মুখে একটা শান্ত জ্যোতির আবির্ভাব দেখে বোঝা গেল না সে কতখানি সুখী হয়েছে। বিশেষ, মাঝে মাঝে তার দৃষ্টিতে ব্যথার বিকাশ দেখা যেতে লাগল।

সে প্রশ্ন করল, তুমি কি আমাকে সমর্থন কর না?

আমি বললাম, ঠিক জানি না। ইচ্ছা হয় সমর্থন করি, কিন্তু বাধা পাই। তোমার সিদ্ধান্তে অনেক জটিলতা, সহজে মেনে নেওয়া কঠিন। তোমায় আমি চোখ বুজে সমর্থন করতাম যদি—

যদি?

যদি তোমার দেশপ্রেম নিজের তেজে স্বামী-পুত্রের প্রেমকে ছাপিয়ে যেত, যদি রাগ আর অভিমানের ভেজাল না থাকত।

সে হাসল। বললে, তাপসী নই, মন নির্বিকার নয়। ভেজাল হয়তো আছে। কিন্তু তুমি যে রাগ আর অভিমানের কথা ভাবছ তার ভেজাল নেই। তুমি ভাবছ আমি ঝগড়া করে ঝোঁকের মাথায় চলে এসেছি। তা সত্যি নয়। সে ভয় আমারও ছিল। কতদিন ধরে চেষ্টা করে আমি বাড়ি ছাড়তে পেরেছি জান? ছ-সাত মাসের বেশি। রাগের মাথায় চলে এসেছি ভেবে পরে পাছে আমার অনুতাপ হয় এই ভয়ে যখনি সে বেশি রকম খারাপ ব্যবহার করত আমি গৃহত্যাগের সময় পনেরো দিন পিছিয়ে দিতাম। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে অন্তত পনেরোটা দিন যখন রাগের কোনো কারণ উপস্থিত হবে না তখন বাড়ি ছাড়ব, তার আগে নয়। এই প্রতিজ্ঞা বজায় রাখতে গিয়ে, আসবার জন্য পা বাড়িয়ে থেকেও ছ-সাত মাস আসতে পারিনি। শেষের দিকে হতাশ হয়েই পড়েছিলাম যে একবারও খিটিমিটি বাধবে না এমন পনেরোটা দিন এ জীবনে আসবে না। কিন্তু হঠাৎ তার কঠিন অসুখ হল—

সেই সুযোগে চলে এলে!

সে হাসল।—শোনোই আগে, পরে মন্তব্য প্রকাশ করবে। তার তো অসুখ হল, আমি নাওয়া-খাওয়া ঘুম সব ছেড়ে দিয়ে এমন সেবাটাই করলাম যে অসুখ ভালো হওয়ার সঙ্গে সেও কিছুকালের জন্য ভালো হয়ে গেল। ঠিক বিয়ের দিনগুলি যেন ফিরে এল—এত আদর, এত সোহাগ, এত ভালোবাসা! পনেরো দিন হঠাৎ সদয় অদৃষ্টের দান ভোগ করে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমি চলে এলাম। রাগ করে এসেছি আমি? ঝগড়া করে এসেছি? তা আর বলতে হয় না।

তবে এলে কেন?

না এসে চলল না তাই।

তার মানেই তুমি হার মেনেছ। নগেনবাবুর সঙ্গে যে বাজি রেখেছিলে তাতে তোমার হার হয়েছে।

কীসের বাজি?

মনে নেই? একদিন বলেছিলে সে নিছক স্বামী, বিধাতা নয়। চোখ বোজার আগে তোমায় বাড়ি-ছাড়া করার সাধ্য তার নেই, নেই, নেই।

নেই তো! আমায় কেউ বাড়ি-ছাড়া করেনি, আমি নিজে এসেছি। শুধু স্বামীকে সইতে না পেরে চলে আসব আমি কী তেমন মেয়ে? নই, নই, নই। এগারো বছর ধরে তার অবিচার অত্যাচার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল—সে জন্য নালিশ করতেও আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তা ছাড়া স্বামী কি সারাদিন অত্যাচার করে? চব্বিশ ঘণ্টায় দিন, ক ঘণ্টা মানুষের নিষ্ঠুরতায় ধৈর্য থাকে? যদি কোনো বইয়ে পড়ে থাক অত্যাচারী স্বামীর কথা, জানবে লেখক শুধু চব্বিশ ঘণ্টার গোটা একটা দিনের আধঘণ্টার হিসেব দিয়েছে, বাকি সময়টা চালাকি করে রেখে দিয়েছে নেপথ্যে! ওই বাকি সময়টা স্নেহ-ভালোবাসায় বোঝাই না হয়ে একদম ফাঁকা হতে পারে—কিন্তু ও সব ফাঁক সংসারী মেয়েমানুষের সয়। শুধু স্বামী যার অবলম্বন, সপ্তাহে একটিও মিষ্টি কথা না শুনলে তার অসহ্য ঠেকতে পারে, আমার তো একমাত্র স্বামীই ছিল না জীবনে অবলম্বন! শুধু স্বামীর হিসাবে অভাগিনি হলে অভাগিনি হয়েই আমি থাকতাম ভাই। তার হীনতা যদি শুধু আমার প্রতি অন্যায় করে নিরস্ত থাকত, যদি আমার বর্তমান জীবন এবং ভবিষ্যতে যে জীবন পৃথিবীতে রেখে যাব সমস্ত গ্রাস না করত, আমি মুখ

বুজে তার সংসার ঘাড়ে করে মরতাম। সুখ শান্তির অভাব আমায় কাতর করত না, অনাহার, অনিদ্রা, প্রহার, নির্যাতন উপেক্ষা কিছুই মুছে নিতে পারত না মুখের হাসি। জীবনের আংশিক সফলতা পেলেই আমি তুষ্ট থাকতাম। কিন্তু তা হল না। কতক স্বামীর জন্যে কতক পারিপার্শ্বিক অবস্থার অভিশাপে সমগ্রভাবে আমি ব্যর্থ হয়ে গেলাম—সম্পূর্ণভাবে আমার জীবন হল অকারণ অর্থহীন। স্বামী নয়, দুঃখদুর্দশা নয়—ব্যর্থ বেঁচে থাকাটা আমার সইল না। আমার আত্মা আর্তনাদ আরম্ভ করে দিল।

সতিনের ভয়ে?—বলে আমি খোঁচা দিলাম।

সে চমকে উঠল। সতিনের ভয়ে আত্মার আর্তনাদ? সতিন? সতিন হয়েছে না কি এর মধ্যে? স্ত্রী ছাড়া তার চলবে না জানতাম, কিন্তু এত শিগগির! আমার পায়ের আলতার দাগ এখনও বোধ হয় ঘরের মেঝে থেকে মুছে যায়নি। আমি কি তার ঘরের এতখানি স্থান জুড়ে ছিলাম যে বিশাল ফাঁকটা সইল না, তাড়াতাড়ি পূর্ণ করতে হল?

নালিশ। ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ অভিযোগ! মনে হল, অভিমানও জেগেছে—ঈর্ষার বসন-পরা অবুঝ অভিমান। মুখে একটা কালো ছায়া ভেসে এসেছে, দুচোখে ঘনিয়েছে ব্যথা। দেখে আমার বিশেষ ভালো লাগল না। মুখে সমর্থন করি আর না করি মনে মনে তার মানবীত্ব ঘুচিয়ে তাকে দেবীর মতো জ্যোতির্ময়ী করে তুলেছিলাম। দধীচি থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত সংখ্যাহীন জ্যোতিষ্ক যে-জ্যোতির সংগে পরিচয় করিয়েছে মানুষের। মানবতার ছায়াপাতে মমতাদির সে ভাস্বর মূর্তি কল্পনার নেপথ্যে হঠাৎ যেন ম্লান হয়ে গেল।

বললাম, এবার আমার পুরো অসমর্থন মমতাদি! ছলনা করেছ নিজেকে। ভেবেছ কর্তব্য ত্যাগ বুঝি সত্যি ত্যাগ। দুঃখের কাছে হার মেনে তুমি পালিয়েছ কর্তব্য পিছনে ফেলে!

সে বললে, কর্তব্য মানে? স্বামীসেবা? তনুমন দিয়ে তনু পরিচর্যা? শিক্ষা তোমায় উদার করেনি দেখছি। এই নারী-বিদ্রোহের যুগে ও কী কথা বলছ তরুণ? কোন যুগের মানুষ তুমি?

—এ যুগের। আমায় টেনো না। আমার শিক্ষা অতি অনুদার। উদার শিক্ষা কোথায় পাব? নচিকেতার মতো যমের বাড়ি না গেলে আর সে শিক্ষা জুটছে না। দুঃখ এই যে যম আমায় বাড়ি ফেরার জন্য ছেড়ে দেবে না। কিন্তু তনু-পরিচর্যার নালিশ পুরোনো, পচা। নিজেই বলেছ ও জন্য বাড়ি ছাড়নি। একটা অমানুষের মঙ্গল যে করতে পারল না, নিজের লোকের অত্যাচার সইতে পারল না, লক্ষ মানুষের মঙ্গল করার শক্তি সে কোথায় পাবে, পরের অত্যাচার সয়ে কী করে ব্রতরক্ষা করবে?

—লাখো মানুষের আশীর্বাদের জোরে। কিন্তু তোমার যুক্তিটা বেশ! লজিকের এই ফ্যালাসির মতো—মানুষ অমর নয়, বানর অমর নয়, অতএব মানুষ বানর। একের সংগে লাখের তুলনা চলে? যে বক আঁকতে পারল না, সাহিত্যিক হয়ে সে মানুষের সৃষ্টি করতে পারবে না এ কথা বলা যায়? একটিমাত্র রত্নাকরের মঙ্গল করে গেলে সে একদিন বাল্মীকি হয়ে উঠবে এমন আশা করা বোকামি। কিন্তু এ আশা অনায়াসেই করা যায় লাখের মধ্যে হাজার বাল্মীকি ঘুমিয়ে আছে! গণ্ডি ছোটো হলেই যে ভালো কাজ করা যাবে তার মানে নেই! বাড়ির বউ সমস্ত বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে—কিন্তু বাড়ির সবচেয়ে ছোটো ঘরটি পরিষ্কার করার জন্য ডাকতে হয় মেথরকে। আমি চেষ্টা করিনি ভেবেছ? এগারো বছর চেষ্টা করেছি। কিন্তু ঘরের পাকা মেঝেতে আমার চেষ্টার লাঙল আঁচড় কাটতে পারেনি—ফসল ফলাব কী! তাই এসে দাঁড়িয়েছি এই বিস্তীর্ণ মাঠে। যত আগাছা থাক মাটি যত শক্ত হোক, অল্প একটু স্থান পরিষ্কার করে আবাদ করতে পারব না? বাকি জীবনের চেষ্টায় একটু সোনা ফলবে না? পারব—ফলবে। সে থামল। একটু ভেবে বললে, এই কথাটা আমি ভাবতাম।

রাত্রিদিন ভাবতাম। স্বামী আমার কাছে ছোটো নয়—তুচ্ছ নয়—কিন্তু পর। সব স্বামীই পর—নিজের চেয়ে মানুষের আপনার কেউ নয়—প্রেমে নয়, স্নেহে নয়। প্রেম দুটি আত্মাকে কাছে আনে কিন্তু আত্মগত আত্মার চেয়ে কাছে-আসা আত্মার দূরত্ব বেশি। তাই আমি ভাবতাম যে, শুধু পরের কল্যাণেই বেঁচে থাকব, আমার আত্মার কল্যাণ নেই? আমার জীবন তাদেরই কল্যাণে ব্যর্থ হবে যাদের কল্যাণ হয় না? সবাই পরের জন্যেই অবশ্য বেঁচে তাকে, কিন্তু নিজের জন্য আহরণ করে ওই বেঁচে থাকার সার্থকতাটুকু। ওরই নাম নিজের আত্মার কল্যাণ। নিজেকে দিলাম কিন্তু দেওয়াটা মিথ্যা হল না, এইটুকু। অন্যায়ের বিনাশের জন্য দধীচির আত্মদান—ইন্দ্র বজ্র নিয়ে খেলা করবে বলে নয়। আমি দধীচির মেয়ে নই। যদি হইও দধীচির মেয়ে, আমার অস্থির বজ্র নিভে গেছে। একটু তাপ শুধু আছে নেভা বজ্রের ভস্মে। সেইটুকু যদি বরফের ঘর গরম রাখতে ব্যয় করে যেতাম, মরবার সময় অপচয়ের স্মৃতিতে আমার আত্মা দগ্ধ হত। আজীবন স্বামী-সেবার পুণ্যও পুড়ে হত ভস্ম! কারণ, সারা জীবন চোখ বুজে কাটিয়ে মরবার সময় আমি চোখ মেলে দেখতাম দুর্লভ জীবন কার পূজায় কাটল। তখন জীবনব্যাপী দানব-পূজার আপশোশ নিয়ে আমায় পরলোকে যেতে হত। আপশোশ নিয়ে মানুষ কোন পরলোকে যায় জান? নরকে।

আমি বললাম, এটুকু বুঝলাম। কিন্তু আসল কথা এখনও বলিনি। তোমার তো শুধু স্বামী নয়, দুটি ছেলে।

সে সংশোধন করে বললে, দুটি না, ছটি। চারটি স্বর্গে গেছে। দুটি গর্ভের অন্ধকার থেকে, দুটি পৃথিবীর আলো দেখে। না, দুটিই আলো দেখে নয়, একটি অন্ধ হয়ে জন্মেছিল।

এ বারতায় ব্যথা ছিল, আঘাত ছিল, আমাদের শিশু জগতে স্থায়ী মড়ক আছে সে কথা শুনেছিলাম। শুনেছিলাম মানে দৈনিক অথবা মাসিকে পড়েছিলাম। শুধু পড়েছিলাম। কখনও ভেবে দেখিনি শিশুর মরণের শেষ শিশুর মরণে নয়, মমতাদির মতো অসংখ্য মাতার মর্ম-বেদনায়। জগতে যার বাড়া মর্ম-বেদনা নেই।

সে বললে, তুমি ভাবছ এতক্ষণ ব্রহ্মাস্ত্র তুলে রেখেছিলে, ছেলে দুটির কথা তুলে আমাকে কাবু করবে। ছেলেই বটে! বড়ো ছেলের বয়স বারো—মনের বিকৃতিতে বারো শো। সে চোর, তাড়িখোর, কুটিল, রাগি, বোকা, অলস। ছোটোটিও অমনিভাবে গড়ে উঠছে—দুজনেই একদিন বাপের মতো হবে।

অত খারাপ? বলে আমি জিভ কাটলাম।

সে বললে, জিভ কেটো না। সারা জীবন কথা কইতে হবে—এখন জিভ কাটা গেলে মুশকিল। নিজেই স্বামীনিন্দে জুড়েছি, তোমার কথায় আর কত ব্যথা পাব? আমার ছেলে দুটি বাপের মতো অত খারাপ যদি নাও হয়, যেটুকু হবে তাতেই প্রকাণ্ড অমানুষ হবে। সদ্‌গুণে বোঝাই হয়ে করবে ত্রিশ টাকার কেরানিগিরি—তাতেই অধিকারী হবে স্ত্রী-পুত্র সংসারের। দশ বছরে দশটা কুকুর-ছানার বাপ হবে—অকালমৃত্যু এড়াতে পারলে যারা বড়ো হয়ে দশ দশে একশোটা শূকর-ছানা পৃথিবীকে উপহার দেবে। অবিশ্বাস করছ? পৃথিবী এমনি করে ভারাক্রান্ত হয় ভাই—একটা গলিত আত্মায় হাজার হাজার গলিত আত্মার বীজ কিলবিল করে। এই জন্যে যিশু বলেছিলেন, একটি পাপী স্বর্গের দিকে মুখ ফেরালে স্বর্গরাজ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। একটি মানুষ থেকে মানবজাতি হয়েছে—কে বলতে পারে একটি পাপী থেকে একদিন একটা বিরাট পাপীর জাতি পৃথিবীতে দেখা দেবে না? একটি অমানুষের মধ্যে সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ ধ্বংসের সম্ভাবনা নিহিত আছে। অমনি অমানুষ হয়ে উঠছে আমার ছেলেরা! দশ মাস দেহের মধ্যে বয়ে বেড়িয়েছি, নিজের রক্তে পুষ্ট করেছি, দিনের পর দিন বুকে নিয়ে পালন করেছি, স্নেহ করেছি, ভালোবেসেছি, জগতের দুটি অভিশাপকে। জ্ঞানের আলোয় নিজের এই মহৎ দুষ্কর্ম চিনে আমি পালিয়ে এসেছি। পাপে আমার বিরাগ, ব্যর্থতায়

অরুচি। প্রাণপাত সেবায় দেশের বুকের পাথরকে পাহাড় করে তোলা পাপ।.....তোমার দুচোখে প্রতিবাদ কেন? সংস্কার কি তোমাব পাপ আর ব্যর্থতার স্বরূপ ভুলিয়ে দিচ্ছে?

আমি বললাম, না। তোমার কথাগুলি এত ছোটো-বড়ো কথাব চুম্বক যে হঠাৎ শুনে ঠিক মতো ধারণা করে উঠতে পারছি না।

সে বললে, সেটা আশ্চর্য নয়। বিয়ের পর থেকে এগারো বছর শুধু তো জ্বলিনি--তিল তিল করে চিন্তার হিমালয় সৃষ্টি করেছি। আমার কথা তোমার চিন্তাশক্তিকে পীড়ন তো করবেই। এগারো বছরের ভাবনা কি দু মিনিটে ভাবা যায়? আমি বললাম, বুদ্ধি থাকলে যায়, বোকা হলে যায় না। আমি সময়মতো ভাবব। তুমি বলে যাও, আমি আরও কিছু ভাবনাব খোরাক সংগ্রহ করি।

সে বললে, ভেবো। ভেবে দেখ আমি বাড়িয়ে বলিনি, অবস্থা বিশেষে মা হওয়া সত্যই মহাপাপ, মহৎ ব্যর্থতা। তুচ্ছ পযসা দিয়ে কেনা দুধ-কলা দিযে সাপ পোষা অন্যায়, দুর্ভাগ্য ; —শরীরের রক্ত খাইয়ে সাপ পোষা কত বড়ো অন্যায়, কত বড়ো দুর্ভাগ্য? আবার, এই শোচনীয় কৌতুক একমাত্র মাযেব অদৃষ্টে। স্বামীব কাছে জীবনেব একটি স্ফুলিঙ্গ ভিক্ষা পেযে তিল তিল কবে বাড়িযে জননীকেই জ্বেলে দিতে হবে একটি সম্পূর্ণ জীবনেব চুল্লি—যদি সে চুল্লিতে জগতের কল্যাণে যজ্ঞ করা যায় গৌরব জননীব, যদি তাব আগুনে গৃহদাহ হয় কলঙ্কও জননীব। মায়ের দায়িত্ব এত বড়ো ভাই! তাই পৃথিবীব দৃটি গলগ্রহ সৃষ্টি করে আজ আমাব অসীম অনুতাপ। আমার মাঝে মাঝে ভয হয দেশ আমার সেবা নেবে না। অসুস্থ দেশের মুখে যে দু ফোঁটা বিষ ঢেলে দিয়েছি সে অপরাধ ভুলবে না। এ চিন্তাব দাহে আমাব শুধু খেপে যাওযা বাকি আছে। ভগবান আজ যদি ওদেব কাছে টেনে নেন, তবে বোধ হয—তবে বোধ হয—

ভগবানেব নাম নিয়ে মার মুখে সন্তানেব মৃত্যুকামনা! এই অস্বাভাবিক ভীষণ মহত্ত্বে আমি চমকে গেলাম। নিজেব অসমাপ্ত উক্তির প্রহাবে সেও কেঁদে ফেলল। আমি বুঝলাম এ কান্নার অর্থ কী। অভিশাপেব প্রত্যাহাব। মুখেব কথা নয়, ভগবান যেন মনের কথাটাই কানে তোলেন এই নিবেদন।

সূর্যালোকে নদীতে ঢেউগুলি চমকাচ্ছিল, তীর ঘেঁষে চলেছিল একটি পানসি। বুড়ো মাঝি লগি ঠেলছে, ছেলে কোলে একটি মেয়ে তীরের শোভায় মুগ্ধ হয়ে বসে আছে. একটি দুরন্ত ছেলের হাত শক্ত করে ধবে। কিছু দূরে নদীব বাঁক, সে পর্যন্ত আমি নৌকোব জননীটিকে অনুসরণ কবলাম। ততক্ষণ কাছেব জননী শান্ত হয়েছে।

বললাম, এ ভাবে চবমে উঠলে আমাদেব আলোচনা আপনা থেকে বন্ধ হয়ে যাবে।

সে ম্লান হেসে বললে, চরম কীর্তির আলোচনায চরমে না উঠে উপায়?

বললাম, তুমি শুধু ইঙ্গিত কর, বাকিটা আমি অনুমান কবব। নরকের অন্ধকাব আর স্বর্গের জ্যোতি টেনে আনলে দুটোই চোখকে খোঁচা দেবে, অসুস্থ কববে। আমরা পৃথিবীর মানুষ আমাদেব মাঝামাঝি রফা হওয়াই ভালো।

ভীরু! বলে সে হাসবার চেষ্টা করলে।

আমি বললাম, নিঃসন্দেহে। কিন্তু আর সমালোচনা নয়। যত রেখে ঢেকেই বল অপমানিত হব। তোমার কথাই হোক। তুমি যা বললে তাতে একটা প্রকাণ্ড মুশকিল আছে। বোধ হয় সে মুশকিলের অবসানও নেই।

কী মুশকিল?

আমার মতো ভীরু অকর্মণ্য থেকে আরম্ভ করে তোমার ছেলেদের মতো চোর-ছ্যাঁচোড়কে জন্ম দিতে সবাই যদি তোমার মতো অস্বীকার করে, দেশের সূতিকাঘরের সাড়ে তিনদিকের দেয়াল ভেঙে পড়বে। দেশটা তখন জন্মাবে কোথায়?

জন্মাবে না!

শুনে আমি থ বনে গেলাম। সে বললে, ভড়কে গেলে দেখছি। দুর্ভাবনার কারণ নেই। দেশের সূতিকাঘরের সাড়ে তিনদিকের দেয়াল কি আমার মতো মায়েরা? দেশ কি জন্মায় কেরানি আর অপদার্থ ধনীর ঘরে? শহরের বিষপান করে যে কটি মানুষ জ্ঞান হারিয়েছে তাদের বাড়িতে? কলকাতাতেই অগুনতি ডালিম বেদানা,—আইন করে তাদের সকলকে হত্যা করলে কলকাতার নারী-সমাজের কী আসবে যাবে? বরং লাভ হবে—ক্ষতি নয়। আমার মতো মায়েরা মা হতে অস্বীকার করলে সূতিকাঘরের অনাবশ্যক ভিড় কমবে, দেশের উপকার হবে। গান্ধারীর সংযমে কুরুক্ষেত্রের কলঙ্ক রদ হবে। ঘরের মানুষের সঙ্গে লড়াই করে ধর্মকর্মের শক্তিক্ষয় হবে না,—জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম জগতে ছড়িয়ে পড়ার সময় পাবে, জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্মী জগতের স্বাধীনতা মুহূর্তে অর্জন করবে। দুর্যোধনকে সজুত রাখতেই যুধিষ্ঠির আর অর্জুনের সময় ও শক্তি ব্যয়িত হলে গান্ধারীর কী লজ্জা ভাই? সহজ লজ্জায় কি মা হয়ে ছেলেকে বলেছিল, তোমার নয়, ধর্মের জয় হোক।

আমি বললাম, তবে বললে কেন—দেশ জন্মাবে না? কথাব সুরে মনে হল দেশ না জন্মালে ক্ষতি নেই।

সে বললে, ও যদির কথা। আমরা মা না হলে যদি দেশের সূতিকাঘরের সাড়ে তিনদিকে দেয়াল সত্যি ভেঙে পড়ে। জন্মানোটাই কি দেশের চরম সৌভাগ্য? না জন্মানোটা দুর্ভাগ্য? কত দেশ গেছে সমুদ্রের তলে, কত জাতির চিহ্ন লুপ্ত হয়েছে। সে জন্য কে তাদের দোষ দেয়? অবসানের দুঃখ কী? মৃত্যু যদি মানুষের লজ্জা না হয়, মানুষে-গড়া জাতির মৃত্যুতেও লজ্জা নেই। ক্রমাগত রোগে ভোগার চেয়ে বরং মরণ ভালো।

আমি বললাম, এ সব হতাশার বাণী, ভুল কথা। মৃত্যুতে মানুষের লজ্জা নেই, কারণ মৃত্যু যবনিকা নয়, পটপবিবর্তন। নিজের জীবন মানুষ পৃথিবীর মানুষের মধ্যে জমা করে রেখে যায়, স্বর্গে নিয়ে যায় না।

জমা করা জীবন যখন পচে যায়? একমাত্র নোয়া-কে বাঁচিয়ে প্রলয়ের মধ্য দিয়ে যখন ভগবান ভ্রম সংশোধন করতে বাধ্য হন?

তখন ভগবান অত্যাচারী খেয়ালি। প্রলয় যে এনে দিতে পারে সে সংস্কারে অক্ষম হবে কেন? জীবনের রোগ আছে, ফাঁসি ছাড়া আরোগ্য নেই? ক্রমাগত রোগে ভোগার চেয়ে মরণ ভালো, কিন্তু রোগ সারিয়ে বেঁচে থাকা আরও ভালো।

সে মৃদু হাসল, তোমার হল কী? আমি পুবে পা বাড়াচ্ছি, তুমি হাঁকছ পশ্চিমে যাত্রা নাস্তি। সুস্থ সবল হয়ে বাঁচা মন্দ আমি তা বলিনি। বলেছি, লয় অপরাধ নয়, লয়ে লজ্জা নেই। এটা আমাদের আলোচনা-গণ্ডির বাইরের অতিরিক্ত সত্য। আমার সমস্যার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে ব্যাকুল হয়ো না। পাগল! হাজার হাজার মানুষের দেহের রক্ত আর জীবনের দিন দিয়ে অসুস্থ দেশের জন্যে ওষুধ তৈরি হচ্ছে, আমি করব তার প্রতিবাদ? অতিরিক্ত দার্শনিক তত্ত্বকথা থাক, আমার কথাটা নিয়ে আলোচনা চলুক। আমি বলেছি, অসুস্থ দেশের ওষুধের উপযুক্ত জীবন সৃষ্টি হোক, কিন্তু কুপথ্য আর বিষের সৃষ্টি যেন না হয়। তুমি প্রতিবাদ কর?

আমি বললাম, ঠিক প্রতিবাদ নয়। বলতে চাই, সে তো তোমাদের হাতে।

মানে?

মানে, সব শিশুই আরম্ভ—পরিণতি নয়। জীবনের ভিত্তির মিস্ত্রিও তোমরা। তুমি ছেলে দুটিকে মানুষ করে গড়ে তুললে না কেন? স্বামীর মঙ্গল করতে পারলে না, তার কারণ বুঝতে পারি তার

শিক্ষা-দীক্ষা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল তোমার সঙ্গে পরিচয়ের আগে। কিন্তু তোমার ছেলেরা ভালো-মন্দ কোনো শিক্ষা নিয়েই জন্মায়নি। তাদের তুমি মানুষ করে গড়ে তুললে না কেন? নিজেই বললে তোমার শক্তি সামান্য। সামান্য শক্তি এত বড়ো দেশে ছড়িয়ে দিয়ে কী লাভ হবে? দুটি ঘুমন্ত দেশ-সেবককে জাগাতে পারলে সব চেয়ে বড়ো দেশসেবা হত না? কেন তা করলে না?

কেন করলাম না? পারলাম কই? খাঁচার শিকে শিকে বাধা পেলাম। কোলের ছেলে যখন এক বছরেরও নয়, গর্ভে ছেলে এল। সকাল-সন্ধ্যা রান্নাঘরে কাটল, বাকি সময় নানা কাজে। অভাবের খোঁচায় মাথায় ঘা হয়ে গেল, চিন্তার বিষে অবসন্নতা ও অবহেলা এল। যেটুকু সময় ও সাধ্য হাতে রইল, স্বার্থপর স্বামী ছিনিয়ে নিল। তবু আমি পারতাম। অতিমানুষ না করতে পারি অমানুষ হতে দিতাম না, যদি ওদের জীবন বিষাক্ত আবহাওয়ায় বিষিয়ে না যেত। চব্বিশ ঘণ্টা পলে পলে যাদের জীবন বিকৃত হয়, পাঁচ মিনিটের চেষ্টায় আমি তাদের কী করতে পারি? জন্ম থেকেই ওরা অভিশপ্ত। বাপের অসংযমে জন্মাল রুগ্‌ণ হয়ে, খাদ্যের অপ্রাচুর্যে দেহ-মন কুঁকড়ে গেল, বিকাশ হল না, জীবনীশক্তির অভাবে ক্রমাগত রোগে ভুগল, দোষে বিনাদোষে বাপের ছ্যাঁচা খেয়ে কুটিলতা শিখল, শিশুমনের তুচ্ছতম আকাঙ্ক্ষাটি অতৃপ্ত থাকায় চুরি শিখল, বাড়ির ভয় ও নিরানন্দের আবহাওয়ায় মন না টেকায় বেশি সময় বাইরে কাটাতে ভালোবাসল, যার তার সঙ্গে মিশে অসৎসঙ্গের অশেষ দোষ সঞ্চয় করল, পয়সা আর খাবারের লোভে বজ্জাত লোকের কাছে কামুকতার দীক্ষা পেল। এ তো সংক্ষিপ্ত হিসাব, আরও কত আছে! এবার বুঝলে কেন পারলাম না?

আমি কতক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। এ কী বর্ণনা, এ কী নালিশ! মনের জ্বালা কি শব্দের রূপ নিতে পারে? অত্যুক্তি মনে করার চেষ্টায় আমি ব্যর্থ হলাম, আমার কোনো সান্ত্বনা রইল না। শুধু মুখের কথা তো নয় যে, শোনার সঙ্গে হৃদয়ের যোগাযোগ কম বেশি করে যতটুকু মানলে মনের স্বস্তি ততটুকু মানব। সন্তানহারা মা আমার সামনেই বসেছিল। অত্যুক্তি যদি, ও কেন ছেলে ফেলে এল! সন্তান হারানোর চরম প্রমাণেই যে ও প্রমাণ করেছে অভিযোগ বাড়িয়ে বলা নয়!

সে বললে, অনেক দুঃখেই বাড়ি ছেড়েছি ভাই। আমি অভিশপ্তা স্ত্রী ও জননী, আমার সন্তান দেশের অভিশাপ, জীবনের এমন অসামঞ্জস্য বরদাস্ত হল না। আমি মুক্তি নিলাম। এ মুক্তি সময় সময় পীড়া দেয়, এগারো বছরের চেনা খাঁচার ডাক আমি শুনতে পাই। আমার বুক ফেটে যায়। আমি যাতনায় ছটফট করি। কতক্ষণের জন্য দেশের সেবায় দারুণ বিরাগ জন্মে। মনে হয়, ন্যাড়া হয়ে পথের ধুলোয় চোখ বুলিয়ে চলতে দেশের মানুষ যদি ভালোবাসে, ভালোবাসুক, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মুক্ত নীলাকাশের দিকে না তাকাতে চায় না চাক,—আমার কী? আমি কেন মাতৃত্বের আত্মহত্যা দিয়ে এমন নিষ্ঠুর পুজো করে চলি? কিন্তু এ দুর্বলতা কেটে যায়, মুক্তির পীড়ন গর্ব ও আনন্দ হয়ে ওঠে।

আমি বললাম, দেশে অসংখ্য পুরুষ দিদি। তরুণ তরুণীতে দেশ ভরা। তোমার মতো তারা মাটিতে শিকড়-বসা তরু নয়। নিজেকে উপড়ে তুলে এই অস্বাভাবিক ত্যাগ তোমার করতে হবে কেন? তুমি ফিরে যাও।

সে হাসল। —সংখ্যার গর্বে দেখি ফেটে পড়ছ! প্রমাণ কই? তুমি আমায় বুঝিয়ে দিতে পারবে যে আমি অনাবশ্যক অতিরিক্ত বাহুল্য? যদি পার, এখুনি ফিরে যাব। সতিনকে পর্যন্ত ভয় করব না। একটু থেমে বললে, তুমিও তো পুরুষ, না ভাই? শিকড়হীন পুরুষ! কেবল কলেজ ডিঙিয়ে শিকড় গাড়বার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছ, এই যা আপশোশ। একটি বাড়ি, টুকটুকে একটি বউ, চাঁদের টুকরো একটি ছেলে। খাসা শিকড়। না? লোভী!

আমি ক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম, অনেক আগে ঘাট মেনেছি, খোঁচাচ্ছ কেন?

খোঁচাচ্ছি? মাইরি না। কালীর দিব্যি। স্বামীর ভাষাতে প্রতিবাদ করলাম, আর রাগ কোরো না। বলে সে হাসল। আমি গম্ভীর হয়ে ভাবতে লাগলাম।

সেও গম্ভীর হয়ে বললে, সত্যি খোঁচাইনি ভাই। খোঁচাবার অধিকার কোথা পাব? যার যে অধিকার নেই সে তা করলে ভেবে নিতে হয় ঠাট্টা করেছে।

খোঁচাবার অধিকার তোমার কাছে।

না, নেই! আমার দেশসেবা যে বাধ্যতামূলক।

সে সবারই। অধীনতা বাধ্য করে।

করে কি? অধীনতার দুঃখ না স্বাধীনতার লোভ করে কী করে জানলে? না ভাই জবাব চাইনি। এ কথার জবাব মানে আধঘণ্টা ধরে তোমার বক্তৃতা। আমি জানি জবাব। দুই কারণেই। কিন্তু ও রকম দেশসেবা বাধ্যতামূলক নয় ভাই। তা হলে মাতৃস্নেহকেও বাধ্যতামূলক বলতে হয়। আমার এই সেবা কিন্তু সত্যি বাধ্যতামূলক। সে জীবন সইল না বলে আমি এ জীবনে আশ্রয় নিয়েছি—ঝড়ে ভাঙা তরী এনেছি বন্দরে। বেশি নয়, একটা ছেলেকেও যদি মানুষ করতে পারতাম আমি সেখানকার মাটি কামড়ে থাকতাম। আকণ্ঠ নয়, ব্যর্থতায় একেবারে তলিয়ে গিয়ে দম আটকাল বলেই না এখানে নিশ্বাস ফেলতে এসেছি! আমি আজ সুখী দুঃখী দুই, কিন্তু এগারো বছর যে দেয়ালের অন্তরালে ছিলাম সেখানে থেকে সন্তানের মধ্য দিয়ে দেশের সেবা করতে পারলে আরও সুখী হতাম। কিন্তু এ কথাটাও বলি, আমার এ জীবন তুলনাহীন। ছিলাম যন্ত্র—আজ আমি মানবী, যার আত্মা আছে, যার জীবনের অনেক মূল্য, অনেক প্রয়োজন, অনেক মানে। বেশি কী, আমি আজ তোমার প্রণম্য!

আমি নীরবে তাকে প্রণাম করলাম, পেলাম আশীর্বাদ। তারপর চুপ করে বসে রইলাম। সূর্য তখন নদীর অপর তীরে, তরুশ্রেণির খানিক ঊর্ধ্বে। নদী দিয়ে একটি স্টিমার চলে গেল, তীরে আছড়ানো ঢেউ-এর শব্দ মৃদুভাবে কানে এল। কয়েকটা বক নদীতীরে বসে ছিল, হঠাৎ উড়ে গেল।

মমতাদি বোধ হয় ভাবেনি এত শিগগির আমি তাকে রেহাই দেব। স্পষ্ট অনুভব করলাম সে আমার কথা বলার প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু আমি আর মুখ খুললাম না। কত কথা তো বললাম, কিন্তু কথা বলে লাভ কী? সংসারের জ্বালায় কত মানুষ গেরুয়া পরে পালিয়েছে, কত মানুষ খেপে গেছে, কত মানুষ আত্মহত্যা করেছে,—মমতাদি যদি জগতের মধ্যে মহত্তম কর্ম-বৈরাগ্যে আধপোড়া মনের আগুন নেবাতে চায়, কথার বিনিময়ে কোনো কিছুর এদিক-ওদিক হবে না। পরিণয়ের যজ্ঞভস্মে ঘি ঢেলে চলা যত বড়ো কর্তব্য হোক, সেটা ঘিয়ের অপচয় নিশ্চয়ই ; সে অপচয় বন্ধ করা যত বড়ো অকর্তব্য হোক, স্বাধীনতার হোমানলে ঘি ঢেলে চলা যে ঘিয়ের সবচেয়ে সদ্ব্যবহার তাও নিশ্চয়ই। সুতরাং নানাবিধ ধারণা ও সংস্কারে বোঝাই মন নিয়ে তর্ক করা কথারই অপচয়।

অতএব কথা বন্ধ করে আমি ভাবতে লাগলাম অধুনা-পরিত্যক্ত স্বামী-পুত্রের কল্যাণে এই নারীটি একদিন আমাদের বাড়ি রাঁধুনি হয়েছিল,—গভীর রাত্রে ঘুমের কবল থেকে ছিনিয়ে-নেওয়া কয়েক ঘণ্টা সময় ছাড়া এগারোটি বছর একটানা বেঁচেছিল শুধু স্বামী-পুত্রের জন্য।

স্নেহ, প্রেম, মমতা মানুষের নাগপাশ। নাগপাশে মূর্ছার তন্দ্রা। সে নাগপাশে আবদ্ধা থেকেও যে মোহনিদ্রা টুটিয়ে দিলে, বাঁধন-সুদ্ধ যে বেরিয়ে পড়ল পথে, পাশবদ্ধ কর্মশক্তি নিয়ে যে সকলের জন্য যে-বিপুল কাজ পড়ে আছে তার নিজের ভাগটুকু শেষ করতে প্রবৃত্ত হল তাকে বোঝা যায় না। সে দুর্বোধ্য, তাকে ঘিরে রহস্য। মমতাদির শান্ত ও গম্ভীর মুখ দেখে আমার মনে হল, রাঁধুনির কাজ নিতে এসে যে আমার শেষ-শৈশবে স্নেহ-করার শক্তিতে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছিল, আজ আমার প্রথম যৌবনে সে আবার স্নেহ অস্বীকার করার শক্তিতে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে।

সন্ধ্যার সময় বিদায় নিলাম—প্রদীপ জ্বালার আগে। সে বললে, তোমায় একটা কাজ দেব।

কী কাজ?

সপ্তাহে একখানা কার্ড লিখে ওদের খবর দেবে।

কী খবর? কুশল?

হুঁ, বলে সে চোখ মুছতে মুছতে হাসল।

বলছ ওদের। ওদের মানে কী তোমার স্বামীরও?

নিশ্চয়। আধখানা কুশল-সংবাদ নিয়ে করব কী?

স্বামী-ভাগ একেবারে আধখানা! একটা স্পষ্ট জিজ্ঞেস করছি। স্বামীকে তুমি ভালোবাসতে? —বাসো?

সে একটু ভাবল, ভালোবাসা? প্রেম? কী জানি ভাই, ও সব বুঝি না। এইটুকু বুঝি যে না দেখলে মন কেমন করে, খবর জানতে ইচ্ছা হয়। এগারো বছর যার ঘর করা যায় তার হীনতা বোধ হয় স্নেহমমতাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

আজ ঠিক কবতে পারি না তার স্বামীপ্রেম ছিল কী ছিল না।

শিপ্রার অপমৃত্যু

এবার, ছত্রিশ সালের এই মহাপূজার সময় পরাশর, শিপ্রা ও অনিন্দিতা পদ্মাতীরের কোকনদে একত্র হয়েছে। অনিন্দিতার গ্রামে আসবার কারণটির মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নেই। তাব আত্মীয়স্বজন কয়েক বছর ধরে বসবাস করছেন দেশে। কলেজের ছুটি হলে শিপ্রাও আত্মীয়স্বজনের কাছে এসে থাকতেই ভালোবাসে।

পরাশর এসেছে তার বাবার কাছে থেকে কিছু টাকা আদায়ের চেষ্টায়। এবাব তার ধারটা হয়েছে বেশি। বৈশাখ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত পরপর দুটি সোসাইটি গার্লের বিলাসিতার খরচ জোগানো সহজ কথা নয়। যথেষ্ট কৃপণতা করেও পরাশরের ধার না করে চলেনি। মেয়ে দুটির সঙ্গে একে একে তার বিচ্ছেদ হযেছে, ছ মাসের মধ্যে দুটি অস্ত্রোপচার। ক্ষতেব চিহ্ন অবশ্য লোপ পেয়েছে একমাসের মধ্যেই কিন্তু ধারটা বেঁচে থেকে সুদে বেড়েছে। আগে পরাশরের ভাবনা ছিল না। চিঠি লিখে টাকাটা চেয়ে পাঠালেই জবাবে কিছু গালাগালি দিয়ে মধু বোস তাকে টাকা পাঠিয়ে দিত। এখন সে সহজে টাকা দিতে চায না। বুড়ো হয়ে মধু বোস হয়েছে ভারী কৃপণ, বেশি টাকা চাইলে রেগে যায়। স্পষ্ট বলে, দেব না, দরকার থাকে বোজগার করে নাও গে। তার এই সুস্পষ্ট না-কে হাঁ তে পরিণত করতে মার সাহায্যে পরাশরের অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। সে এত বেশি আরামপ্রিয় অলস প্রকৃতির লোক যে কোনো ব্যাপারে কাঠ-খড় পোড়ানো আর নিজেকে পোড়ানোর মধ্যে তার বিশেষ কোনো পার্থক্য থাকে না।

মাকে পত্র লিখলে মা জবাবে লেখেন : এক বছরের বেশি বিনা কাজে কলকাতায় বসে আছ। কখনও চিঠিপত্র লেখ না। উনি বড়ো রেগে আছেন। তুমি একবার বাড়ি এলে টাকার কথা বলতে পারি। ইতি মা।

সুতরাং শুধু বাবা নয়, মাও ভয়ানক রেগে আছেন বুঝতে পেরে পবাশরকে গ্রামে আসতে হয়। দিন পনেরোর জন্য জীবনটা ব্রেক কষে থেমে থাকে। জগৎ জুড়ে থাকে শুধু একটা গতিহীন স্তব্ধ বিষণ্ণতা।

শিপ্রার কোকনদে আসবার কারণটি পুরোনো। সে শহরের মেয়ে। শহরের রাশি রাশি ইটের আনাচে-কানাচে নিশ্বাস ফেলে সে বড়ো হয়েছে। সংকীর্ণ গৃহ, সীমাবদ্ধ আকাশ, শুধু সম্মুখ ও পিছন-থাকা পথ, পুনবাবর্তিত কর্তব্য ও অবকাশ! সব জড়িয়ে বাহান্নটি সপ্তাহে তার বছর, এ বছরের সঙ্গে ও বছরের কোনো পার্থক্য নেই। বেড়াতে যদি সে কখনও যায় তো মাইনের টাকা বাঁচিয়ে হয় একা, নয় দু-চারজন বন্ধুর সঙ্গে যায় পশ্চিম, যায় পুরী। পাহাড়ের বন্ধুর পথে হেঁটে বেড়িয়ে সে হাঁপায়, সমুদ্রতীরে বালিতে লুটোপুটি খেয়ে সমুদ্রস্নান করে আর সর্বদা আধ-আধ অন্যমনস্ক হয়ে হতাশ অবসন্ন হৃদয়ে ভাবে, সমস্ত জীবনটার মতো এবারের ছুটিটাও তার মাঠে মারা গেল। তারপর একদিন সে মরিয়া হয়ে চলে যায় তার পিসিমার কাছে হাজারিবাগে। কয়েকদিন বাড়ির রান্না ঝোল-ভাত খেয়ে বর্ধিত রক্তের রঙে চামড়ার ধবধবে সাদা রংটা একটু রঙিন করে এনে এবং দু-চারদিন বনে-জঙ্গলে পিকনিক করে ফেরে কলকাতায়। সেখানে ছুটির বাকি কটা দিন ঝিমিয়ে স্কুল খুললে রোজ চার ঘণ্টা সিক্সথ্ ক্লাস থেকে ফার্স্ট ক্লাস অবধি বাংলা পড়িয়ে যায়।

নদীর দেশে এসে কিছুদিন থাকবার প্রবৃত্তি সে সংগ্রহ করেছে অনিন্দিতার কাছ থেকে। অনিন্দিতাব চেয়ে বয়সে সে সাত-আট বছরের বড়ো হবে। কিন্তু এতগুলি বছরের ব্যবধান তাদের মধ্যে নেই। দুটি পুরুষের মধ্যে বয়সের এই পার্থক্যের অর্থ যা দাঁড়ায় মেয়েবা সচরাচর তা মেনে চলে না। কুড়িব পর ওদের বয়স বাড়তে বছর দশেক সময় লাগে। কুড়ির পর একেবারে একত্রিশ, মাঝখানে আব বছবের পদক্ষেপ নেই। সম্পর্ক মেনে চলার হিসাবেও ওবা সাধারণত পুরুষেব অনুকবণ কবে না। ওদেব মধ্যে যাবা গুরুত্ব ও গৌবরের মোহগ্রস্তা, মেজাজ যাদেব চড়া এবং স্বভাব যাদেব কড়া, ছোটো ছোটো বালিকাদের বন্ধুত্ব বঞ্চিত করতে পাবলেও প্রতিদিন একঘণ্টা সময় একত্র থাকতে হয়, সতেবো পেবোনো এমন একটি মেয়েকে সাতদিনের বেশি গাম্ভীর্যেব আড়ালে ঠেকিয়ে রাখতে ওবা মরে যায়। বিকাশ পাওয়াটাই মর্মকথা কিনা। আজ যে বিকাশ পেল তার দাম বিকাশ যার পুবোনো হয়ে এল তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়। এই নির্মম সত্যকে সাতদিনের বেশি উলটিয়ে রাখাব ক্ষমতা ফুলের উপমায় পুলকিতা নারীর নেই। তাই, একদিন যদিও শিপ্রা কিছুকাল তার মামাব বাড়িতে শিক্ষযিত্রী রূপে বাস করেছিল এবং ক্লাসে আবও ত্রিশটি মেয়েব সঙ্গে তাকেও সামনে বেঞ্চিতে বসিয়ে বেখে নিজে উঁচু প্ল্যাটফর্মে-পাতা চেয়াবে বসে সপ্তাহে চারদিন একঘণ্টা করে বাংলা পড়িয়েছিল, ওদেব বন্ধুই বলতে হয়। এক পক্ষেব কিছু কিছু পৃষ্ঠপোষক স্নেহ এবং অপব পক্ষের জোব করে বাঁচিয়ে বাখা সম্মানের ভেজাল হয়তো কিছু মেশানো আছে কিন্তু অনেক সমবয়সি বন্ধুর সম্পর্কেও তা থাকে।

কথ্যভাষায় অনিন্দিতাব দখল আছে। কথা সে অনর্গলই বলে। বর্ণনাব বর্ণে ছবি আঁকাব ক্ষমতাও তাব নিন্দনীয় নয়। খানিকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে তাব কথা শুনে গেলে তার মানসিক প্রক্রিয়া ও হৃদযাবেগগুলি এত সহজে ও এমন নির্ভুলভাবে অনুসরণ করা যায় যে মনে হয় ওর কপালেব হাড আব বুকের পাঁজব স্বচ্ছ হয়ে মস্তিষ্ক ও হৃৎস্পন্দন চোখে দেখতে পেলেও এর চেয়েও ভালো কবে ওকে বোঝা যেত না। বিপুল বিস্তীর্ণ নদীর ভাঙন-ধবা তীবে অস্থায়ী স্টিমারঘাটটির আধমাইল তফাতে তাদেব অতি শ্যামল, অতীব মনোবম গ্রামটিব কথা শুনে শুনে শিপ্রার মনে হত, বাবা, অমন দেশে মানুষ যায়! তাই, এবার পশ্চিম অথবা পূবী যাবাব টাকা হাতে না থাকায় এবং হাজাবিবাগের পিসিমা কবাচি চলে যাওয়ায় অনিন্দিতা ডাকা মাত্রা শিপ্রা তার সঙ্গে কোকনদে চলে এসেছে।

গ্রামে এসে অনিন্দিতা গেঁয়ো বনে যায়। স্টিমাব থেকে নামাব আগেই মন থেকে সে শহরেব আবরণ খসিয়ে দেয়, বাড়ি পৌঁছে শহরেব বেশও পরিবর্তন কবে ফেলে। হাঁপ ছেড়ে সে বাঁচে না কারণ শহরকে অপছন্দ কবার মতো গেঁয়ো সে নয়, হোস্টেলের জীবনকে সে অপ্রীতিকর মনে করে না। শহরকে সে পছন্দ করে, গ্রামকে সে ভালোবাসে। মন ও হৃদয়েব ভিত্তি তার গ্রাম্য। গ্রামের খাল ও পুকুরে তার দুরন্ত শৈশব বহুকাল সাঁতাব দিয়েছে, গাছের ডগা থেকে পাখির ছানা পেড়েছে, কলহান্তরিতাকে দূব থেকে ঢিল ছুঁড়েছে, আমবাগানের নিয়ী নির্জনতায় গাছের তলা থেকে শুকনো পাতা ঝাঁট দিয়ে পেতেছে খেলাঘর। যে বয়সে আত্মীয়ের সতর্ক-রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া সে নিরাপদ নয় সে বয়সেও পদ্মার মাঝিদের সঙ্গে ভাব করে তাদের সঙ্গে একা নদীর বুকে নৌকায় ভেসে বেড়িয়েছে। এ সব এখন ইতিহাস, এ জীবনে হয়তো পুনরাবর্তন নেই। কিন্তু বিদেশ থেকে দেশে এসে গ্রামের মাসি পিসি ও সখীদের মধ্যে, গ্রামের কাকা ও দাদাদের মধ্যে ও নিজের বাড়িতে পুরোনো স্থানটি অনিন্দিতা আজও বিনা চেষ্টায় দখল করে নিতে পারে। গ্রাম্যতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সে কখনও লড়াই করে না, বয়স্কা মেয়েদের করা উচিত নয় এমন দু-একটি পুরুষোচিত অকাজ এখনও

মাঝে মাঝে করে ফেললেও প্রথা সে সবই মেনে চলে। ঘরে বাইরে কোথাও তার সংস্কার সাধনের প্রয়াস নেই। যা আছে তাই তার ভালো, সে সমালোচনা করে না।

ঘরে এসে সে এত বেশি করে ঘরের মেয়ে হয়ে যায় বলে গৃহপ্রবাসী পরাশরের মনে হয় সে একটা অচেনা মেয়ে, কলকাতায় ওর সঙ্গে তার কোনোদিন ঘনিষ্ঠতা হয়নি, ছেলেবেলার প্রায় ভুলে-যাওয়া পরিচয় ছাড়া ওর সঙ্গে তার আর কোনো সম্পর্ক নেই। পদ্মানদীর জোলো বাতাস দিবারাত্রি পরাশরের গায়ে লাগে কিন্তু সে বাস করে তার একটি নিজস্ব নিঃসঙ্গতার আবহাওয়ায়। শহরেব অনিন্দিতাকে নিয়ে কয়েক ঘণ্টা সময় সে অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারে কিন্তু এখানে গ্রামের স্তিমিত নরনারীর সঙ্গে এমন করে মিশে গিয়ে সময়ের বহু পিছনে পড়ে-থাকা এখানকার স্থায়ী স্তব্ধতায় এমন করে ডুবে যায় যে তার সান্নিধ্যের সঙ্গ পরাশর পায় না।

সকালে গিয়ে হাজির হলে বলে, বসো। রাঁধছি।

রেঁধে কী করবে। পারিবারিক প্রবন্ধ পড়তে বসবে? বলে পরাশর চলে আসে।

বিকালে অনিন্দিতা বলে, বসো। এদের চুলবাঁধা শেখাচ্ছি। এলোচুলে কত রকম খোঁপা হয় তাই।

পরাশর রেগে বলে, নিজের চুল বাঁধবার সময় পাওনি দেখছি!

সময় লাগে না। এই দ্যাখো—

নিমেষে চুলগুলি জড় করে অনিন্দিতা এলোখোঁপা বেঁধে নেয়।

বলে, বসবে না কি?

পরাশর বলে, বসব। নদীর ধারে। তোমার বাড়িতে নয়।

চুলবাঁধা শেখানো শেষ করে অনিন্দিতা নদীর ধারে যায়। পরাশরকে দেখতে না পেয়ে ভাবে, কলকাতায় থেকে থেকে একেবারে বখাটে হয়ে গেছে। মিথ্যা কথা মুখে আটকায় না।

দেখা হলে পরাশরকে সে খানিক উপদেশ শোনায়। কলকাতায় ফিরে যেতে বারণ করে। গ্রামে থাকতে অনুরোধ জানায়।

জিজ্ঞাসা করে, এ বছর কটা পয়সা ইনকাম হয়েছে?

এক পয়সাও নয়। পরাশর সগৌরবে স্বীকার করে।

একটা বছর তুমি তবে গ্রামে থাকো এবাব। মনের বিষ কেটে যাবে। কলকাতায় যে তিন-চার হাজার টাকা খরচ করছ সেটা বাঁচাতে পারলেও একটা ইনকাম হচ্ছে ভেবে নিজের ওপর তোমাব একটু শ্রদ্ধাও হবে। নিজেকে ঘৃণা করছ বলেই তুমি আরও বেশি গোল্লায় যাচ্ছ মন্টু।

পরাশর গলায় ঝাঁজ এনে বলে, এ রকম উপদেশ ঝাড়তে শিখবে বলেই তোমাকে সংস্কৃত নিতে বারণ করেছিলাম। চালকলাভোজীদের প্রভাব যাবে কোথায়?

তুমি কিছু বোঝ না। তুমি থাকলে আমিও থাকব। তোমার যতক্ষণ খুশি রোজ আমার সঙ্গে এসে ঝগড়া কর। এবার তাহলে আমার একজামিন দেওয়া হবে না। কিন্তু তোমার সংশোধনের জন্য তাতেও আমি রাজি আছি।

অনিন্দিতার অনুরোধ ও উপদেশ ভাসা-ভাসা ছাড়া-ছাড়া ছেলেমানুষি নয়। তার বলবার ভঙ্গিতেই বোঝা যায় এ বিষয়ে সে অনেক ভেবেছে। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে সে একটু হাসে, একটু আচার অথবা তেঁতুল-মাখা মুখে দেয়, কপালের বাঁ দিকে গভীর ক্ষতচিহ্নটি অন্যমনস্ক অভ্যাসে বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে ঘষতে থাকে, সরু চেনহারটি জামার ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। তার এই পরিচিত মুদ্রাদোষগুলি তার কথাকে হালকা করতে পারে না। পরাশরকে সে যে প্রলোভন দেখায় তাও জোরালো হয়েই থাকে। কিন্তু পরাশর এত রেগে যায় যে তার প্রলোভনে কাজ হয় না।

পরাশর বলে, আগে বিয়ে হোক, এখানে এক বছর হনিমুন করতে পারি। এই গাঁয়ে বসে এক বছর কোর্টশিপ চালানো আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।

তুমি কিছু বোঝ না।

তোমার সঙ্গে মিশেই আমার বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে।

অনিন্দিতা নকল নিশ্বাস ফেলে বলে, সেকালের মেয়েরাই ছিল সুখী। কারও মুখের কথায় নির্ভর করে মরতে হত না। সাতটা সমুদ্র তেরোটা নদী আর সাতশো রাক্ষস তাদের পক্ষ হয়ে এমন প্রমাণই আদায় করে নিত, একালের সাইকলজিও যা পারে না। একালের ছেলেগুলি সমুদ্রে পাড়ি দেয় শুধু ডিগ্রির জন্য। কপাল কী আমাদের ফুটো হয়েছে এমনি!

কথা-ভাষায় অনিন্দিতার দখল থাকার জন্য কথাগুলি পরাশরের মর্মে গিয়ে বেঁধে।

তোমার কপাল ফুটো হয়েছে গাছ থেকে পড়ে। আমি ফেলেও দিইনি।

অনিন্দিতা বলে, না। তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে ধরে তুলেছিলে। আর সেই আঠেরো বছর বয়সে পাকা রাক্ষসের মতো শুষে খেয়েছিলে আমার ফুটো কপালের রক্ত।

তুমি মরে গিয়েছিলে ভেবে চুমু খাচ্ছিলাম।

তোমার আশেপাশে থাকলে আমাকে অমর হতে হবে।

পরাশর তার সমস্ত আভিজাত্য ভুলে চাপা গলায় ধমক দিয়ে বলে, অমর হয়ে তুমি যদি সারাজীবন তপস্যা করো, আর মরে মরে আমার পাঁচশো জন্ম কেটে যায়, তবু আমার ধারে কাছে থাকবার সুযোগ তুমি পাবে না অনি।

কোকনদে পা দিয়ে ওদের ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝে শিপ্রা খুশি হয়ে উঠল। বুদ্ধিটা তার যেন অকস্মাৎ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়ে গেল। একটা রাত্রি সে এমন নিবিড়ভাবে চিন্তা করল যে তার ভালো ঘুম হল না।

পরদিন থেকেই এই নিরীহ কোকনদ গ্রামটিতে সে তার শহরটি রচনা করে নিল। এমন অকস্মাৎ সে গ্রাম ও গ্রাম্যতার বিরুদ্ধে তার আশ্চর্য বিদ্রোহ শুরু করে দিল যে অনিন্দিতার বাড়ির মেয়ে ও পুরুষ গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা চমকে গেল। আজকালকার দিনে এমন গ্রাম খুব কমই আছে যার দু মাইল পরিধির মধ্যে দুটো-একটা গোল্ডফ্লেক সিগারেটের দোকান নেই। গ্রামের বুকে শহরের আকস্মিক আবির্ভাবে ভড়কে যাবার পাত্র একালের গ্রামবাসী নয়। তারা টিউবওয়েলের জলে চা তৈরি করে খায়, মাথার উপর দিয়ে এরোপ্লেন উড়ে গেলে চোখ তুলে একবার তাকিয়ে দেখেই কাস্তে ধরে ধান কাটে। কিন্তু শিপ্রাকে ঘিরে এ যে কোন দেশি শহর গড়ে উঠল কেউ তা ভেবে পেল না। মাটির পৃথিবীতে মাটির মানুষ যে সব শহর রচনা করে শহুরে হয়েছে সে সবের সঙ্গে শিপ্রার যেন যোগ নেই। সে যেন আকাশের পরি, কাল বিকালের ঝড়বৃষ্টিতে আকাশ থেকে খসে পড়েছে।

শিপ্রার শাড়িসম্পদ ছিল প্রচুর। সকালবেলা প্যারাসোল হাতে পরি সেজে সেই যে সে বেড়াতে যায়, সারাদিন কয়েকবার বেশপরিবর্তন করলেও তার বেশে পরিত্বের ছাপ কখনও ঘোচে না। তার চলার ভঙ্গি, তার কথা ও হাসি, তার নাওয়া ও খাওয়া এবং বিশ্রাম সমস্তই এমন অসাধারণ ও অস্বাভাবিক হয়ে যায় যে তার শরীরটা মেয়েমানুষের রক্তমাংসে তৈরি কিনা সে বিষয়ে অনেকের সন্দেহ জাগে। প্রাণের প্রাচুর্যে সে যেন ফেটে পড়তে চায়, কী করবে দিশে পাচ্ছে না। গ্রামে পা দেবার সাতদিনের মধ্যেই পূজার ছুটিতে যে কটা কলেজের ছেলে বাড়ির দুধ-ভাত খাবার জন্য গ্রামে এসেছিল তাদের একত্র করে সে আড্ডা দেয়, গান শোনায়, নাচ দেখায়, আর আজ একে কাল ওকে নিয়ে অনভ্যস্ত লোকেরও বোধগম্য হয় এমনিভাবে ফ্লার্ট করে। সাতবছরের মেয়ের অপরিমেয় চঞ্চল উল্লাসে পরাশরের চোখের সামনে ওদের সঙ্গে সে গ্রামের পথে রেস দেয়, গৃহে পরাশরের

সান্নিধ্যে সে ওদের কাছে হয়ে ওঠে হরিণীর মতো চপল,—রানির মতো প্রভাবশালিনী, অভিনেত্রীর মতো রহস্যময়ী, প্রবঞ্চিতার মতো সংযত, প্রজাপতির মতো হালকা।

তার পাশে অনিন্দিতা বৈদ্যুতিক বাল্‌বের পাশে প্রদীপের মতো নিভে যায়। শিপ্রার দিকে তাকিয়ে পরাশর চিন্তিত হয়ে ওঠে।

নাম ছড়ায়। কলকাতার একটি নগণ্য স্কুল-মিস্ট্রেস আশেপাশের দশটা গ্রামে আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। একদিন সন্ধ্যার পর বেড়িয়ে ফিরবার সময় অন্ধকারে একটা মাটির ঢেলা শিপ্রার পিঠে এসে গুঁড়ো হয়ে যায়, আট-দশ মাইল দূরের গ্রাম থেকে দু-একজন তাকে দেখতে আসে। জীবনের ত্রিশটা বছর মানুষের মতামতকে সম্মান করে নিরীহ ও ভীরু হয়ে থেকে একটি কাম্য ভবিষ্যৎকে হঠাৎ একদিন গায়ের জোরে সৃষ্টি করার চেষ্টা শুরু করেই শিপ্রা চারিদিকে বিস্ময় কৌতূহল ও কৌতুক পুঞ্জীভূত করে দেয়। যৌবনের মৃত্যুর তার বেশি দেরি নেই। সমস্ত ভয়ভাবনা বিসর্জন দিয়ে জীবনকে সে মরণকামড় দিয়ে আয়ত্ত করতে চায়।

অনিন্দিতার বাবা ছিলেন বিদেশে। অনিন্দিতার মা সভয়ে মেয়েকে বলেন, এ তুই কাকে বাড়ি নিয়ে এলে অনি?

অনিন্দিতা চিন্তিত মুখে বলে, ওর বোধ হয় নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে মা।

নার্ভাস ব্রেকডাউন হোক আর যাই হোক ওকে এবার তুমি যেতে বলো বাছা। দশ-বারো দিন হয়ে গেল, এখনও কোন লজ্জায় ও পরের বাড়ি পড়ে আছে?

দেখি আর দুটো দিন।

কিন্তু শিপ্রা যাই আরম্ভ করুক, একটা আশ্চর্য সংযম সে আগাগোড়া বজায় রেখে চলছিল। তার সাজগোজ অশ্লীল নয়, তার আড্ডাতে হল্লা হয় না, তার ফ্লার্টিং শুধু কথা ও হাসির। ভোরে ঘুম ভেঙে রাত্রে বিছানায় যাওয়া পর্যন্ত অজস্র খাপছাড়া কাণ্ডে সে সকলকে উত্তেজিত করে রাখে কিন্তু নিজে সে উত্তেজিত হয় না। তার কথা হয় মৃদু ও সুরের রেশ লাগানো, তার হাসি হয় অপার্থিব একটা অধর-ভঙ্গি, তার চলন হয় ঢিমে তালের একটা নৃত্যছন্দ! এক কাব্যাত্মক আভিজাত্য, খুব উঁচুস্তরের আধুনিকতা ব্রহ্মাস্ত্রের মতো আত্মরক্ষার জন্য সে পরিস্ফুট করে রাখে। গ্রামের অল্পশিক্ষিত অল্প আলোকপ্রাপ্ত নবনারীর মধ্যে সে আলোর মতো উদয় হয়েছে, এরা যদি তাকে পছন্দ না করে সেটা হবে এদেরই সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারের দোষ, এদেরই পিছনে পড়ে থাকার পরিচয়। এ ছাড়াও শিপ্রার আরও একটা চালাকি আছে। অনেক ভেবে কৌশলে সে এই ভাবটাও বজায় রেখেছে যে, সে সকলকে মাতায়নি তাকে নিয়ে সকলে মেতেছে। অনিয়ম ও অসংযম যদি কিছু ঘটে থাকে তার দায়িত্ব অন্যের, তার নয়।

পরাশর প্রথমে দূর থেকে শিপ্রাকে লক্ষ করছিল, অনিন্দিতার মধ্যস্থতায় তার সঙ্গে প্রথম যে ভদ্রতার পরিচয় হয়েছিল মাঝখানে অনিন্দিতাকে খাড়া রেখে এ পরিচয়কে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে দেয়নি। কিন্তু অনিন্দিতাকে শিপ্রা এক রকম ঠেলে সরিয়ে দিল। অনিন্দিতার ক্ষমতা রইল না পরাশরের সান্নিধ্যে শিপ্রাকে সহ্য করে। শিপ্রার এক একটি বানানো কথা, এক একটি নকল হাসি তার কানে আর চোখে বিঁধতে আরম্ভ করতেই সে দুজনকে আসর ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল। তখন শিপ্রার বন্ধু হয়ে উঠতে শহরবিরহী পরাশরের সূর্যকে বার তিনেকের বেশি অস্ত যেতে হবে না।

পরাশরকে শিপ্রা যখন সকালে প্যারাসোল হাতে বেড়াতে যাবার সময়, অপরাহ্নে বসে গল্প করার সময়, সন্ধ্যায় নদীর ধারে নির্জনতা উপভোগ করার সময় এবং রাত্রে গান শোনাবার সময় কাছে রাখার শক্তি অর্জন করলে, কলেজের ছেলেগুলিকে সে তখন বিদায় করে দিলে। চিরবিদায় নেওয়া সে সব ছেলেমানুষগুলির পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাদের চিরবিদায় দেওয়া শিপ্রাও ভালো মনে

করেনি। পরাশর সর্বদা একেবারে একা থাকলে তার মতো ভয়ংকর শত্রুরেকে খুশি করে রাখতে পারার ক্ষমতা তার নেই এ কথা শিপ্রা ভালো করেই জানত। তাই বিদায় করে দিলেও ওরা যে পরিমাণ আসা-যাওয়া বজায় রাখল শিপ্রা সেটুকু গ্রহণ ও অনুমোদন করল।

পরাশর বোকা নয়, সে সব বুঝতে পারে। শিপ্রাও বোকা নয়, পরাশর যে সব বুঝতে পারছে এটা বুঝতে পারে সে। কিন্তু পরাশর তার ভানকে গোপন করলেও শিপ্রা এ বিষয়ে কোনো ছলনার আশ্রয় নেয় না। তার জটিল মস্তিষ্কগত হৃদয়াভিযানে তাই একটি মনোরম সারল্যের ছাপ পড়ে। পরাশরের তা ভালো লাগে। এদিক দিয়ে সে একটু দুর্বল বোহেমিয়ান। বুদ্ধি দিয়ে গড়ে তোলা ভালোবাসার মধ্যেও সে একটু বোকামি একটু সরলতার খাদ পছন্দ করে। তার রঙিন কাগজের ফুলটির অন্তত চেহারায় আসল ফুলের মতো হওয়া চাই।

অনিন্দিতা মার কাছে যে দুদিন অপেক্ষা করে শিপ্রাকে চলে যেতে বলবে বলেছিল সে দিন দুটি পার হয়ে যাবার আগে নিজের প্রয়োজনেই শিপ্রা তার সৃষ্টি করা শহরকে নিজের চারিদিকে ঘনীভূত করে আনল। বাইরে সাধারণের কাছে সে যতটুকু প্রকাশ করতে লাগল তা প্রশংসনীয় না হলেও এত বেশি নিন্দনীয় নয় যে সে জন্য তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যায়। সর্বনাশের ধারে এসে শিপ্রা তাই অল্পের জন্য বেঁচে গেল। তাকে একদিন একটু সাবধান করে দেবার বেশি অনিন্দিতা আর কিছুই করতে পাবল না।

বদনাম কুড়োচ্ছ কেন শিপ্রাদি?

অনেক বয়েস হল, এই বেলা একটু কুড়িয়ে না নিলে আর তো পাব না।

কলকাতায় কুড়োলেই হত।

পরেব বাড়ি অতিথি হয়ে থাকবাব সময় কোনো বিষযে বাড়াবাড়ি ভালো নয়, অনিন্দিতা এই কথাটাই এ বকম মোলায়েম করে শিপ্রাকে বোঝাতে চেয়েছিল। কিন্তু শিপ্রা এখন কিছুই বুঝতে চায় না।

কলকাতা মস্ত শহর। বদনাম তৈরি করার কম্পিটিশন পর্যন্ত সেখানে এমন জোরালো যে আমি পাত্তা পাই না অনি। তাছাড়া, কলকাতার বদনাম কর্তাদের কানে গেলে চাকরিটা যাবে।

অনিন্দিতা তার মুদ্রাদোষের আশ্রয় নিয়ে বললে, তোমার স্বভাব সত্যি ভারী খারাপ হয়ে গেছে শিপ্রাদি। গাঁয়ে এসেও কদিন একটু সামলে চলতে পার না?

শিপ্রা গুনগুন করে গান ধরে দিল। বললে, এতদিনে একটু বসন্ত এসেছে, এত জেলাস হসনে অনি। তোর গোল্ডেন ড্রিম তোরই থাকবে।

অনিন্দিতাকে একটু হাসতে হল।

অনি যেদিন জেলাস হবে অনির তুলনায় জগতের সবাই সেদিন হবে বদ্ধ পাগল। বাজে সেন্টিমেন্টর চেয়ে কমনসেন্স আমি বেশি পছন্দ করি। এ হল রিয়ালিজমের যুগ। এ যুগে প্র্যাকটিক্যাল না হলে কোনো মেয়ের চলে?

শিপ্রা তখনও গুনগুন করে গান করে। অনিন্দিতার মুদ্রাদোষ কপালেব ক্ষতচিহ্নটি আঙুল দিয়ে ঘষা আর শিপ্রার মুদ্রাদোষ গুনগুনানো গান।

তোর বুদ্ধি এখনও কাঁচা আছে অনি। পৃথিবীতে রোমান্স না থাকলে মেয়েদের উপায় আছে? রোমান্টিক যুগে মেয়েদের ভোঁতা হওয়া চলত, হাজার প্র্যাকটিক্যাল হলেও ক্ষতি ছিল না। এখন পুরুষরা রোমান্স ভুলতে বসেছে, সিনিক আর প্র্যাকটিক্যাল হয়ে উঠেছে। মেয়েদেরই এখন রোমান্টিক সেন্টিমেন্টাল সব কিছু হওয়া দরকার। নইলে তারা টিকবে কী করে? স্যানস্ক্রিট পড়ে পড়ে তুই যেন কেমন হয়ে গেছিস অনি!

অনিন্দিতা খানিকক্ষণ ভেবে বললে, তুমি তাহলে সিরিয়াস শিপ্রাদি? সময় কাটাচ্ছ না।

শিপ্রা গম্ভীর হয়ে বললে, সময় কাটাবার মতো সময় আর আছে কই? সিরিয়াস না হয়ে একটা ছোটো ছেলেকেও কি এ বয়সে ভোলাতে পারব?

অনিন্দিতা গম্ভীর হয়ে বললে, পরাশর তোমার চেয়ে তিন-চার বছরের ছোটো।

নিজের বোকামি বুঝতে পেরে শিপ্রা তৎক্ষণাৎ গাম্ভীর্য পরিত্যাগ করলে। হেসে বললে, এই যে জেলাসি উপচে উঠছে!

এবার অনিন্দিতা তর্কচ্ছলেও এ কথার প্রতিবাদ করলে না।

নিজের সম্বন্ধেও অনিন্দিতা কখনও মিথ্যা কথা বলে না। অন্তত তার ধারণা তাই। অর্থাৎ সাধারণ সুস্থ মানুষের মতো নিজের সম্বন্ধে সে অনেক ভুল ধারণা পোষণ করে। শিপ্রা সম্বন্ধে পরাশরের সঙ্গে একদিন সে অত্যন্ত নির্মমভাবে আলোচনা করলে। এতে অপমানের প্রশ্নটা খুব বড়ো বলে এই নির্মমতার প্রয়োজন ছিল। বিশেষত সংক্ষেপে তার জেরাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে পরাশর ব্যাপারটাকে আরও জটিল করে তুললে।

অনিন্দিতা অশ্রু গোপন করে বললে, আজ পর্যন্ত তুমি অনেক অন্যায় করেছ। কখনও কিছু গোপন করার চেষ্টা করনি বলে তোমাকে শ্রদ্ধা করতাম মন্টু।

এ থেকে তোমার বোঝা উচিত এখন যা করছি সেটা অন্যায় নয়। অন্যায় হলে গোপন করতাম না।

অন্যায় কী? তুমি পাপ করছ!

পাগল, এ হল ভালোবাসা। ভালোবাসা অতি পবিত্র জিনিস, স্বর্গীয়।

পরাশর তার বাছা পোশাকি হাসিটি হাসল।

যদি কখনও কাউকে ভালোবাস অনি তা হলে জানতে পারবে ভালোবাসা কত উঁচু স্তরের জিনিস!

এর জবাবে অনিন্দিতা বললে, তুমি কলকাতা যাবে কবে?

শিপ্রার স্কুল খুললে একসঙ্গে যাব।

অনিন্দিতা মরিয়া হয়ে বললে, তোমার বাবা রেগে আগুন হয়ে আছেন। তোমার মা রোজ কাঁদেন।

তাতে কী। বুড়ো বয়সে সব স্বামী-স্ত্রীর ওরকম ঝগড়াঝাঁটি হয়।

তখন অনিন্দিতা বুঝতে পারল মনে মনে একটা গভীর ষড়যন্ত্র করে পরাশর প্রথমে শিপ্রাকে আমল দিয়েছিল,—এখন তার মনের মোড় ঘুরে গিয়েছে। প্রথমে চেষ্টা করে পরাশরের ষড়যন্ত্রকে সফল হতে দিলে শিপ্রার উন্মাদ অভিযান ব্যর্থ করা যেত, কিন্তু সে সুযোগও এখন তার নেই। এতকাল সে যে পরাশরের অবাধ্যতা করেছে তার একটা নাটকীয় প্রতিশোধ নেবার সম্ভাবনায় পরাশর অন্ধ হয়ে গিয়েছে। পুরাতন যুগের ব্যর্থ প্রেমিকের মতো—শুধু কথায় নয়, কাজেও সে আত্মহত্যা করে ছাড়বে।

কিন্তু বেশি প্রতিবাদ ভালো নয়! অনিন্দিতা চুপ করে গেল।

নদীতীরে শারদীয় কাশগুচ্ছের এবার অভাব হয়েছে। আকাশের টুকরো টুকরো রুপালি মেঘ মানুষের মনোবাসনার মতো শিথিল মন্থর গতিতে ভেসে বেড়ায়। নদী ও পুকুরের জলে এখনও পর্যন্ত বর্ষার অস্বচ্ছতা থেকে যাওয়ায় পরিষ্কার প্রতিবিম্ব ফোটে না। অনিন্দিতা রাঁধে, চুল বাঁধে, বই পড়ে, পাড়া বেড়াতে যায়। পরাশর ও শিপ্রার গোপন পরামর্শ অফুরন্ত হয়ে থাকে। গোপন অভিপ্রায়ের সীমা কণ্ঠের তলদেশে, কিন্তু গোপন আলাপ দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে যায়। অনিন্দিতা শুনতে পায় আগামী

উৎসবের পরের রাত্রেই বক্তকরবী অভিনয় হবে। সে পর্যন্ত দুটোরই রিহার্সেল চলবে একসঙ্গে উৎসব ও অভিনয়ের ; ভালোবাসা ও নাটকের।

অনিন্দিতা তবু কিছু বলে না। সকলের হা-হুতাশ তার কানে আসে। পরাশরের এমন কুমতি হবে, তার চেয়ে বয়সে বড়ো একটা বেহায়া মাস্টারনিকে শেষ পর্যন্ত সে বিয়ে করার জন্য খেপে উঠবে এ কথা কেউ যে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, অনিন্দিতাকে বারবার তা না শুনিয়ে কেউ তৃপ্তি পায় না। অনিন্দিতা হেসে বলে, আমি তার কী করব?

তাকে কেউ কিছু করতে বলেনি। কিন্তু শিপ্রাকে কোকনদের বোস-বাড়ির বউ মনে করতে গিয়ে সকলের মন খুঁতখুঁত করে। তারা বিশেষ করে অনিন্দিতাকেই মনের দুঃখ নিবেদন করে। শিপ্রাকে গ্রামে আনার দায়িত্ব সকলের বিরুদ্ধ সমালোচনা ও নালিশের সমবেত বোঝা হয়ে অনিন্দিতার কাঁধে চেপে থাকে। শৈশবের শেষে গ্রামে অনিন্দিতার নিন্দা নেই, দোষ তাকে কেউ দেয় না। কিন্তু সকলের ক্ষুণ্ণ ও ক্রুদ্ধ অভিযোগ শিপ্রা ও পরাশরের নাগাল না পেয়ে অনিন্দিতার চারিদিকে এসেই ভিড় করে। অনিন্দিতার মধ্যস্থতায় তাদের নালিশ যেন যুগল অপরাধীদের বিচ্ছিন্ন করে দেবে।

অনিন্দিতার সামনে পড়ে গেলে শিপ্রা একটু হাসে। তাকে এত সুন্দর দেখায় যে তাকে আর তার হাসিকে চেনা যায় না। মুখ থেকে সে যেন এক পরত মরা চামড়া তুলে ফেলেছে, লাবণ্যের একটা অজ্ঞাত মাজন দিয়ে দেহ মার্জন করেছে। কোকনদে এসে এই কদিনের মধ্যে তার স্বাস্থ্য অসাধারণ উন্নতি লাভ করেছে, তার দেহের কঠোর শুভ্রতা রঙে ভিজে কোমল হয়ে এসেছে। মাথার চুলগুলি পর্যন্ত যেন খোলস বদলে হয়েছে উজ্জ্বলতর। তার মুখে চোখে যে অশান্ত উদ্‌বেগ ও গ্লানিকর বিবক্তির অভিব্যঞ্জনা অনিন্দিতা চিরকাল দেখে এসেছে এখন তার চিহ্ন নেই। তার দৃষ্টি গভীর ও গম্ভীর, মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক অবস্থায় অনিন্দিতার দিকে চেয়ে একটু কেবল শঙ্কা তার চোখে দেখা দেয়।

অনিন্দিতা লক্ষ করে, শিপ্রা প্রতিদিন নিজেকে সংহত ও অখণ্ড করে এনে পরাশরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। ভোজবাজির মতো তার জাদুনির্মিত শহরটি ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে আসছে, অকস্মাৎ সমস্ত বিষয়ে সে যে-সব বাহুল্য আমদানি করেছিল একে একে তাদের পরিত্যাগ করে সে স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। একটি পুরুষের সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যে সব সুপ্রাচীন ও অপরিবর্তনীয় বাঁধনে তাকে বেঁধে ফেলা জগতের সব চেয়ে আধুনিক মেয়েটির পক্ষেও এখন পর্যন্ত অপরিহার্য হয়ে আছে, অনিবার্য অধ্যবসায়ে পরাশরকে শিপ্রা সেই সব বাঁধনেই ক্রমে ক্রমে নিজস্ব করে ফেলছে। পরাশরকে সে যতখানি আকর্ষণ করে, নিজেকে ততখানি ভালো লাগায়। মুখে যখন সে ঘোষণা করে যে জগতের মানুষ শুধু সেইদিনই সুখী হতে পারবে একজনের জীবনে আরেক জনের যেদিন কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না, যার যেভাবে খুশি নিজের জীবনটা কাজে লাগাবে অথবা অপব্যয় করবে,—দুটি চোখের দৃষ্টি দিয়ে সে তখন এই নিয়ম থেকে পরাশরকে অব্যাহতি দেয়, মানুষের চোখের আড়ালে এই কোকনদ গ্রামের অনেক গেঁয়ো-বউয়ের মতো পরাশরের কাছে প্রেমের মোহে সে দাসী হয়ে থাকে।

অনিন্দিতা তাকে বলতে শুনেছে, বনিবনা না হলে আমরা কিন্তু পৃথক হয়ে যাব। একটা দিনও গায়ের জোরে কাছাকাছি থাকবার চেষ্টা করব না। এবং এটুকু জানতেও অনিন্দিতার বাকি থাকেনি যে পরাশরকে এ কথা বলার আগে শিপ্রা তিনদিন চেষ্টা করে পরাশরের মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছে বনিবনার অভাব তাদের এ জীবনে কখনও হবে না। কারণ, এতকাল শিপ্রা যে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেছে সে শুধু পরাশরের মতো এমন একজনের দেখা সে এতদিন পায়নি বলে, যার সঙ্গে কোনোদিন মনোমালিন্য না হবার সম্ভাবনায় প্রথম থেকে সে বিশ্বাস করতে পারে।

শিপ্রা বলে, বালিগঞ্জের দিকে ছোটো একটি বাড়ি ভাড়া নেব অনি। প্রত্যেক শনিবার বিকেলে হোস্টেল থেকে গিয়ে সোমবার পর্যন্ত তুই আমার কাছে থাকবি।

অনিন্দিতা সরলভাবে জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের খরচ চলবে কী করে? এখানে না থাকলে মন্টুর বাবা একটি পয়সা দেবেন না।

শিপ্রাও সরলভাবে হেসে বলে, বিয়ের পর আমি কি মন্টুকে ভেসে বেড়াতে দেব রে অনি! ওকে তুই একেবারে চিনতে পারিসনি। দায়িত্ব দিলেই ও দায়িত্ব নেবে। মাসে তিন-চারশো টাকা ও রোজগার করতে পারে।

এ সব লোভ দেখিয়েছে নাকি?

দেখিয়েছে। কিন্তু তুই যা ভাবছিস তা নয় অনি। এ সব শুধু লোভ-দেখানো হলেও শিপ্রা ঠকবে না। একমাস করে আমি এখানে থাকলে বুড়ো খুশি হয়ে এগারো মাস কলকাতায় থাকার খরচ দেবে। ছেলের বউ দুবার পায়ের ধুলো নিলে সিন্দুকের চাবি পর্যন্ত তার আঁচলে বেঁধে না দিয়ে রাত্রে ওঁর ঘুম হবে ভাবিস? মন্টুর বাবাকেও তুই চিনতে পারিসনি অনি।

অনিন্দিতা বলে, চিনতে আমি কারুকেই পারি না শিপ্রাদি। তোমাকেও নয়।

শিপ্রা সস্নেহে তার কাঁধে হাত রাখে, ছলছল চোখে তাকিয়ে মিষ্টি মোলায়েম গলায় বলে, এবারটা ঠকেই শেখ অনি। জীবনে আর ভুল হবে না। আমি তোর টিচার ছিলাম, আমার কাছে শিখতে দোষ কী?

অনিন্দিতা কাঁধ থেকে তার হাত নামিয়ে আঙুলগুলি মুঠো করে ধরে। হাসিমুখে বলে, তোমায় ভালোরকম গুরুদক্ষিণা দেব শিপ্রাদি।

শিপ্রা বলে, আমার সঙ্গে কনসাল্ট করে দিস। দু জায়গা থেকে এক রকম প্রেজেন্ট পেলে বিশ্রী লাগে।—ছাড়, হাত ছাড়। আংটিটা বিঁধছে।

অনিন্দিতার মুষ্টির চাপে পরাশরের দেওয়া আংটিতে শিপ্রার দুটি আঙুল গর্ত হয়ে কেটে যায়। কয়েক ফোঁটা রক্তেরও আবির্ভাব হয়।

শিপ্রা একটু হেসে বলে, তুই খুব সরল অনি। তাই বড়ো বোকা।

অনিন্দিতা বোকা না হলেও শিপ্রা যে বুদ্ধিমতী দু একদিনের মধ্যে তার আরও একটি পরিচয় পাওয়া যায়। শিপ্রা রক্তকরবীর রিহার্সেল বন্ধ করে দেয়। পরাশর তার মত পরিবর্তনের চেষ্টা করে। সে পরাশরের অবাধ্য হয়। পরাশর রাগ করে। সে নির্বিকার হয়ে থাকে। বলে, ও সব ছেলেমানুষি ভালো নয়।

যে দৃষ্টি দিয়ে মানুষ বিপদের পরিমাপ করে শিপ্রাকে সেই দৃষ্টিতে ঈষৎ ভীতা করে তুলে পরাশর বলে, তুমি শেষ পর্যন্ত অনিন্দিতা হয়ে উঠবে না তো শিপ্রা?

শিপ্রা থাকাই সহজ।

শিপ্রার এই আশ্বাসকে অনিন্দিতা যেচে সমর্থন করলে। পরাশরকে সে অভয় দিয়ে বললে যে শিপ্রার যতটুকু স্বাভাবিক সেটুকু কৃত্রিম, পরাশরেব চিন্তার কারণ নেই। কোকনদে এসে শিপ্রা পাগল হয়ে গিয়েছে। একবার পাগল হয়ে মানুষ যদি বা মাঝে মাঝে শ্রান্ত হয়ে পাগলামি স্থগিত রাখে—পাগলামি তার জীবনে কখনও ঘোচে না। চিরজীবন উন্মাদিনী থেকে শিপ্রা পরাশরের জীবনকে ভরপুর করে রাখবে।

পরাশর সভয়ে বললে, তোমার এ মন্তব্যে sarcasm নেই তো অনি!

না। খাঁটি শুভানুধ্যায়ীর মন্তব্য বলে গ্রহণ করো।

পরাশর আত্মগোপন করে বললে, জীবনটা তাহলে জমবে।

বরফের মতো। ঠান্ডা আর শক্ত।

তাই বা মন্দ কী? বরফ দিয়ে আইসক্রিম হয়, পাথর চিরকাল পাথর।

এমনিভাবে হেঁয়ালিতে কথা বলার জন্য তাদের মন খারাপ হয়ে যায়। শিপ্রাকে সঙ্গে নেবাব কথা ভুলে গিয়ে পরাশর একা চলে যায় পুকুরে, পুকুরের মাঝখানে সাঁতার দেবার চেষ্টা না করে চোখ বুজে চিত হয়ে ভাসে। অনিন্দিতা শিপ্রাকে পরাশরের গন্তব্য স্থানের সন্ধান বলে দিয়ে অবেলায় বাড়ির পাশের পোড়ো জমিটাতে ইজেল খাড়া করে ছবি আঁকতে আরম্ভ করে।

একটি একটি করে দিন চলে যায় কোকনদের আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদটি কলায় কলায় বাড়তে থাকে। পূর্ণিমার আগের রাত্রে পরাশর ও শিপ্রার বিবাহের সময় স্থির হয়েছে বলে চাঁদের নৈশ বৃদ্ধিতে অনিন্দিতা মৃদু কৌতূহল বোধ করে।

শিপ্রা তার হাজারিবাগের পিসিমাকে পত্র লিখেছিল। পত্রে সে প্রস্তাব করেছিল যে পিসিমা যদি কলকাতায় এসে তার বিয়েটা দিয়ে দেন তবে বড়ো ভালো হয়। পিসিমা চিঠির জবাবে লিখেছেন, তাঁব বড়ো টাকার টানাটানি, কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে শিপ্রার বিয়ের আয়োজন করার সংগতি তাঁব নেই। শিপ্রা টাকা পাঠালে ব্যবস্থা করতে পারেন। শিপ্রা নিঃসংকোচে এ চিঠি পরাশরকে দেখিয়েছে। পবাশর বলেছে, তাই তো!

তখন শিপ্রা বুদ্ধি খাটিয়ে এক উপায় উদ্‌ভাবন করেছে। কোকনদে বিয়ে হতে কোনো অসুবিধা নেই, তার উদ্‌ভাবিত উপায়ের মর্মকথাটি এই। এবং কোকনদেই যদি বিয়ে হয়, অনিন্দিতার বাড়িতে না হলে তাকে বিশেষ অপমান করা হবে। এ বিয়ে যে হচ্ছে অনিন্দিতাই কি তার কারণ নয়? তাছাড়া সে তাদের দুজনেবই বিশিষ্ট বান্ধবী। প্রস্তাবটা যে অনিন্দিতার দিক থেকেই ওঠা উচিত ছিল এটা খেয়াল করে তারা দুজনেই অস্বস্তি বোধ করে, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু বলে না। পরাশরের বাবা ও মা শেষ পর্যন্ত মত দিলেও এ বিয়ে তাঁরা অনুমোদন করেননি, গম্ভীর উদাসীন হয়ে আছেন। পাত্রপক্ষের বিয়ের আযোজনও অনিচ্ছুক মন্থর গতিতে চলেছে। পাত্রীর এক পিসিমা পৃথিবীর কোথাও আছে এবং পাত্রীপক্ষে যতটুকু আয়োজন দরকার তিনিই তা করবেন এমনি একটা আভাস পেয়ে পরাশরের আত্মীয়স্বজন চুপ করে আছে। এখন এ পক্ষের ব্যবস্থার ভারটাও তাঁদের নিতে বলার সাহস পরাশরের নেই।

শিপ্রা ইচ্ছা করলে এই অসুবিধা রদ করতে পারত। দুটি সুব্যবস্থা সম্ভব ছিল। হাজারিবাগের পিসিমাকে মধু বোসের আর্থিক অবস্থার বিবরণ লিখে জানিয়ে অভয় দিলে তিনি কলকাতায় ছুটে এসে উৎসবের আয়োজন করতেন। কলকাতায় শিপ্রার কয়েকটি বন্ধু আছে। তাদের অনুরূপ বিবরণ দিয়ে পত্র লিখলে তারা দরকার হলে চাঁদা করেও শিপ্রার বিয়েতে দু-চারশো টাকা খরচ করতে পিছপা হত না। কিন্তু শিপ্রা অনেক ভেবে এদিক দিয়ে কোনো চেষ্টাই করেনি। পরাশরেব কাছে নিজেকে সে অসহায় অনন্যনির্ভর করে রাখতে চায়। পরাশর শুধু ভালোবেসেই তাকে গ্রহণ করছে না, তাকে দয়া করছে। সহায়-সম্পদহীনা এক নারীর প্রতি এ তার অনন্ত অনুগ্রহ। শিপ্রা জানে এই করুণার ভেজাল-মেশানো প্রেম খাদ-মেশানো সোনার মতো খাঁটি জিনিসটির চেয়ে শক্ত হয়। চারিদিক থেকে বাধা ও আঘাত পেয়ে শেষের দিকে পরাশর যদি ভালোবাসাকে অস্বীকারও করতে চায়, এই ভেজালকে তার মানতে হবে। জগতে যার কেউ নেই তাকে সে কোনো কারণেই ভাসিয়ে দিতে পারে না।

শুক্লা নবমীর সকালে অনিন্দিতার কাছে সে-ই কথা পাড়ল। বললে, নিজের ভার আর বইতে পারি না অনি।

অনিন্দিতা শাড়ি-গামছা কাঁধে ফেলে চশমার খাপ খুঁজছিল, অন্যমনস্ক ব্যস্ততার জন্যই বোধ হয় তার কথা রূঢ় শোনাল, গাড়িঘোড়ার ব্যবস্থা তো হয়েছে।

শিপ্রা আরও নরম হয়ে বলল, একটা মুশকিল হয়েছে অনি।

মুশকিল বাধা নয়, সর্বনাশের সূচনাও নয়। তবু অনিন্দিতা চশমার খাপের কথা ভুলে গেল। কী মুশকিল শিপ্রাদি? পরাশরের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?

মুশকিলের বিবরণ দেওয়ার পরিবর্তে শিপ্রা পরাশরের সঙ্গে তার পরামর্শের বর্ণনা খানিক কমিয়ে খানিক বানিয়ে ব্যক্ত করল। মনে হল, এ বিষয়ে তার নিজের যেন কোনো বক্তব্যই নেই। সে শুধু দূতী। পরাশরেরই একটা অনুরোধ সে অনিন্দিতার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। নিজের ভার বহনে তার অক্ষমতার সকরুণ ভূমিকাটির সঙ্গে ঠিক খাপ না খাওয়ায় কথাগুলিতে এতখানি দুর্বিনয় প্রকাশ পেল যে অনিন্দিতা গম্ভীর হয়ে গেল।

পুকুরে চলো শিপ্রাদি। স্নান করতে করতে পরামর্শ হবে।

কোন পুকুরে যাবে?

পরাশরদের পুকুরে। পরাশরকেও ডেকে নেব।

শুনে শিপ্রার অভিজ্ঞতায় পবিপূর্ণ হৃদয়খানি হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হয়ে গেল। তার মনে হল পৃথিবীর প্রত্যেকটি জীবন যে স্বকেন্দ্রীয় তার এই নির্মল জ্ঞান পরিপূর্ণ সত্য নয়। অনিন্দিতাব মতো মেয়েরা সংসারের রূঢ়তম নিয়মগুলিকেও মাঝে মাঝে বাতিল করে দিতে পারে।

মধু বোসের বাগানে পুকুরটির চারিদিকে এতগুলি ফলের গাছ আছে যে বেলা দশটাব আগে শীতল জলের সঙ্গে উষ্ণ রোদের মিলন হয় না। তারা তিনজনে যখন পুকুরে ঘাটে গিয়ে দাঁড়াল সূর্য তখন আকাশের অনেক নীচে পড়ে আছে, পুকুরের কালো জল নিবিড় ছায়ায় তরল রাত্রির মতো রহস্যময়। পরাশর ও শিপ্রা মাঝে মাঝে কথা বলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কথায় যাঁর দখল অসাধারণ তার মুখে আজ কথা নেই। শুধু কথা নেই নয়, তার মুখের স্বচ্ছ সরলতায় একটা দুর্বোধ্য পাণ্ডুর কালিমা ঘনিয়ে এসেছে। মুখের কোন রেখা কীভাবে জটিল বক্রতা অবলম্বন করেছে কারও পক্ষেই তা অনুমান করা সম্ভব নয়, কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকালে একটু-একটু ভয় করে। এতকাল নিজস্ব মুখবতায় ওর হৃদয়ের স্পন্দনটি পর্যন্ত ধ্বনিত হয়েছে, আজ স্তব্ধতা পর্যন্ত মুখর বলে ওকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

ঘাটে পৌঁছে অনিন্দিতা বললে, তুমি বসো পরাশর। আমরা জলে নামব।

শিপ্রা বললে, আমি যে কস্টুম আনিনি অনি?

অনিন্দিতা বললে, আমিও তো আনিনি!

শাড়ি পরে সাঁতার দিতে পারব না।

সাঁতার দিতে তোমায় কে বলেছে?

হাত ধরে একান্ত অনিচ্ছুক শিপ্রাকে অনিন্দিতা একরকম টেনে জলে নামিয়ে নিয়ে গেল। জলের নীচেই ঘাট পিছল। বুক জলে পৌঁছে থামবার চেষ্টা করে শিপ্রা থামতে পারল না, অনিন্দিতার আকর্ষণে তাকে পুকুরের মাঝখানে যেতে হল। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে সে বললে, হাত ছাড় অনি! ডুবে যাব।

অনিন্দিতা বললে, তুমি কতক্ষণ ডুবে থাকতে পার শিপ্রাদি?

শিপ্রা কেঁদে বললে, এক সেকেন্ডও পারি না অনি ছেড়ে দে। ঘাটে ফিরে যেতেই প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

অনিন্দিতা মৃদু হেসে বললে, রোজ সকালে পরাশরের কাছে তবে শিখলে কী? সকালটা যে তোমাদের পুকুরের জলেই কাটত!

গলা উঁচু করে সে ঘাটের পরাশরকে চেঁচিয়ে বললে, আমরা ডুবে থাকার কম্পিটিশন দিচ্ছি পরাশর, তুমি আম্পায়ার। পার্শিয়ালিটি কোরো না।

এক হাতে শিপ্রার গলা জড়িয়ে ধরে আরেক হাতে জল কেটে অনিন্দিতা তলিয়ে গেল। পরাশর জামা খুলে সিঁড়ি বেয়ে জলের ধারে নেমে এসেও জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল না। ফিরে গিয়ে ঘাটের পাকা আসনে বসে জামাটি গায়ে দিয়ে ধীরে ধীরে বোতাম আটকাতে লাগল। অনিন্দিতা ও শিপ্রা তখন ভেসে উঠেছে। তার নাম ধরে শিপ্রার তীক্ষ্ণ সুতীব্র চিৎকার আবার যখন পুকুরের শান্ত জলের তলে অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল তখনও তার শেষ বোতামটি আটকানো হয়নি।

এবার যখন তারা ভেসে উঠল শিপ্রা নির্বাক হয়ে গেছে। অনিন্দিতা তাকে টেনে ঘাটে নিয়ে এল। অতিকষ্টে ওর প্রাণরক্ষা করেছে পরাশর। নতুন সাঁতার শিখে অতদূরে ওর যাওয়া উচিত হয়নি। ঘাটে তুলে নিয়ে যাও, আমি শাড়িটা খুঁজে না এনে উঠতে পারছি না।

পরদিন শিপ্রাকে স্টিমারে তুলে দিয়ে অনিন্দিতা বললে, সত্যি বলছি শিপ্রাদি তুমি ডুবে যাচ্ছ পরাশর তা বুঝতে পারেনি, ছাড়া আমি ছিলাম কিনা। আমি এমন সাঁতার জানি যে পরাশরকে পর্যন্ত আমি জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলতে পারি। আমি ছিলাম বলে ও জলে নামা দরকার মনে করেনি।

শিপ্রা কিছু বলল না। নদীর জলীয় বাতাসে তার শীত করছিল। জলের দেশে এসে পুকুরের জলে আর চোখের জলে তার দুটি চোখ লাল হয়ে গেছে। জলে ডুবে আকস্মিক অপমৃত্যু লাভের এটা পরবর্তী অবস্থা।

সর্পিল

প্রান্তরের প্রান্ত মিলিতে বেলা চারিটা বাজিয়া গেল।

গ্রামে প্রবেশ করিবার আগে পালকি থামাইয়া অনন্ত একবার নামিয়া পড়িল, দাঁড়াইল প্রান্তরের দিকে মুখ করিয়া। অতিক্রান্ত পথটি বহুদূর অবধি নজরে পড়ে। যে নিঃসঙ্গ বটগাছটি অনেকক্ষণ আগে ছাড়াইয়া আসিয়াছিল, এতদূর হইতে তার অবস্থান আরও করুণ ও রহস্যময় মনে হয়। তার পর দিগন্তে মেশানো পৃথিবীর সীমা। বেলা দশটায় যে ক্ষুদ্র স্টেশনটিতে সে অবতরণ করিয়াছিল, তাহাকে অনুসরণ করিয়াই যেন ওই দিগন্ত সেই স্টেশনটি পার হইয়া আসিয়াছে। ডাহিনে বামে অর্ধচক্রাকার তরুশ্রেণি, পাশপাশি প্রান্তরটির বিস্তার তিন-চার মাইলের বেশি হইবে না। অদূরে প্রকাণ্ড একটা দীঘির জল চকচক করিতেছে। তাহারই তীরে কোনো কৃষকের অস্থায়ী হোগলার ঘর। দিবারাত্রি ওই ঘরে থাকিয়া সে তাহার শস্যভরা কয়েক বিঘা পৃথিবীকে পাহারা দেয়।

করতলের ছায়ায় চক্ষুকে আশ্রয় দিয়া অনন্ত চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। পত্র লিখিয়া কেতকী তাহাকে এত দূরে এমন দুর্গম গ্রামে টানিয়া আনিবে কে ভাবিয়াছিল!

কিন্তু দুর্গম গ্রামেও পালকি থামিল না। গ্রামবাসীর বিস্মিত দৃষ্টি ও কুকুরজাতীয় কতকগুলি জন্তুর সচিৎকার অভিনন্দন সংগ্রহ করিয়া গ্রাম ছাড়াইয়া পালকি জঙ্গলাকীর্ণ কাঁচাপথ ধরিল। থামিল আরও প্রায় আধ মাইল গিয়া।

কেতকীই পালকি বেহারা পাঠাইয়াছিল, সুতরাং ভুল হইবার কথা নয়। সম্মুখেই কেতকীর আধুনিক বাসগৃহ।

কিন্তু গৃহ বলিয়া চেনা কঠিন। এ যেন রূপধরা পুরাতত্ত্ব।

সেকেলে তিনমহাল বাড়ি, একসারিতে খানচারেক ঘর ছাড়া বাকি সমস্তটাই প্রায় ভাঙিয়া পড়িয়াছে। এখানে দাঁড়াইয়া আছে খানিকটা ভাঙা দেওয়াল, ওখানে ঝুলিতেছে ছাদের একটু অংশ ও কড়িবর্গার কঙ্কাল,—যে প্রাচীর একদিন গৃহটিকে আড়াল করিয়া রাখিত তাহার চিহ্নমাত্র নাই। চারিদিকে শুধু ইঁটের স্তূপ ও আগাছার জঙ্গল। দেউড়িটা বিপজ্জনক অবস্থায় কোনোমতে খাড়া আছে. দেউড়িটার সামনে একটি বৃহৎ অশ্বত্থ তরু বিস্তৃত ছায়া ফেলিয়া স্থানটির অস্বাভাবিক স্তব্ধতা দ্বিগুণ নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে।

অদূরে একটি মন্দির।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় মন্দিরটি বেশি পুরাতন নয়, কিন্তু ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিলে ভুল ভাঙে। বুঝিতে পারা যায়, মানুষের যে গৃহ আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে, দেবতার এই আবাসটির বয়স তার চেয়ে কম নয়। কিন্তু আজও জীর্ণতা দেখা দেয় নাই, একটি ইটও খসিয়া পড়ে নাই। কাল যেন দেবতার ভয়ে মন্দিরকে শুধু স্পর্শ করিয়া গিয়াছে, আঘাত করে নাই।

সিঁড়িটা ভাঙিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে কীর্তি কালের নয়। কত কাল ধরিয়া কত মানুষের পায়ের আঘাত সিঁড়িটা সহিয়াছে তার ঠিকানা নাই। তাহা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত মানুষ যে দেবতার কাছে পৌঁছিবার কাজে তাহাকে লাগাইতে পারে এইটুকুই আশ্চর্য।

নিবিষ্ট চিত্তে মন্দির দেখিবার ফাঁকে কখন কেতকী আসিয়া নিকটে দাঁড়াইয়াছিল অনন্ত টের পায় নাই। কেতকী কথা বলিতে সে একটু চমকিয়া উঠিল।

তিন বছর পরে তুমি এলে—

অনন্তের চমক লক্ষ করিয়া কেতকী হাসিয়া কথাটা শেষ করিল,—আর বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছ মন্দির!

অনন্তও হাসিল। বলিল, অভ্যর্থনা করার জন্য তুমি দেউড়িতে দাঁড়িয়ে নেই দেখে রাগ হয়েছিল। কেতকী বলিল, দাঁড়িয়ে থাকতাম, কিন্তু তুমি এত আগে এসে পড়বে ভাবিনি। এখানে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায়।

ভালো ভালো খাবার ঘুষ পেয়ে বেহারারা উড়ে এসেছে। অত খাবার পাঠিয়েছিলে কেন বলো তো?

বলিয়া অনন্ত হাসিতে লাগিল। কেতকী বলিল, বিলিয়ে দিয়েছ বেশ করেছ, নিজে পেট ভরে খেয়ে নিয়েছিলে তো?

নিয়েছিলাম। আর খেতে খেতে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিলাম এই ভেবে যে, আমি কী খেতে ভালোবাসতাম সব তোমার মনে রইল কী করে! লেবুর শরবতটি পর্যন্ত তো ভোলনি?

কেতকীর মুখের পাশে রোদ পড়িয়াছিল, একটু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু হাসিয়া সে বলিল, যেন কত জন্ম কেটে গেছে, ভোলাই উচিত! তিন বছরেই মানুষের স্মৃতি লোপ হয় এই বুঝি তোমার ধারণা? কী করে চিনলাম ভেবে তো কই আশ্চর্য হলে না?

অবিকল এমনিভাবে কেতকী হাসিত, এমনি ভঙ্গিতে কথা কহিত, প্রত্যেকটি বাক্য তাহার এমন রসাত্মক লাগিত যেন এক একটি সংক্ষিপ্ত স্বতন্ত্র কাব্য।

অথচ পরিবর্তন হইয়াছে। এত বেশি হইয়াছে যে তাহা লইয়াই আর একটু হইলে সে প্রথম কথা আরম্ভ করিয়া দিত। ভারী ছেলেমানুষি শোনাইত তাহা হইলে। মনে হইত এ একটু নূতনভাবে ভদ্রতার কুশল প্রশ্নটিই সে করিয়াছে। তিন বছর পরে দেখা হওয়ার প্রথম দিকে অসংখ্য ছোটোখাটো প্রশ্নোত্তরের মধ্যে পরিবর্তনের বিবরণ দাখিল করিতে কেতকীরই কি ভালো লাগিত?

কুশল জিজ্ঞাসা করিতে আশঙ্কাও হয়।

গায়ের রং মলিন হইয়া দেহের গড়ন ভাঙিয়া গিয়া কী চেহারাই আজ ইহার হইয়াছে? মুখে লাবণ্যের লেশ নাই, চোখ দুটি স্তিমিত। অসময়ে গা ধুইতে গিয়া স্নান করিয়া আসিয়াছে, তবু!

এখন যে তুমি স্নান করেছ কেতকী? পুজো করবে না কি মন্দিরে?

আমি ওই মন্দিরে পুজো করব? কেতকী যেন আশ্চর্য হইয়া গেল।

মন্দিরে পুজো হয় না?

হয়। ও করে।

এবার অনন্তের আশ্চর্য হইবার পালা। শঙ্কর দেবমন্দিরে পূজা করে। সেই দেবদ্রোহী বিলাসী শঙ্কর! হঠাৎ সে কোন দেবতার প্রতি ভক্তি অর্জন করিয়াছে?

এটা কোন দেবতার মন্দির কেতকী?

কেতকী মাথা নাড়িয়া বলিল, দেবমন্দির তো নয়। ওর মধ্যে দেবতা নেই।

অনন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, বিগ্রহ নেই তো শঙ্কর পুজো করে কার?

পাংশুমুখে কেতকী বলিল, কুগ্রহের পুজো করে। দুষ্টগ্রহের পুজো করে। ওর কথা বাদ দাও।

সেটা কঠিন কাজ। কেতকীর স্বামীর সম্বন্ধে এত বড়ো কথাটা বাদ দেওয়া যায় না। অনন্ত বলিল, কুগ্রহ দুষ্টগ্রহের কথাটা আমায় বুঝিয়ে দাও তো, শুনি।

কেতকীর চোখ ছলছল করিয়া আসিল, কী বোঝাব? সাতপুরুষের পাগলামি ওর কাঁধে ভর করেছে. এখানে এসে থেকে এমন ভয়ংকর কালীভক্ত হয়েছে যে সে আর বলার নয়। ও মন্দিরে কালীমূর্তি আছে, কিন্তু ও কালীমার পুজো করে না, নিজেব পাগলামির পুজো করে।

অনন্ত একটু ভাবিয়া বলিল, চলো, মা কালীকে দর্শন করে আসি।

কেতকী সভয়ে বলিল, না।

না কেন?

কেতকীর মুখ পাংশু হইয়া গিয়াছিল, ঢোঁক গিলিয়া সে বলিল, ভয় পাবে। মা কালী বলে চেনা যায় না,—মনে হয় খাঁড়া হাতে জমাট-বাঁধা অন্ধকার। দু চোখ হিরার মতো জ্বলজ্বল করছে। দিনের বেলাও মন্দিরে ভালো করে আলো যায় না, প্রদীপ জ্বেলে দেখতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমার দুচোখে দুটো প্রদীপ দপ্ করে জ্বলে ওঠে। প্রথম দিন একা গিয়ে ওই দেখে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।

কেতকী একবার শিহরিয়া উঠিল। এবং তাহাতেই তাহার শরীর ও মনের বর্তমান অবস্থা অনন্তর কাছে সম্পূর্ণ রূপে পরিষ্কার হইয়া গেল।

কিন্তু সে কিছুই বলিল না। কেতকীর আত্মসংবরণের প্রক্রিয়াটা নীরবে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

চলো, ঘরে যাই,—কেতকী বলিল।

চলো। চিঠিতে তুমি আমায় কোনো খবরই দাওনি কেতকী! পদে পদে অপ্রস্তুত হচ্ছি।

এ সব কী চিঠিতে জানানোর মতো খবর?

না, তা নয়।—অনন্ত স্তব্ধ হইয়া গেল। এ সব মানে যে সব খবর অতি সামান্যই সে জানাইয়াছে। সেটুকুও চিঠিতে লেখা কেতকীর পক্ষে সত্যই অসম্ভব। এ বাড়ির ছবি কি চিঠিতে ওঠে! কেতকীর এই শীর্ণ পাণ্ডুর মুখচ্ছবির বর্ণনা কেতকীর ভাষাতে নাই—চিঠির ভাষাতে তো একেবারেই নাই।

দেউড়ির নীচে আসিয়া কেতকী হাসিয়া বলিল, অমন করে ওপর দিকে তাকাচ্ছ যে? আমি যখন সঙ্গে আছি ভয় নেই।

তুমি সঙ্গে থাকলে বুঝি মাথায় ইট ভেঙে পড়তে পারে না?

কই আর পারে? তিনবছর এর তলা দিয়ে যাতায়াত করছি, চুনবালিও তো কোনোদিন মাথায় খসে পড়েনি। জানো, এ বাড়ির বিপদ আমায় এড়িয়ে চলে।

অনন্ত থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

তবে এইখানে দাঁড়িয়ে তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি কেতকী। এ ভাঙা দেউলে এসে নীড় বাঁধার দরকার হল কেন তোমাদের?

সাতপুরুষের ভাঙা দেউল ছাড়া মানুষ আর কোথায় শান্তি পাবে বল?

অনন্ত বিচলিতভাবে বলিল, এমন ভয়ানক শাস্তির দরকার পড়ল কার? তোমার না শঙ্করের?

ওঁর। স্বামীর শাস্তিতেই স্ত্রীর শান্তি।

এ কথার সত্যমিথ্যা ভগবান জানেন, অনন্ত নীরবে চলিতে আরম্ভ করিল। ইটের স্তূপ বেড়িয়া আঁকাবাঁকা সরু পথ ঘর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে—শঙ্কর ও কেতকীর পায়ে পায়েই পথটি গড়িয়া উঠিয়াছে বোধ হয়।

অনন্ত ভাবিতে লাগিল, শঙ্করের জীবনে যে শান্তির অভাব ঘটিয়াছিল সে তো তাহা টের পায় নাই? শহরের বাস তুলিয়া দিয়া জমিদারিতে গিয়া বাস করিবে অকস্মাৎ সে সময় শঙ্কর এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছিল, তার কিছুকাল পূর্ব হইতেই তাহার মধ্যে অনেক আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল সত্য, কিন্তু তার কারণ যে অশান্তি এরূপ অনুমানের কোনো সংগত কারণই ছিল না। যে গাম্ভীর্য তাহার আসিয়াছিল তাহা ছিল প্রশান্ত, জীবনের সর্বপ্রকার অগভীর আনন্দ উৎসবে যে ক্রমবর্ধমান বিমুখতা দেখা দিয়াছিল তাহা ছিল প্রশান্ত। মনে হইয়াছিল, সে ভাবিতে শিখিয়াছে। প্রত্যেক মানুষের যে একটি করিয়া নিজস্ব অন্তর্জগৎ আছে ধীরে ধীরে তাহার সন্ধান পাইতেছে। অনেকের জীবনেই এ রকম ঘটে। শুধু বাঁচিয়া থাকার মধ্যেই এমন কতকগুলি চিরন্তন রহস্য আছে সচরাচর যাহার

খবর সব মানুষ রাখে না, তুচ্ছ কোনো উপলক্ষে হঠাৎ একদিন সেগুলো মানুষকে চিন্তিত করিয়া তোলে, বিচলিত করিয়া দেয়। শঙ্করের জীবনেও এমন কিছু ঘটিয়াছে মনে হইয়াছিল। উপলক্ষটাও কিছু কিছু সে অনুমান করিতে পারিয়াছিল বইকী!

সে যে শঙ্করের অশান্তির বহিঃপ্রকাশ এ কথা কিন্তু কল্পনা করাও চলে নাই।

অথচ নিদারুণ অশান্তিতেই যে তার দিন কাটিতেছিল, আজ আর তাহাতে সংশয় করা যায় না। এখানে কি মানুষ বাঁচিতে পারে যে, সাধ করিয়া অকারণে এখানে সে বাসা বাঁধিয়াছে! বেশি দিন হয় নাই, কত টাকা খরচ করিয়া বাগান-ঘেরা ছবির মতো বাড়ি কিনিয়াছিল, বিলাসের আয়োজনের কোনো অভাব রাখে নাই। শহরের সব রকম সুখসুবিধা সে সেখানে লাভ করিত, শিক্ষিত মার্জিত নরনারীর সঙ্গ পাইত, হাসি ও সংগীতে সুমধুর সন্ধ্যা যাপন করিত। আর পাইত কেতকীর ভালোবাসা। এখানকার এই শীর্ণা সন্ত্রস্তা কেতকীর ভালোবাসা নয়, সে তখন ছিল হাস্যমুখী কল্যাণী বধূ।

সেই জীবন পিছনে ফেলিয়া আসিয়া অকারণে শঙ্কর এখানে তাহার সমাধি খুঁজিয়া নেয় নাই। আগাছা কাটাইয়া ইটের স্তূপ সরাইয়া ঘর কখানার একটু সংস্কার করিবার ইচ্ছারও তার এখন অভাব। আধুনিকতম আবেষ্টনী হইতে ছুটিয়া আসিয়া ধূলিসাৎ শতাব্দীর গৌরবে সে মুখ গুঁজিয়া দিয়াছে।

শঙ্করের সঙ্গে শেষ দেখা হওয়ার দিন সে যে কাণ্ড করিয়াছিল, তাহাতেই তাহাকে পাগল মনে হইয়াছিল, কিন্তু ইহার তুলনায় সে পাগলামি কত তুচ্ছ!

সে রাত্রির কথা তোমার মনে আছে কেতকী?

কোন রাত্রির কথা?

শঙ্করের অসুখ হয়েছিল, বিছানার দু পাশে বসে আমরা রাত জেগেছিলাম?

পড়ে বইকী মনে। সে অসুখ তো আর ভালো হল না। দুমাস ছটফট করে পাগলের মতো এখানে ছুটে এল। পরদিন তোমার জাপান যাবার কথা ছিল।

অনন্ত চিন্তিতভাবে বলিল, হ্যাঁ। শঙ্কর ঘুমোলে বিদায় দিতে তুমি আমার সঙ্গে গেট পর্যন্ত এসেছিলে। কী সব অদ্ভুত কারণ দেখিয়ে চিঠি লিখতে বারণ করেছিলে এখনও স্পষ্ট মনে আছে কেতকী। বাকি রাতটুকু শঙ্কর ঘুমিয়েছিল?

এতদিন পরে কী প্রশ্ন!

মাথা নাড়িয়া কেতকী বলিল, না। ফিরে গিয়ে দেখি বিছানায় উঠে বসে নিজেই কপালে বরফ ঘষছে।

খুব ধীরে ধীরে হাঁটিলেও এতক্ষণে তারা ঘরের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিল।

অনন্ত গলা নামাইয়া বলিল, সেদিন হঠাৎ ওর কী হয়েছিল আজও ঠিক বুঝে উঠতে পারি না কেতকী।

কেতকী বলিল, মাথার মধ্যে ভূমিকম্প হয়েছিল।

দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া অনন্ত যেন ঘরের ভিতরের দৃশ্যটা চোখে সহাইয়া নিতে লাগিল। দারিদ্র্যকে ঘরের মধ্যে সযত্নে বরণ করিয়া নেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেকটি জিনিস যেন অভিনয় করিতেছে,—দারিদ্র্যের। তক্তপোশে কম্বলের শয্যা—কম্বলটা পুরু শালের মতো দেখিতে এবং সম্ভবত খুবই কোমল। ঘরের মাঝখানে বেতের একটি ক্ষুদ্র কৌচ। মেঝে জুড়িয়া ছেঁড়া বিবর্ণ গালিচা পাতা, শঙ্করই হয়তো একদিন যাহা তিন-চারশো টাকায় কিনিয়াছিল। উত্তর দিকের দেওয়াল ঘেঁসিয়া কপাটভাঙা একটা আলমারি বোঝাই বই।

খদ্দরের মোটা চাদর গায়ে জড়াইয়া এক প্রান্তে কার্পেটের আসনে সিধা হইয়া বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছে স্বয়ং শঙ্কর। ছোটো করিয়া চুল ছাঁটিয়া মাথার পিছনে সে স্থূল শিখা রাখিয়াছে, কপালে আঁকিয়াছে রক্তচন্দনের স্বস্তিক।

কে, অনন্ত? বলিয়া সে ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া গেল। বইটা সশব্দে বন্ধ করিয়া বলিল, কিন্তু আসবে আশা করিনি। তারা! তারা! কত অদ্ভুত ঘটনাই তোমার পৃথিবীতে ঘটে!

কী অভ্যর্থনা! অনন্ত হতবাক হইয়া গেল।

কেতকী বলিল, আমি ওকে আসবার জন্য চিঠি লিখেছিলাম।

বেশ করেছিলে, কিন্তু কথাটা সময়মতো আমায় জানানো বুঝি তুমি উচিত বিবেচনা করনি?

স্বামীর অসম্ভব গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া কেতকী হাসিয়া ফেলিল। বলিল, না। সময়মতো জানালে তুমি ওকে আসতে বারণ করতে।

শঙ্কর একটা অদ্ভুত হাসি হাসিল। তারা! তারা! তোমার সন্তানকে সবাই কী ভুলই বোঝে মা! আসতে বারণ করতাম না কেতকী। অভ্যর্থনার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে আমিও সাদর আহ্বান জানাতাম। ও তোমার বাল্যবন্ধু হতে পারে ; কিন্তু বেশি বয়সে কি বন্ধুত্ব হয় না? এসো অনন্ত, জুতো খুলে ঘরে এসে বোসো।

জুতা খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া অনন্ত বেতের কৌচটাতে বসিল। স্বামীর মন্তব্যের কোনো জবাব না দিয়া কেতকী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি স্নান করবে?

অনন্ত বলিল, না।

বারান্দায় জল আছে, মুখ-হাত ধুয়ে নাও তবে। আমি চা করে আনি।

কেতকী চলিয়া গেল। শঙ্কর হাই তুলিয়া বলিল, চা আনবে বলে গেল শুনে ভয় পেও না অনন্ত, সব পাবে। হিন্দুর যত কিছু অখাদ্য আছে সব।

অনন্ত হাসিয়া বলিল, কী যে তুমি বল শঙ্কর!

শঙ্কর বলিল, কী বলি! ও কি হিন্দুর মেয়ে? ও সব পারে। চা-টা খাইয়ে অর্গান বাজিয়ে ও ঠিক তোমায় গান শোনাবে, দেখ। ও না পারে কী?

অনন্ত বিস্মিত হইল। মৃদুস্বরে বলিল, ওর গান তোমার আর ভালো লাগে না শঙ্কর?

শঙ্কর তীব্রকণ্ঠে বলিল, ভালো লাগে? অপমান বোধ হয়! পঁচিশ বছর আগে এ বাড়ির বউ অমন গান গাইলে তার কী করা হত জান? গলা টিপে গান বন্ধ করে জন্মের মতো বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হত। বাড়ির বউ, সে গাইবে প্রেমের গান!

অনন্ত সত্যই বিস্মিত হইয়া বলিল, প্রেমের গান গায়? এখানে?

শঙ্কর আনমনে আবার বইটা খুলিয়াছিল, কম্পিত হস্তে কয়েকটা পাতা উলটাইয়া বলিল, ও যখন গান ধরে অনন্ত, এ ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে ক্রুদ্ধ মুখ দেখা দেয়। সব মুখ আমার চেনা। বাবার মুখ ওই ওখানে ফুটে ওঠে,—আঙুল বাড়াইয়া দক্ষিণের দেওয়ালের একটা অনির্দিষ্ট স্থান নির্দেশ করিয়া বলিল, সে কী ভর্ৎসনা তাদের চোখে অনন্ত, একটু তাকিয়ে থাকলে আপনা থেকে মাথা নিচু হয়ে যায়। সাদা ঠোঁট নেড়ে ফিসফিস করে তারা আমাকে বলে কুলাঙ্গার! কুলাঙ্গার!

অনন্ত প্রত্যেকটি দেওয়ালে দৃষ্টি বুলাইয়া আনিল। কী-ই বা দেখিবার আছে দেওয়ালে? শ্যাওলা-ধরা দেওয়ালের উপর চুনকাম করার ফলে যে আবছা অদ্ভুত চিত্রগুলি দেওয়ালের গায়ে ফুটিয়া আছে, মানুষের মুখের সঙ্গে তাহাদের কোনো সাদৃশ্যই আবিষ্কার করা যায় না।

তবু যেন শঙ্করের পাগলামিতে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়। বলা কি যায়! শঙ্করের মুখেই তার পিতৃপুরুষের ইতিহাস সে শুনিয়াছে। আত্মার তৃপ্তি বলিতে যাহা বোঝায় তার সঙ্গে সেই মানুষগুলির সুদূরতম পরিচয়ও ছিল না। কেতকীর গানের অপমানে জাগিয়া উঠিয়া তারা যদি কোনো ঘরের দেওয়ালে ভ্রূকুটিভরা মুখে উঁকি দিতে পারে—এ ঘরের দেওয়ালে দেওয়াই সম্ভব।

শঙ্কর একাগ্র দৃষ্টিতে অনন্তকে দেখিতেছিল, হঠাৎ কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত করিয়া বলিল, এ কথাটা ওকে বলো না ভাই, ভয় পাবে। ও ভারী ভীরু।

তা জানি।

করে কি জান? রাত্রে উঠে এসে জানালা দিয়ে আমায় দেখে যায়। আমি বেঁচে আছি এইটুকু জানলেই যেন ওর ভয় কমে!

অনন্ত শঙ্কিত হইয়া বলিল, রাত্রে ও একা থাকে না কি?

থাকে বইকী, ওর মহল যে ভিন্ন।

অনন্ত বুঝিতে না পারিয়া বলিল, মহল কী?

শঙ্কর আশ্চর্য হইয়া গেল,—মহল জান না!—আচ্ছা, বলি তোমায় বুঝিয়ে। এ চৌধুরী বংশের কেউ কোনোদিন স্ত্রীর আঁচল পেতে ঘুমোয়নি ভাই. সে দীনতা এ বংশের রক্তে নেই। নিজের মহলে এ বাড়ির বউ প্রদীপ জ্বেলে রাত কাটিয়েছে চিরদিন,—স্বামী খুশি হলে দর্শন দিয়েছে, খুশি না হলে দেয়নি।

অনন্ত গম্ভীরভাবে বলিল, স্ত্রীকে ভালোবাসা এ বংশের রীতি নয়—না?

নাঃ, বলিয়া শঙ্কর হাসিল—মেয়েমানুষকে আমরা জয় করি, তার সঙ্গে হৃদয়-বিনিময়ের কারবার করি না। জান, আমার এক পূর্বপুরুষ রাজা ছিলেন। নিজের হৃদয়ে রাজত্ব করতে না পারলে আর রাজবংশে জন্মানো কেন?

সাবান ও তোয়ালে দিতে কেতকী যে দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কেহই তাহা লক্ষ করে নাই। নজর পড়িতে শঙ্কর একটু দমিয়া গেল।

কেতকী মৃদুস্বরে বলিল, নিজের হৃদয়রাজ্য থেকে কী রাজস্ব তুমি বৎসরান্তে সংগ্রহ কর শুনতে পাই কি?

শঙ্কর নরম সুরে বলিল, শুনলে বুঝি আমার কথা সব?

না, সব শুনিনি। যেটুকু শুনেছি তাই ঢের। একটা কথা তুমি জেনে রেখো, যে রাজ্যে শুধু বালি ধুধু করছে, তার অধিকার নিয়ে মেয়েমানুষ মারামারি করে না।—সে আপন মনে একটু হাসিল। শঙ্করকে কঠিন কথা বলিতে পারিলে সে যে তৃপ্তি পায়, অনন্তর কাছে তাহা আর গোপন রহিল না।

এ যেন তারই দুর্গতি এমনি ব্যথা বোধ হয়। শত্রুকেও আঘাত করা চিরদিন কেতকীর আয়ত্তাতীতই ছিল, নিজের স্বামীকে ঘা দিয়া সে আজ হাসিতে পারে!

অনন্ত একটা নিশ্বাস চাপিয়া গেল।

কেতকী অনন্তকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, বালতির কাছে সাবান আর তোয়ালে রইল। মুখ-হাত ধোবে এসো। তোমার সুটকেসের চাবিটা দাও, কাপড়-জামা বার করে দি।

চাবি নিয়া কেতকী চলিয়া গেলে শঙ্করের দুই হাতের দশটা আঙুল সজোরে পরস্পরকে আঁকড়াইয়া ধরিল। হতাশভাবে সে বলিল, দেখলে অনন্ত! চোখ রাঙিয়ে চলে গেল, ধমক দিতে পারলাম না। দেখলে!

অনন্ত চুপ করিয়া রহিল।

স্ত্রীর কড়া কথা চুপচাপ সহ্য করলাম! তারা! তারা! কী লজ্জাই আমার কপালে লিখেছিলি মা?

একটা অদ্ভুত স্তব্ধতার মধ্যে সন্ধ্যা নামিয়া আসে।

পুবের জানালার শিক ধরিয়া কেতকী বহুক্ষণ নিশ্চল নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। যে গ্রামের ভিতর দিয়া এখানে আসিতে হইয়াছিল তার চেয়ে কাছে বোধ হয় অন্য গ্রাম আছে, অনেকগুলি কুকুরের ডাক অস্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। বিকালে যে ঠান্ডা বাতাসটি বহিতেছিল হঠাৎ কখন তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে খেয়াল থাকে না। মনের মধ্যে শুধু পাক খায় শৃঙ্খলাহীন অবাস্তব চিন্তা।

তিন বছর ধরিয়া বান্ধবী ও বন্ধু যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাহা যেন ঠিক ধারণা করিয়া উঠিতে পারা যায় না।

কেতকীর চুলে যে মড়ক লাগিয়াছে খানিক আগে অনন্ত তাহা লক্ষ করিয়াছিল। কী আগুন জ্বলিতেছে ওর মাথায় কে জানে? তালু কতখানি তপ্ত হইয়া ওঠায় চুল ঝরিয়া পড়িতেছে, ওর মাথায় হাত দিয়া তাহা অনুভব করিবার জন্য হঠাৎ একসময় অনন্তর মন কেমন করিয়া ওঠে। কিশোর বয়সে কেতকী একদিন তাহার পায়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়াছিল। অনেক দিনের কথা। কেন প্রণাম করিয়াছিল আজ মনে পড়ে না, বোধ হয় কোনো কারণ ছিল না। আশীর্বাদ করিতে সেদিন যে খেয়াল থাকে নাই, সে কথাটা স্পষ্টই মনে পড়ে। বিদায় নেওয়ার সময় এবার যদি কেতকী প্রণাম করে—অকারণেই প্রণাম করে—প্রণাম করিতে হয় বলিয়া নয়,—মাথায় হাত রাখিযা সে আশীর্বাদ করিবে।

কিন্তু কী বলিয়া আশীর্বাদ করিবে?

ইহার কল্যাণের কোন পথটা আজ খোলা আছে? মনে মনেও কোনো আশীর্বচন উচ্চারণ কবিলে আজ ব্যঙ্গের মতো শোনাইবে না?

কেতকী কথা কহিল।

সূর্য ডুবতে না ডুবতে পুব দিকে কী মেঘ করে এলো দ্যাখো! রাত্রে বোধ হয় খুব ঝড় হবে। কী ধুমসো কালো মেঘ!

অনন্ত বলিল, ঝড় হবে বলছ কেন? শুধু বৃষ্টিও তো হতে পারে!

কেতকী মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল, তা নিশ্চয় পারে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ঝড় হবে। তা ছাড়া কী গুমোট করেছে দেখেছ? আমি রীতিমতো ঘামছি।

কান পাতিয়া শুনিয়া বলিল, বাইরে কারা কথা বলছে?

দেখি—

বাহিরে গিয়া অনন্ত দেখিল শঙ্কর বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে, বাবান্দার নীচে যুক্তকরে দুজন কৃষকশ্রেণির লোক। একজন একটি হৃষ্টপুষ্ট পাঁঠার গলবজ্জু ধরিয়া আছে।

শঙ্কর আপনা হইতে বলিল, রাত্রে মার কাছে বলি হবে অনন্ত। জোড়া-পাঁঠা বলি দেওয়াই নিয়ম, কিন্তু বলির কথা সাবাদিন স্রেফ ভুলেছিলাম, অসময়ে লোক পাঠিয়ে একটাব বেশি পাওয়া গেল না। সমস্ত রাত্রি আজ পুজো করব।

কালীপুজো?

শঙ্কর প্রশান্ত হাসি হাসিল,—তোমরা বেটিকে কালী বলেই জানো, আমবা বলি শক্তি। যাব প্রলয়ংকরী শক্তির সংযমে সৃষ্টির স্থিতি। এক স্তনে বিষ সঞ্চিত রেখে অন্য স্তনের অমৃতে যে জগৎকে পালন করছে।

ওই পাঁঠাটিকে ছাড়া।

মহাজ্ঞানীর মতো মুখ করিয়া শঙ্কর বলিল, ধ্বংস তুমি চেনো না অনন্ত, মৃত্যুর স্বরূপ কিছুমাত্র বোঝো না। মার ভান্ডার থেকে কী কিছু হারায়? যে পোকাটিকে তুমি না জেনে পায়েব নীচে পিষে দাও, সেও না। আজ পাঁঠাটির বলি হবে, কাল কি মা আবার ওকে পালন করবেন না?

বলিয়া বারান্দাব নীচে নামিয়া শঙ্কর যেন সস্নেহেই পাঁঠাটির গলদেশ চুলকাইয়া দিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ নীরবে তাহার কাণ্ড দেখিয়া অনন্ত প্রশ্ন করিল, কিন্তু একাদশীর দিন কি কালীপুজো হয়?

মার পুজোর আবার তিথি অ-তিথি কী হে সাহেব? মুখ না ফিরাইয়াই শঙ্কর এই জবাব দিল।

তা বটে!

অনন্ত কেতকীর ঘরে ফিরিয়া গেল।

শঙ্কর কি পাগল হয়ে গেছে কেতকী?

কেতকী জানালা ছাড়িয়া নড়ে নাই—এই সুস্পষ্ট বিচলিতভাবে সে ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

তা তো জানি নে। আমার মনে হয় ওঁর রক্তে এই বিকার ছিল, হঠাৎ একদিন প্রকাশ পেয়েছে। এখানে আসবার আগে আমি একটা পার্টি দিয়েছিলাম। একটা কথা শোনো বলে আমায় তেতলার সেই ছোটো ঘরে ডেকে নিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিল। সেই আমার প্রথম শাস্তি পরে আর কাঁদিনি, সেদিন কেঁদেছিলাম, আর ভেবেছিলাম জাপান কতদূর?

অনন্ত মৃদুস্বরে বলিল, বসো কেতকী। বসে বলো।

কেতকী বসিয়া বলিল, তুমি তো ছিলে না, শেষ দু মাসের ইতিহাস শোনো। দুদিন তিনদিন অন্তর রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখে আঁতকে জেগে উঠত। কাঁপতে কাঁপতে বলত, কেতকী ওঠো আলো জ্বালো শিগগির! বক্তে আমি নেয়ে উঠেছি। ধড়মড় করে উঠে আলো জ্বালতাম। দেখতাম, ঘামে ওর সর্বাংগ ভেসে গেছে। স্বপ্নের কথা বলতে গিয়ে ও বারবার শিউরে উঠত। গগন-ছোঁয়া কালীমূর্তি, প্রকাণ্ড জীব বুকে এলিয়ে পড়েছে, দু কষ বেয়ে স্রোতের মতো রক্ত ঝরছে—এর পায়ের কাছে স্বপ্নে ও দিত নরবলি।

কেতকী জানালা হইতে সরিয়া গেল। তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল। বাহিরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, সেই থেকে আমায় এখানে এনে ফেলেছে। একটা ঝিকে পর্যন্ত কাছে থাকতে দেয় না, এক-একদিন রাত্রে আমার এমন ভয় করে!—যে তাড়াতাড়ি মেঘ বাড়ছে রাত্রে না জানি কী ঝড়বৃষ্টিই হবে!

অনন্ত বলিল, ঝড়বৃষ্টি হওয়া আর আশ্চর্য কী।

আশ্বিনে ঝড় কালবৈশাখীর চেয়ে ভয়ানক হতে পারে, তা জানো?

আগামী ঝড়ের চিন্তা যে তাহাকে বিশেষ বিচলিত করিয়াছে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

অনন্ত সহজভাবে বলিল, তা নিশ্চয় পারে! কিন্তু তোমাদের বাড়িতে কি সন্ধ্যাদীপ জ্বলে না! অন্ধকার হয়ে গেল যে!

কে জ্বালবে সন্ধ্যাদীপ? আমি? কাজ নেই সন্ধ্যাকে অমন লজ্জা দিয়ে! বলিয়া কেতকী হাসিল, চাকর লণ্ঠন জেলে আনছে।

চাকর বোধ হয় এই কাজেই ব্যাপৃত ছিল, অল্পক্ষণ পরেই ঘরে আলো দিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে কী পরিবর্তন যে ঘটিয়া গেল বলিবার নয়। ঘর আলো হওয়ামাত্র বাহিরের অন্ধকার গাঢ় হইয়া ধ্বংসপুরীকে নিজের মধ্যে যেন সম্পূর্ণ লুপ্ত করিয়া দিল। অনন্তর মনে হইল একটা বিশ্রী দুঃস্বপ্নের শেষে কেতকীর তিন বৎসর পূর্বেকার ঘরখানাতেই সে জাগিয়া উঠিয়াছে;—এ ঘরের চারিদিকে ভাঙা ইটের স্তূপ নাই, আগাছার জঙ্গল নাই, আছে ফুলের বাগান এবং বাগানের শেষ শহরের জনবহুল আলোকিত পথ।

পাশের ঘরে বাসনপত্র নাড়াচাড়ার শব্দ পাওয়া যাইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর ও চাকর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল।

আমরা যাচ্ছি মা।

কেতকী বলিল, সব ভালো করে ঢেকে রেখেছ ঠাকুর? আচ্ছা, একটু দাঁড়াও।

অনন্তর দিকে চাহিয়া বলিল, খেয়ে নিয়ে তুমিও এদের সঙ্গে চলে যাও। কাছারি-বাড়িতে এরা তোমার শোবার ব্যবস্থা করে দেবে।

অনন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, কেন? এখানে শোবার ঘর নেই?

আছে। কিন্তু তুমি যাও। এই ভাঙা বাড়িতে রাত কাটাবে কোন দুঃখে?

কেতকীর পাংশু-মুখের দিকে চাহিয়া অনন্ত হাসিয়া বলিল, বেচারিরা ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চাইছে, দরকার না থাকলে ওদের ছুটি দাও কেতকী।

তুমি যাবে না?

তুমি যদি যাও, যেতে পারি। যাবে?

কেতকী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আচ্ছা তোমরা যাও ঠাকুর।

অনুমতি পাওয়ামাত্র তারা এমনভাবে প্রস্থান করিল যে অনন্ত হাসি চাপিতে পারিল না।

কেতকী ম্লানমুখে বলিল, তুমি হাসছ, আমার যা হচ্ছে ভগবান জানেন। কী থমথম করছে চারিদিক!

অনন্ত হাসি বন্ধ করিল।

হাসা তাহার উচিত হয় নাই।

বাজনা নাই, ভক্তের কোলাহল নাই, একক পুরোহিতের নীরব পূজা। রাত্রির সঙ্গে গুমোট বাড়িয়াছে। তারার জগতে এখন মেঘের পরিপূর্ণ অমাবস্যা। কোথাও যেন শব্দ নাই, জীবনের স্পন্দন নাই, নিশ্চল পাষাণ মূর্তির সামনে ধ্যানস্থ ভক্তের মতো সমস্ত জগৎ যেন একটা ভয়ংকর অবরুদ্ধ শক্তির মুক্তি পাইবার প্রতীক্ষায় সমাধি পাইয়াছে।

মাঝে মাঝে এক একটা রাত্রিচর পাখি ডাকিয়া ওঠে, বটগাছে দুটি তক্ষক পালা করিয়া বীভৎস আর্তনাদ করে, মন্দিরের গায়ে ছোটো ছোটো চতুষ্কোণ ফাঁকগুলিতে যে বন্য-কপোতেরা আশ্রয় লইয়াছে তারা পাখা ঝাপটায়, মন্দিরের পিছনে জঙ্গলাকীর্ণ শুষ্কপ্রায় দীঘিতে ছপছপ করিয়া কী যেন হাঁটে। একটা বড়ো গুবরে পোকা দেবীকে ঘিরিয়া বোঁবোঁ করিয়া পাক খাইতে খাইতে বারকয়েক একদিকের দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া মেঝেতে পড়িয়া যায়। কিন্তু এই সব বিচিত্র শব্দে ও অবিশ্রান্ত ঝিঁঝির ডাকে স্তব্ধতা বাড়ে বই কমে না।

শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া অনন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। দেবীকে দক্ষিণে রাখিয়া সে পাশাপাশি হইয়া বসিয়াছে, ঠোঁটে মৃদু-মৃদু হাসির আভাস, অর্ধনিমীলিত চোখে স্তিমিত চাহনি। প্রশস্ত কপালে যেন অনুর্বর প্রান্তরের কঠোরতা। বলি হইয়া গিয়াছিল, প্রতিমার সামনে ছিন্ন ছাগমুণ্ডের নৈবেদ্য ও একপাত্র শোণিতের পানীয়। প্রতিমার চোখ-দুটি আগুনের মতো জ্বলিতেছে, কিন্তু রক্ত তিনি একবিন্দুও পান করেন নাই। শঙ্করের কপালেই একটি রক্তের ফোঁটা জমাট বাঁধিয়া আছে।

জামার হাতায় টান পড়িতে অনন্ত সচেতন হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখে, কেতকী কাঁপিতেছে।

চলে এসো। আমার ভয় করছে।

কথাটা শঙ্করের কানে গেল।

ভয় করছে কেতকী? মার কাছে অভয় প্রার্থনা করো।

পুনরায় অনন্তকে টানিয়া কেতকী বলিল, এসো।

শঙ্কর বলিল, মাকে প্রণাম করে যাও কেতকী। এসো মার মাথার সিঁদুর তোমায় পরিয়ে দিই। মার দয়ায় সব ভয় ভুলে যাবে। মা আমার সকলকে ক্ষমা করেন—সকলকে।

এ যেন ছাগশিশুর চেয়ে অসহায়ের উপর হত্যার চেয়ে নিষ্ঠুর অত্যাচার। কেতকী গলায় আঁচল জড়াইয়া প্রণাম করিতে যাইতেছিল, অনন্ত তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল, মনে মনে প্রণাম করো কেতকী। মা মনের প্রণামেই খুশি হন। চলো।

আলোটা তুলিয়া নিয়া কেতকীর হাত ধরিয়া অনন্ত সাবধানে ভাঙা সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিল।

দেউড়ির নীচে তিন-চারহাত লম্বা একটা কালো মোটা সাপ শুইয়াছিল, আলো চোখে পড়িতে আধহাত উঁচু ফণা তুলিয়া স্থির হইয়া রহিল।

দুজনে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কেতকী ফিসফিস করিয়া বলিল, নড়ো না, আলো নেড়ো না। ছুটে এসে ছোবল দেবে।

অনন্ত নড়িল না, আলোও নাড়িল না, মৃদুস্বরে বলিল, এই ভদ্রলোকটির সন্ধানেই চারিদিকে চঞ্চলভাবে তাকাচ্ছিলে বুঝি? আমি ভাবছিলাম মন্দির থেকে নেমে এসেও তোমার ভয় কমেনি। কতক্ষণ পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে উনি পথ দেবেন?

দু-এক মিনিট।

অভিজ্ঞতা আছে দেখছি। এ বাড়ির এই সব বিপদও কি তিনবছর ধরে তোমায় এড়িয়ে চলেছে?

কেতকী মৃদু হাসিল, সাপ আর বিপদ কী!

সাপ যে বিপদ নয় সঙ্গে সঙ্গেই সে প্রমাণ পাওয়া গেল। কেতকীর দুই হাতের মধ্য দিয়া অমনি মোটা আর একটি সাপ মন্থর গতিতে দেউড়ির তলে সঙ্গীর কাছে আগাইয়া গেল।

কেতকী বলিল, ওর বউ। ভারী শান্ত।

তা দেখতেই পাচ্ছি। এখানকার যমরাজাও ভারী শান্ত। স্বামীর গায়ের উপর দিয়ে পিছলাইয়া গিয়া শান্ত সর্পবধূ একটা ইটের স্তূপে ঢুকিয়া পড়িল। ফণা নামাইয়া স্বামীটিও তাহাকে অনুসরণ করিল।

কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে পুনর্মিলন বেচারির অদৃষ্টে ছিল না। ইটের স্তূপের কাছে পৌঁছিবার পূর্বেই একটা আস্ত ইট কুড়াইয়া নিয়া অনন্ত সামনে আগাইয়া গেল এবং সাপের মাথা লক্ষ করিয়া সজোরে ইটটা ছুঁড়িয়া মারিল।

শিহরিয়া কেতকী অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া উঠিল, এ কী করলে?

অনন্তর তখন কথা কহিবার সময় ছিল না। ইটের আঘাতে ফণার খানিক নীচে মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যাওয়ায় সাপটা ওলট-পালট খাইতেছিল, একটির পর একটি ইট তুলিয়া অনন্ত ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল। সাপের ফণা ছেঁচিয়া গেল, রক্তাক্ত দেহটা একবার দড়ির মতো পাকাইয়া গিয়া আর নড়িল না, লেজের দিকটা শুধু এদিক ওদিক আন্দোলিত হইতে লাগিল।

অনন্ত হাত ঝাড়িয়া বলিল, যাক। এবার ওর শান্ত বউটা বাকি রইল।

কেতকী ধরা গলায় বলিল, কেন মারলে?

সাপ মারতে হয় কেতকী। বেঁচে থাকতে হলে ভাঙা বাড়ির সংস্কার করার মতো এও অপরিহার্য কর্তব্য।

তাই বলে ইট দিয়ে কেউ অত বড়ো সাপ মারে! যদি না লাগত? চোখের পলকে তাহলে—কেতকী শিহরিয়া উঠিল।

অনন্ত হাসিয়া বলিল, সাপটা মরে গেছে, না লাগার কথা এখন আর ওঠে না। কিন্তু প্রথমবার তুমি যে 'এ কী করলে' বলে চেঁচিয়ে উঠলে সে তো আমার বিপদের কথা ভেবে নয়?

কেতকী বলিল, ওঁর নিষেধ ছিল। একজন চাকর একবার এতটুকু একটা বাচ্চা সাপ মেরেছিল, চাবকিয়ে উনি তার পিঠের কিছু রাখেননি। আজও বোধ হয় বেচারির পিঠের দাগ আছে। ওঁর মতে,—মা কালীর ডাকিনী-যোগিনীরা এ বাড়িতে সাপ হয়ে আছে—মারলে মহাপাপ হয়, অকল্যাণ হয়, সর্বনাশ হয়।

অনন্ত শান্তভাবে বলিল, আমিও এই রকম কিছু অনুমান করেছিলাম কেতকী। সেই জন্যেই তো মারলাম।

কেতকীব মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। অস্ফুটস্বরে সে বলিল, সেই জন্যে মারলে? তবে যে বললে সাপ মারতে হয় বলেই—

সাপ মারতে হয়, কিন্তু ইট দিয়ে আমি সাপ মারি না কেতকী। বিপজ্জনক অভ্যাস। লাঠি খুঁজি। সেই অবসরে সাপ যদি পালায় একটু দুঃখিত হই না।

তবে? আজ কী জন্যে এমন করলে? কী বুঝেছ তুমি?

লণ্ঠনের আলোর ব্যাপ্তি আর কতটুকু, চারিদিকের গাঢ় অন্ধকারের হিংসায় এ যেন ক্ষুদ্র অক্ষম ভালোবাসা। অনন্ত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল, আমি কিছু বুঝিনি কেতকী এই ভাঙা বাড়ির প্রেম শঙ্করকে কেন পাগল করলে সে কি বোঝা যায়! সাপ আর ইটের স্তূপের জন্য ওর তো একবিন্দু মমতা থাকার কথা নয়!

কেতকী সহসা হাসিল, না, তা থাকার কথা নয়। ও আরও অনেকদিন বাঁচতে চায়।

অনন্ত বলিল, তা জানি। তাই ওব ঘরে কার্বলিকের গন্ধ পেয়েছিলাম। ঝড়ের সম্ভাবনা দেখলে ও তাই সারারাত মন্দিবে পুজো করে।

কেতকী প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিল।

খাবে চলো। আলোটা দাও, আমি আগে যাই।

অনন্ত তাহার হাতে আলো দিল, কিন্তু চলিতে আরম্ভ করিল তাহাকে পিছনে বাখিযা। বলিল, সাপেব শান্ত বউটি যদি স্বামীহত্যার প্রতিশোধ নিতে চায় আমাব ওপরে নেওয়াই উচিত কেতকী। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—

কেতকী বলিল, এ সব অলুক্ষুনে কথা বলা কেন? কাল তুমি ভালোয় ভালোয় ফিরে যেযো বাপু।

ঝড় ওঠে শেষবাত্রে।

কেতকী যে বলিয়াছিল আশ্বিনের ঝড কালবৈশাখীর চেয়ে প্রবল হইতে পাবে, ঝড়ের প্রথম ঝাপটার পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাহার সত্যতা প্রমাণিত হইয়া যায়।

অনন্তকে শেষরাত্রে রওনা হইতে হইয়াছিল, সারাদিন গাড়িতে পালকিতে কাটিযাছে। শুইতেও প্রায় বারোটা বাজিযা গিযাছিল। ঘুমও যেন চোখ ছাড়িযা নড়িতে চাহে না অথচ প্রকৃতিব এই তাণ্ডবলীলার মধ্যে ঘুমানোও অসম্ভব। নিদ্রামিশ্রিত নিস্তেজ জাগবণে কিছুই ভালো করিয়া বুঝিতে পারা যায় না, কেমন একটা গুরুভাব আতঙ্ক বুকে চাপিয়া থাকে। চাবিদিক হইতে যেন ভয়ানক একটা বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে, অথচ এমনি অবশ্য অসহায় অবস্থা যে, প্রতিকারের জন্য আঙুলটিও তুলিতে পারা যাইবে না।

কী যেন ঘটিবে,—ঘটিল বলিয়া! এক অজানা শত্রুর বিলম্বিত প্রতিশোধ কোন দিক দিয়া যেন আঘাত করিবে। ভিজা মাটির সোঁদা গন্ধে যেন তাহার হিংসার আভাস মেলে, দেওযালে দেওয়ালে তাহারই সহস্র ক্রুদ্ধ কবাঘাতের শব্দ শোনা যায়।

সহসা প্রবল আঘাতে অনন্ত পূর্ণমাত্রায় সচেতন হইয়া ওঠে। কতকক্ষণের জন্য তার মনে হয কে যেন সত্যই তাহার বুকে সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছে—একটা পাঁজবও আর আস্ত নাই। নিশ্বাস টানিবার শক্তি খানিকক্ষণ তাহার থাকে না—হাঁ করিয়া আস্তে আস্তে সে হাঁপাইতে থাকে। সামান্য বাতাসটুকু ভিতরে নিতে গিয়াই বুকের পাঁজরগুলো তার টনটন করিয়া ওঠে। অস্ফুটস্বরে সে কাতরাইতে আরম্ভ করিয়া দেয।

কিন্তু বেশিক্ষণ ও ভাবে পড়িয়া থাকা যায় না। দেশলাইয়েব সন্ধানে বিছানা হাতড়াইয়া সে অনুভব করে ধুলা ও কাঁকরে বিছানা ভরিয়া গিয়াছে এবং পাশেই পড়িয়া আছে চুনসুরকির চাপড়া লাগানো

অনাদি শঙ্কিত হইয়া নিঃশব্দেই কাঁদিল। দুয়ারের সম্মুখে নির্নিমেষ করিয়া
মেয়েটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে চৌকাঠ হইতে নামিয়া পড়িল।

দরজার বাহিরে যাওয়া হাওয়া, কিন্তু ব্যবধান ও আলোকিত অন্ধকার
যেন তাহারই প্রতীক্ষা করিয়া[redacted] ছিল। সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনাদি যেন নিজ
দুয়ারের সামনে নিজে দাঁড়াইল। দরজা বিচ্ছিন্নতার নাই, কিছু আর থাকিলেও
না, বাতাস বহমান হইয়া সে শেষ করিতেছে। সে চৌকাঠ এক আশ্রয়
দরজা ভাঙিয়া ফেলেই অনাদির কাছে সহজ মনে হইল।

দরজা ভাঙিল সহজেই।
ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। অনাদি চাহিয়া দেখিল আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়া
কেতকী নিস্পন্দে যেন ঘুমাইয়াই আছে, আড়াআড়ি ভাবে তার বুকের
উপর পড়িয়া আছে একটা সুপ ...।
কাছে গিয়া অনাদি হঠাৎ একেবারে (হইয়া) ঠিকানাহীন হইতে পারিল।

রক্তবর্ণ মুখ মেলিয়া শাড়ির বহুমূল্য ফাঁসের নীচে অন্তরিত সেইখানের
দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর একটা ভাঙা কাঠি খুঁজিয়া লইয়া খুঁচিয়া খুঁচিয়া
ইহা আনিয়া হলের সুন্দর ফেলিতে লাগিল।
সেইখানেই সে সম্পূর্ণভাবে থামিয়া দিতে চায়। সমস্ত রাত্রি সে শয্যায় হইবে
পরস্পরের ভালবাসিয়াছে অনন্তকাল সেই শয্যাতেই হইবে ঘুমাইয়া থাক,
শাস্ত্রের বাধাও নাই। কিন্তু কেহ যেন না জানে।
মানুষের মাটির সেই মাটিতে পরিণত হইতে কত সময় লাগে? শেষবেলায়
শেষ হইয়া মুড়িটা তুলিতে না পারিয়া মাটিতে বসিয়া শাড়ীর
ভাঁজই খুলিতে লাগিল।

শ্রী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

'সর্পিল' গল্পের পাণ্ডুলিপি-ধৃত পাঠের মধ্যভাগে একটি সমাপ্তিবাচক রেখা দৃষ্টে মনে হয় গল্পের সমাপ্তি প্রথমবারের তুলনায় লেখক কর্তৃক পরিবর্তিত হয়েছে, নায়কের নামও পরিবর্তিত হয়েছে।

একটি আস্ত টালি। বুকের বেদনা বিস্মৃত হইয়া সে তড়িদ্‌বেগে উঠিয়া বসে। এবার আর তার বুঝিতে কষ্ট হয় না যে দেওয়ালে দেওয়ালে যে আর্তবিলাপ আরম্ভ হইয়াছে, সে শুধু বাতাসের কান্না নয়, ওর মধ্যে মিশিয়া আছে প্রত্যেকটি ইটের মুক্তি পাইবার শব্দিত ব্যাকুলতা।

দিয়াশলাই খুঁজিয়া লইয়া কম্পিতহস্তে অনন্ত একটা কাঠি জ্বালিল। দুয়ারের অবস্থান দেখিয়া লইয়া কাঠিটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সে চৌকি হইতে নামিয়া পড়ে।

দরজাব বাহিরে পাগলা হাওয়া বারিকণা লইয়া যে খেলা খেলিতেছিল তাহার বর্ণনা হয় না। সমস্ত অন্ধকার যেন সে উন্মত্ত খেলায় আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। এমন ঝড়-বাদল অনন্ত জীবনে আর দেখে নাই। পায়ে ভর দিয়া দাঁড়ানো অবধি বুকের ভিতর আবার অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছিল, দেওয়াল ধরিযা ধরিয়া অনন্ত অতিকষ্টে আগাইয়া যায়। মাঝে একখানা ঘরের পরেই কেতকীর ঘর—এই সামান্য দূরত্বটুকু যেন আর অতিক্রম করা যায় না। অনন্ত সজোরে দাঁতে দাঁত কামড়াইয়া ধরে।

অবশেষে কেতকীর দরজাটা হাতে ঠেকে। বিদ্যুৎ ক্রমাগতই চমকাইতেছিল, অনন্ত লক্ষ করে বাহির হইতে দরজায় শিকল তোলা রহিয়াছে।

পতনোন্মুখ গৃহ ত্যাগ করিয়া কেতকী মন্দিরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে—এ কথা ভাবিয়া প্রথমটা অনন্ত পরম স্বস্তি বোধ করে। কেতকী ঘুমাইয়া থাকিলে চারিদিকের এই প্রচণ্ড শব্দের মধ্যে তাহাকে ডাকিয়া তোলা সহজ হইত না। দরজায ধাক্কা দিয়া লাভ ছিল না, বাতাস বহুক্ষণ ধরিয়া বীরবিক্রমে সে কাজ করিতেছে। নিজের কানে পৌঁছিবার মতো শব্দও বোধ হয় তাহার ফুসফুসে এখন নাই। কিন্তু যেমন কবিয়াই হোক কেতকীকে ডাকিয়া তুলিতে হইবে;—এই ঝড়ে এখানে থাকা অসম্ভব। আপনা হইতে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজিয়া নিয়া সে ভালোই করিয়াছে।

কিন্তু তাহাকে একবার না ডাকিয়াই কেতকী চলিয়া গেল? ঝড়ের সম্ভাবনা দেখিযা সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর-চাকরের সঙ্গে তাহাকে গ্রামে পাঠাইয়া দিবার জন্য যে অমন ব্যাকুল হইয়াছিল?

অনন্ত শিকল খুলিয়া ফেলে। বাতাসের ধাক্কায় দুই পাট দরজা আছড়াইয়া খুলিয়া যায়।

ঘরেব কোণে আলো জ্বলিতেছিল, বাতাসে নিভিয়া যায নাই। অনন্ত দেখিতে পায় আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিযা কেতকী বোধ হয নিরুদ্‌বেগে ঘুমাইয়াই আছে, আড়াআড়িভাবে তাহার বুকের উপর পড়িয়া আছে একটা স্থূল কড়িকাঠ।

ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া রাখিযা কেতকী যে এমনভাবে ঘুমাইয়া পড়ে নাই বুঝিতে অনন্তর কষ্ট হয় না। অনেক টানাটানি করিয়াও বাহির হইতে শিকল লাগানো দুয়ারটা যখন সে খুলিতে পাবে নাই, তখনই এ ভাবে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়াছে।

কাছে গিয়া অনন্ত দুই হাতে কড়িকাঠটা ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিয়া দেয়।

সকালে ঝড় কমে কিন্তু থামে না।

রক্তবর্ণ চোখ মেলিয়া শঙ্কর বহুক্ষণ ইষ্টকস্তূপের নীচে অর্ধাবৃত দেহাংশ দুটির দিকে চাহিয়া থাকে। তারপর একটা ভাঙা ঝুড়ি খুঁজিয়া নিয়া ঝুড়ি ঝুড়ি ইট আনিয়া ইটের স্তূপে ফেলিতে থাকে।

দেহ দুটিকে সে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া দিতে চায়। সমস্ত রাত্রি যে শয্যায় ইহারা পরস্পরকে ভালোবাসিয়াছে অনন্তকাল সেই শয্যাতেই ইহারা ঘুমাইয়া থাক, শঙ্করের আপত্তি নাই। কিন্তু কেহ যেন না জানে।

মানুষের মাটির দেহ মাটিতে পরিণত হইতে কত সময় নেয়? শেষ বেলায় ইটের শেষ ঝুড়িটা তুলিতে না পারিয়া মাটিতে বসিয়া শঙ্কর তাহাই ভাবে।

বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে সে ঠকঠক করিয়া কাঁপে। তাহাকে ঘিরিয়া থাকিয়া থাকিয়া বাতাস গর্জায়।

পোড়াকপালি

কচি ছেলে লইয়া সংসারের সব কাজ করিতে কুসুমের হিমসিম লাগিয়া যায়। ছেলেটাও হইয়াছে আচ্ছা, কাজের সময়েই চোখে ওর একদম ঘুম নাই। কাঁথায় চিত করিয়া শোয়াইয়া দিলে ও-বাড়ির সুশীলার ছেলের মতো একটু-যে খেলা করিবে, তাও নয়। কোল হইতে নামাইলেই কান্না।

সংসার অবশ্য ছোটো, শুধু স্বামী তারক। কিন্তু যত ছোটো হউক, সংসার তো? সবই করিতে হয়। সকালে উঠিযা ঘব-লেপা বাসন-মাজা উনুন-ধরানো, তারককে চা জলখাবার করিয়া দেওয়া, ছেলেকে দুধ-খাওযানো, নটার মধ্যে রান্না শেষ করা,—এর কোন কাজটা একদিন বাদ দিলে চলে কে বলিতে পারে বলুক দেখি! এ তো গেল একবেলার বড়ো বড়ো কাজেব হিসাব, খুঁটিনাটি কাজ অমন হাজারটা আছে। সামান্য এক গেলাস জল ভরিয়া দেওয়ার কথাটাই ধর। কোথায় গেলাস আছে খুঁজিয়া আনো, কলসির কাছে গিয়া জল গড়াও, যে জল চাহিযাছে তার কাছে পৌঁছাইয়া দাও, গেলাস খালি কবিয়া দেওয়া পর্যন্ত দাঁড়াইয়া থাক, তারপর যেখানকার গেলাস সেখানে রাখিযা এসো—তবে ওই সামান্য কাজের পরিসমাপ্তি।

ছেলে-কোলে মানুষ অত করিতে পারে? তবু সবই করিতে হয়। চাকর বামুন রাখিবাব সামর্থ্য নাই। খোকা হইবার পর হইতেই কুসুমের শরীরটাও ভালো যাইতেছে না। মাঝে তো কদিন খুব জ্বরেই ভুগিল। সকালবেলা বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে আজকাল তার বড়ো কষ্ট হয়, প্রত্যেকদিন শেষবেলায় তার বুক জ্বলে ও সন্ধ্যার সময় মাথা ধরে।

মাথার যন্ত্রণাটাই সবচেয়ে অসহ্য। মনে হয়, গলা ছিঁড়িয়া মাথাটা টিপ করিযা মাটিতে পড়িযা যাইবে,—এত ভাবী। গেলেও যেন বাঁচা যায। মাথা তো আছে সকলেরই, মাথা লইয়া এমন ভোগান্তি হয় কাহার?

তারক অবশ্য বলে,—একটা তেলটেল এনে দিই কুসুম। চুল যে সব উঠে গেল!

তেলের দাম কুসুমের অজানা নয়। এক টাকায় এই এতটুকু একটা শিশি। মাথায় তেল মাখাব জন্য সে বুঝি তাব খোকার দুধ নেওয়া বন্ধ করিবে?

পোড়াকপাল আমার! তেলের জন্য বুঝি? বুড়ি বউকে আর আদর-টাদব কব না, মনের দুঃখে তাই চুল উঠে যাচ্ছে।

তারক ভারী বউ-পাগল লোক। রূপকথার রাজপুত্রের মতো সে যেন সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া অনেক বাধাবিপত্তি জয় করিয়া অনেক দুঃখ-কষ্ট পাইয়া তার রাজকন্যাকে মাত্র কাল পরশু উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে, চার বছরের পুরানো বউকে সে এত ভালোবাসে।

সেদিনের জ্বরের কথাটাই কুসুম ভাবে। সে মরিতে বসে নাই, তবু নাওয়া-খাওযা ঘুমের কামাই তো ছোটো কথা, আপিস কামাই হইতেও তারকের বাকি ছিল না।

এত বেশি ভালোবাসার আওতায় কুসুম যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। লতাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে মেঘেরই ছায়া, রোদ আর গায়ে লাগিতে পায় না। সাধাবণ গৃহস্থঘরের মেয়ে সে, তার মামাবাড়ি চিরকাল মাটির প্রদীপ জ্বলিত। অত্যন্ত শান্ত আবেষ্টনের মধ্যে সে মানুষ হইয়াছে, হৃদয়ের কারবার যেখানে ছিল ঢিমে এবং সংক্ষিপ্ত, খানিক ভালোবাসা, খানিক লাঞ্ছনা, খানিক অবহেলা অশ্রদ্ধা! অনভ্যস্ত

এত তীব্র অনুভূতি তার সয় না। সে ঝরনার ধারের ছোটো চারা গাছ, আসিয়া পড়িয়াছে প্রকাণ্ড নদীর ধারে, যে নদীতে বারোমাসই বন্যা।

কুসুমকে আজকাল অনেক সময় আপন মনে বিড়বিড় করিয়া বকিতে শোনা যায়।

আপন মনে বকে বলিয়া কুসুমের যে মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, তাহা নয়। জীবনে তার আবেগের অভাব নাই, এদিকে তাহাকে বড়ো একা থাকিতে হয়। সকালে তারক পাড়ার একটি ছেলেকে পড়ায়, তারপরেই তাকে আপিসে যাইতে হয়। মাড়োয়ারি সওদাগরের আপিসে বাঙালি কেরানি, সন্ধ্যার অনেক পরে সে বাড়ি ফেরে। সারাদিন কুসুমকে মুখ বুজিয়া থাকিতে হয়, কথা বলিবার লোক নাই। দুপুরবেলা কোনো কাজ থাকে না কি-না, খোকা তাই সেই সময়টাই পড়িয়া পড়িয়া ঘুমায়।

লেখাপড়া কুসুম ভালো জানে না। কখনও বাড়িতে মাসিকপত্র আসিলে তিনদিনের চেষ্টায় একটা গল্প শেষ করে, সুতরাং ধৈর্যও থাকে না, রসও পায় না। আজকালকার গল্পে যে রকম চালাকি, এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিতে না পারিলে বোকাই বনিয়া যাইতে হয়।

বাড়িতে যে একটা পোষা পাখি নাই ইহাও কুসুমের কাছে অভাবের শামিল।

তারক পাখি কিনিয়া দিতে চায়, কুসুম মাথা নাড়ে, বলে, না আর পাখি পুষব না। তার একটা সাদা ধবধবে কাকাতুয়া ছিল, মরিয়া গিয়াছে। পাখি পুষুক আর পাখি মরুক, আর সে কাঁদিয়া সারা হোক। তার অত শখ নাই।

এমনিভাবে কাজের ভিড়ে হিমসিম খাইয়া আর কাজের অভাবে ছটফট করিয়া মহা দারিদ্র্যের মধ্যে পরম সুখে কুসুমের দিন যাইতেছিল, হঠাৎ ইতিমধ্যে তারক একদিন আপিস হইতে দুই পকেটে দুই শিশি মাথার তেল আর দেহে অস্বস্তি লইয়া বাড়ি ফিরিল।

তার কয়েকটা টাকা মাহিনা বাড়িয়াছে।

কুসুম বলিল, ওমা, এ কী? দু-শিশি তেল তুমি কোন হিসেবে আনলে? দু দুটো টাকা!

না, চোদ্দো আনা করে নিয়েছে।

চোদ্দো আনায় এক টাকায় তফাত তো ভারী!—আচ্ছা, মাইনে বেড়েছে, না হয় এনেছ একটা জিনিস শখ করে, একসঙ্গে দুটো কিনতে গেলে কেন?

আবার আনা হয় কি না-হয়· ও তোমার দু-মাসেই ফুরিয়ে যাবে দেখো।

দু-মাসে দু-শিশি তেল মাখে, কত বড়োলোক!—হাসিভরা মুখখানা কাত করিয়া কুসুম একটু ভাবিল। বলিল, মাইনে বেড়েছে তোমার, তেল পেলাম আমি' তোমার তো কিছু পাওয়া উচিত? তোমায় আজ লুচি খাওয়াব।

তারকের শরীর খুব খারাপ লাগিতেছিল, দুপুর বেলা আপিসে সে একবার বমি করিয়াছে। বোধ হয় জ্বর হইবে। লুচির নাম শুনিয়াই তার আবার বমি আসিতেছিল, কিন্তু কুসুমের আগ্রহ দেখিয়া সে আপত্তি করিতে পারিল না। খাবে না? শরীর খারাপ? বলিতে বলিতেই ওর দীর্ঘস্থায়ী অনির্বচনীয় হাসিটি একেবারে মুছিয়া যাইবে। তাছাড়া, জ্বর এখনও আসে নাই, আসিবে কি-না তাহাও অনুমান মাত্র। যখন আসিবে তখন দেখা যাইবে, এখন তো কুসুম হাসিমুখে লুচি ভাজুক।

কুসুম তাড়াতাড়ি ময়দা মাখিয়া লেচি পাকাইয়া উনুন ধরাইয়া ফেলিল। ডাক দিয়া বলিল, ওগো বাবুমশায়! লুচি খেতে হলে বেলে দিতে হয়।

তারক দাওয়ায় তামাক টানিতেছিল। হুঁকাটা দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিতে গিয়া গড়াইয়া পড়িয়া গেল। খোলা বাতাসের সংস্পর্শে ছাইয়ের আবরণ সরিয়া গিয়া টিকাগুলি জ্বলজ্বল করিতে লাগিল।

ছেঁড়া চটি দিয়া ঘষিয়া তারক টিকাগুলি গুঁড়া করিয়া দিল, অনেকগুলো আগুনের কণা উড়িয়া উঠানেব অপর পার্শ্বে গিয়া পড়িল। তারকের ধুতিতেও কয়েকটি ছোটো ছোটো কালো ছিদ্র হইয়া গেল।

হুঁকাটা সোজা করিয়া রাখিয়া বিরক্ত তারক আপন মনে বলিল, কী তেজ ওইটুকু আগুনের!

এদিকে রান্নাঘরে কুসুম ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কই গো, এলে? লুচি তোমায় বেলতে হবে না বাবু, এখানে এসে শুধু বসো, দুটো কথাবার্তা কই।

রান্নাঘরে গিয়ে তারক বলিল, আমি লুচি বেলতে জানি যে বেলব? আমি বরঞ্চ ভাজতে পাবি।

তোমার কিচ্ছু পেরে কাজ নেই। বসে বসে তুমি শুধু বকবক কর। বাব্বা, সাবাদিন মানুষেব গলার আওয়াজ শুনতে পাই না।

না, দাও আমি ভাজি।

কুসুম সসন্দেহে বলিল, পারবে?

লুচি ভাজতে পারব না কী গো? তোমার চেয়ে ভালোই পারব।

কিন্তু সে পারিল না। প্রথম লুচিখানা ছাড়িতে গিয়া তপ্ত ঘিয়ে আঙুল ডুবাইয়া ফেলিল। তারপর তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া আনিতে কড়াটাই দিল উলটাইয়া।

হাতে পায়ে গায়ে সর্বত্রই ঘি ছিটকাইয়া লাগিল। সর্বাপেক্ষা জখম হইল তার ডান পা-টি। দেখিতে দেখিতে সমস্ত পাযের পাতা জুড়িয়া এক প্রকাণ্ড ফোসকা পড়িয়া গেল।

দেখিলে ভয় করে।

তারকের ফোসকাগুলি আর সারিল না। কারণ, সেই রাত্রেই তাহার খুব জ্বর হইল, ডাক্তাবি ভাষায় যে জ্বরকে মেলিগ্‌ন্যান্ট বলে, এবং ফোসকা সারিবার ঢের আগে সে গেল মরিয়া।

শেষ রাত্রে সে মারা গেল, লোকজন জুটাইয়া খাটুলি ইত্যাদি আনিয়া তাহাকে শ্মশানে লইয়া যাইতে যাইতে পরদিন বেলা এগারোটা বাজিয়া গেল। সেদিন দারুণ দুর্যোগ করিয়াছে, সকাল হইতে ঝডবৃষ্টিব কামাই ছিল না। একটা মানুষকে ভালো করিয়া পুড়াইতে যত কাঠ দরকার তত কাঠ সংগ্রহ করা গেল না। চিতায় শোয়ানোর পর তারকের শরীরের কিছু কিছু অনাবৃত রহিয়া গেল।

মুখাগ্নি কবিল কুসুম।

চিতার খুব কাছে সে দাঁড়াইযা ছিল। চিতা ভালো করিয়া জ্বলিয়া উঠিলে যতটুকু সরিযা গেলে আগুনের তাত সহ্য হয় ততটুকুই সে সরিয়া গেল। তার চোখে জল নাই। সম্ভবত আগুনের তাতেই শুকাইয়া গিয়াছে।

ইতিমধ্যে দেখা গেল তারকেব দেহে বড়ো বড়ো ফোসকা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে এবং একে একে ফাটিয়া যাইতেছে। এ সব ফোসকায় জল নাই, শুধু আছে বাষ্প আর বাতাস।

কুসুমের মাথার মধ্যে পৃথিবী পাক খাইতেছিল, চিতাটা হাতের নাগালের সূর্য। মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া যাওয়ার ঠিক আগে কুসুমের মনে হইতেছে তারকের গায়ের ফোসকাগুলো ফোসকা নয়,—লুচি।

মাসখানেক পরে একদিন রাত্রিবেলা কুসুম মামাবাড়িতে রান্নাঘরে রাঁধিতেছিল। ডাল আর তরকারি রাঁধিয়া সে ভাত চাপাইয়াছে। ভাত-চাপানোর আগে মামি তাহাকে লুচি ভাজিতে বলিয়াছিলেন—মামার শরীর ভালো নয় ভাত খাইবেন না। কুসুম লুচি ভাজিতে রাজি হয় নাই। ভয়ে বিবর্ণ হইয়া বলিয়াছিল, আর যা বলবেন সব আমি করব মামিমা—লুচি ভাজতে পারব না।

কী করে যে মুখের ওপর পারব না বলিস বাছা বুঝতে পারি না। একে ওঁর সর্দি, এই বাদলাতে ভাত খেয়ে যদি অসুখ করে? ভাজতে না পারিস, ময়দাটা তো মাখতে পারবি, না তাও পারবি না?

কুসুম ময়দা মাখিয়া দিয়াছিল। মাখিতে মাখিতে তারকের অকালমৃত্যুর জন্য নিজেকে দৈনন্দিন হিসাবের চেয়ে একটু বেশি রকম দায়ি করিয়া ফেলিয়াছিল।

শ্মশানের মূর্ছা ঘরে আসিয়া ভাঙিবার পর যে আত্মগ্লানির জন্য সে কাঁদে নাই এ সেই আত্ম-নির্যাতন। স্বামীকে দিয়া সিঁদুর আনাইতে নাই এটা কুসুম জানিত, আজকাল তার ধারণা হইয়াছে বিষ্যুদ্‌বারের বারবেলায় স্বামী মাথার তেল আনিয়া দিলেও অমঙ্গল হয়। এ বিষয়ে কুসুমের যুক্তিও আছে। সিঁদুর পরে সধবা, তেলও সধবাই মাখে। দেবতার প্রসাদে তেল-সিঁদুরই সধবার সবচেয়ে কাম্য।

এ বিষয়ে সে কিন্তু একেবারে নিঃসন্দেহ নয়। তারক আরও কয়েকবার তাহাকে তেল কিনিয়া দিয়াছে, কখনও তো কিছু হয় নাই।

গরম ঘিয়ে পা পুড়িয়া না গেলে তারকের যে অত জ্বর হইত না, ইহাতে কুসুম লেশমাত্র সন্দেহ করে না। ম্যালেরিয়া ও রকম হয়? সে নিজে কত ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়াছে ম্যালেরিয়ায় মানুষ তিনদিনে মারা যায় না।

তারপর তারকের ভালো-মতো চিকিৎসাও হয় নাই। কোথা দিয়া কী হইয়া গেল, চিকিৎসার সময়ও যেন পাওয়া গেল না। পোস্টাপিসের টাকা জমানো রহিল, গায়ের গহনা বাঁধা পড়িল না, বড়ো বড়ো ডাক্তারেরা তারককে দেখার সময়টা অবসর-হিসাবে যাপন করিল। একটু নিরীহ দুর্বল প্রতিবাদ করিয়াই সে হইল বিধবা।

উনুনটা চমৎকার জ্বলিতেছে, রান্নাঘরের এককোণে জমা করিয়া রাখার দরুন এই বাদলেও কাঠগুলো শুকনো খটখটে হইয়া আছে। পিঁড়িতে উবু হইয়া বসিয়া কুসুম মোহাবিষ্টার মতো আগুনের দিকে চাহিয়া রহিল। কী রং আগুনের! কুসুম কতকাল দু-বেলা উনুন জ্বালাইয়া রান্না করিয়াছে, এমন স্থূল অগ্নিশিখায় এমন গাঢ় রঙের আবির্ভাব সে কখনও দেখে নাই। তারকের চিতায়ও না।

ওদিকে মামি লুচি ভাজিতেছিলেন, ঘিয়ের গন্ধে কুসুমের কষ্ট হইতে লাগিল। আগুনের অভূতপূর্ব রূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়াও ঘিয়ের গন্ধে সর্বাঙ্গে যে অস্বস্তিকর অনুভূতি হইতেছিল তাহাও সে উপলব্ধি করিতে পারিল। হঠাৎ রোমাঞ্চ হইয়া তার হাড়ের ভিতর পর্যন্ত শিরশির করিয়া উঠিল।

কুসুম খুব রোগা হইয়া গিয়াছে। দেহে মনে সুস্থ থাকার পক্ষে তার কতকগুলি গুরুতর অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। কয়েক মাসের মধ্যে পৃথিবী তার কাছে আর একটি মানুষ আদায় করিবে,—বৈধব্য-জীবনটা এ অবস্থায় উপযোগী নয়, রাত্রে তাহার ভালো ঘুম হয় না। শোক, অন্ধকার, ঘুমন্ত খোকা আর খানিকটা পাগলামি আজকাল কুসুমের রাত্রির সম্পদ। শোক তাহাকে থাকিয়া থাকিয়া কাঁদায়, অন্ধকার তাহাকে ভয় দেখায়, খোকা তাহাকে বিরক্ত করে, আর পাগলামি তাহাকে জাগাইয়া রাখে।

তার পাগলামি এইরূপ।

সে মনে করে তারকের সঙ্গে গল্প করিয়া সে যত রাত জাগিত এখন তারকের জন্য শোক করিয়া তার চেয়ে ঢের বেশি রাত জাগা উচিত। ঘুম আসিলেও সে তাই ঘুমায় না। ঘুমকে ঠেকানো তার পক্ষে কঠিন নয়। তারকের সোনার রং কেমন করিয়া পুড়িয়া কালো হইয়া ফোসকা পড়িয়াছিল সেই দৃশ্যটা কল্পনা করিলেই হইল। ঘুমের আর চিহ্নমাত্র থাকে না।

মামির বড়ো মেয়ে বাটি নিতে আসিয়া বলিল, কত কাঠ গুঁজেছিস কুসুম? একদিনে সব পুড়িয়ে শেষ করবি না কি?

আনমনে গুঁজে ফেলেছি দিদি।

কুসুম তিন-চারখানা কাঠ টানিয়া বাহির করিয়া জল ছিটাইযা নিবাইয়া উনুনের পাশে রাখিল। ধোঁয়ায় তার চোখ কটকট করিয়া জল পড়িতে লাগিল। জ্বলন্ত কাঠ ভালো কবিয়া না নিবাইলে যেমন ধোঁয়া হয় তেমনি একটা বিশ্রী শ্মশান-আশ্রয়ী গন্ধ ছাড়ে।

ধোঁয়ার ছলনায় নয়, প্রকাশ্যে এবং গোপনে কুসুম আজকাল খুব কাঁদে। তার চোখের জল জমাইযা রাখিলে একটা বাটি ভরিয়া যাইত।

মুছিয়া মুছিযা চোখ শুকনো হইলে কুসুম চাহিয়া দেখিল ভাবী একটা বিপদের সূত্রপাত হইয়াছে। উনুনের পাশে এক আঁটি পাটকাঠি বেড়ায় ঠেস দিয়া রাখা হইযাছিল, ইতিমধ্যে কখন নেবানো কাঠগুলির একটা আপনা-আপনি জ্বলিযা উঠিযা তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিযাছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে এ আগুন বেড়ায় লাগিবে এবং দেখিতে দেখিতে খড়ের চাল জ্বলিয়া উঠিবে। বৃষ্টিতে চালেব উপরিভাগ অবশ্য ভিজিয়া আছে, কিন্তু আগুনকে ঠেকাইবার ক্ষমতা তাহার নাই।

রান্নাঘবের চাল একবার জ্বলিয়া উঠিতে পারিলে বাড়ির অন্য ঘরগুলিকেও দলে টানিবে। পাশের মুখুজ্যে-বাড়ি বেহাই পাইবে না, সরকাবদের বাড়িটাও মুখুজ্যে-বাড়িব লাগাও। পাটকাঠিগুলিব মধ্যে সদ্যজাগ্রত ওই ভীবু ও দ্বিধাগ্রস্ত শিশু অগ্নিদেবতাটি আজ পাড়ায় লঙ্কাকাণ্ড না করিযা ছাড়িবে না।

ব্যাপাবটা কুসুম চমৎকার কল্পনা করিতে পাবে। একটা বিরাট বিশ্বগ্রাসী চিতা—একবাত্রে একসঙ্গে একবাশি মানুষের সর্বনাশ! রঙে আর উত্তাপে অন্ধকার আর শূন্য ভরপুব হইযা যাওয়া এবং তাহারই চারিদিকে কেবল হায় হায়, কেবল বুক-চাপড়ানো!

দুই চাবিজন পুড়িয়া মরিবে না?

তীব্র তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলিযা কুসুম হিংস্র সাপের মতো অগ্নিশিখার হেলিয়া-দুলিযা বাড়িয়া-কমিয়া শ্লথ সন্তর্পণ অগ্রগতি চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ধীরে ধীবে আকার বাড়িতেছে, হেলানো সুদীর্ঘ সমিধ বাহিয়া ধীব অনিবার্য বেগে উপরে উঠিতেছে।

ঘরে আজ নিশ্চয় আগুন লাগিবে।

আর কেহ পুড়িযা না মরুক, কুসুমের আজ উদ্ধার নাই। সে কিছুতেই পলাইতে পারিবে না। পিঁড়ির সঙ্গে মাটির সঙ্গে সে একেবাবে আঁটিযা গিয়াছে, তাহার সর্বাঙ্গে পক্ষাঘাত হইয়াছে, সে অবশ, অবসন্ন। উঠিবার, নড়িবাব, টানিয়া পাটকাঠিগুলি সরাইয়া আনিবাব শক্তিও তাহার নাই। সে পালাইবে কেমন কবিযা?

কুসুম স্পষ্ট দেখিতে পাইল, খড়ের জ্বলন্ত চালের নীচে চাপা পড়িয়া সে ছটফট করিতেছে, তার গায়ের চামড়া কয়লাব মতো কালো হইয়া যাইতেছে আর সর্বাঙ্গে পড়িতেছে বড়ো বড়ো ফোসকা। কাল্পনিক মৃত্যুর বীভৎসতাব আতঙ্কে কুসুম এক প্রকার উৎকট আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

তাব আব কিছুমাত্র সংশয় রহিল না যে, একবার হাত বাড়াইলেই যে বিপদ আটকানো যায় সে-বিপদের সামনে সে যে হাত গুটাইয়া বসিয়া আছে সে বিধান ঈশ্বরের। ঈশ্বর তার বাড়াইবার শক্তি হরণ করিয়াছেন। সে সতী কী-না, বিলম্বিত সহমরণকে নিজেও তাই ঠেকাইতে পারিতেছে না।

নিজে সে এ আয়োজন করিতে পারিত না। তার আত্মহত্যার মধ্যে শুধু আত্মহত্যার পাপ নয় নরহত্যার পাপও আছে। কিন্তু ঘরে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া মরাতে আর তার হাত কী? সে জন্য তাহাকে নরকে যাইতে হইবে না, কাহারও কাছে কোনো কৈফিয়ত দিতে হইবে না, হাসিতে হাসিতে সে স্বর্গে তারকের কাছে চলিয়া যাইবে। পঁয়ত্রিশ দিনের বেশি সে যে বিধবা হইয়া থাকিল না ইহার গৌরবে মুগ্ধ হইয়া লোকে ধন্য ধন্য করিবে।

খোকার কথা কুসুম ভাবিয়াছে। মামির ছোটো ছেলেটি আর নাতি-নাতনির সঙ্গে সে শুইয়া আছে, তাদের সঙ্গে ওকেও সকলে সরাইয়া লইবে নিশ্চয়। কোলের ছেলে তার মরিবে না। কষ্ট অবশ্য সে অনেক পাইবে, কিন্তু তাহা বিধাতার ইচ্ছা, কুসুমের ওতে হাত নাই। মার মরণের ব্যবস্থা আজ যিনি করিলেন মার ছেলের বাঁচার ব্যবস্থাও তিনিই করিবেন। কুসুমের মাথায় যত চুল ততকাল ধরিয়া করিবেন।

এতক্ষণে আগুন আঁটি-বাঁধা পাঁকাটির মাঝামাঝি পৌঁছিয়াছে এবং বেশ জোরেই জ্বলিতেছে। এখানটা ভালো করিয়া পুড়িয়া যাইতেই পাঁকাটিগুলি ভাঙিয়া নীচে পড়িয়া গেল। ঘরে যে আগুন আজ লাগিবেই তাহার আর তেমন নিশ্চয়তা রহিল না।

পুড়িতে পুড়িতে একসময় আগুন নিবিয়া গেল, অবশিষ্ট রহিল খানিকটা ছাই, কিছু জ্বলন্ত কয়লা আর কয়েক টুকরো পাঁকাটি।

কুসুমের মনে হইল সে খুব বেদনা পাইয়াছে, ভারী হতাশ হইয়াছে।

রান্নার খুন্তিটা দিয়া সে তাহার স্থূল আকাঙ্ক্ষার দগ্ধাবশেষগুলি নাড়িতে লাগিল। ছাইয়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়িল আধপোড়া একটা তেলাপোকা।

আগন্তুক

স্টেশনে নামিয়া মুকুল চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। সে বড়ো বিস্মিত হইয়াছে। পাঁচ বছরে স্টেশনটির কোনো পরিবর্তন হয় নাই, এমনকী, পার্সেল আপিসের দেয়ালে যেখানে যে অবস্থায় কবিরাজ মশায়েব জ্বরের পাঁচনের বিজ্ঞাপনটি লটকানো ছিল, সেটি সেইখানে সেই অবস্থাতেই ঝুলিতেছে, কিন্তু তবু চারিদিকে কেমন যেন অপরিচযের ছাপ। কিছুই সে ভোলে নাই, কাঁকর-বিছানো প্ল্যাটফর্ম, কালো আর সাদা রঙের পাঁচটা সিগ্‌ন্যাল লিভার, ইটের উপর লাল রং-করা রেলের আপিস, ওয়েটিং রুমের ধুলামাখা খড়খড়ি, টিকিট-ঘরের ঘুলঘুলিতে মরিচা-ধরা লোহার শিক আব বাহিবে যাওয়ার পথে বাঁকানো লোহার পাতের নিষ্কর্মা গেট, সবই সে বেশ চিনিতে পারিতেছে, কিন্তু আজিকাব চেনা কেমন যেন অভিনব। এই জড় পদার্থগুলোর সঙ্গে তার পরিচয়ের যোগসূত্রটি যেন ছিঁড়িযা গিয়াছিল ; স্টেশনে নামিয়া দাঁড়ানো মাত্র গিঁট পড়িয়া তার দুটি ছিন্নপ্রান্ত জুড়িয়া গেল, কিন্তু গিঁটের অস্তিত্বটাই হইয়া রহিল স্বপ্রধান।

স্বাভাবিক মোলায়েম যোগ যেন নাই, গিঁটের মধ্যে যে কৌশল ও শক্তিটুকু সংহত হইযা আছে তারই কল্যাণে পরিচয় বজায় আছে। মুকুলের যেন সব ভুলিয়া যাওয়া উচিত ছিল ; স্টেশনেব যেন এমনভাবে বদলাইয়া যাওয়া উচিত ছিল যে দেখিলে সে না চিনিতে পারে,—মুকুল যে মনে রাখিযাছে, স্টেশনটি যে বদলায় নাই, দুপক্ষেরই সে বিশেষ অনুগ্রহ।

পাঁচ বছর পরে বাড়ি আসার আনন্দ ও উৎসাহ মুকুলের ঝিমাইয়া পড়িল। জড়-জগতের এ কী বিবূপ অভ্যর্থনা!

ছোটো ভাই অতুল দাদাকে লইতে আসিয়াছিল। বিচলিত বিব্রত ও সলজ্জভাবে সে মুকুলকে অভ্যর্থনা কবিল, গাড়িটা আধঘণ্টা লেট করিয়াছে।

অতুল বড়ো হইযাছে। গোঁপের কালো রেখায় তার মুখখানা দেখিতে হইয়াছে বিশ্রী। এখন আর তার পিঠ চাপড়ানো যায় না, তাকে একজন আস্ত পুরা মানুষ বলিয়াও স্বীকার করা চলে না। কতখানি স্নেহ আব কতখানি সম্মান তার প্রাপ্য স্থির করা আজ সমস্যার ব্যাপার।

দাঁড়ান, একটা গাড়ি ঠিক করে ফেলি।

কিছুক্ষণের জন্য সম্মুখ হইতে সে পালাইতে চায়। দাদা আসিবে বলিয়া তাহার আনন্দ কম হয় নাই, কিন্তু সে আনন্দ প্রকাশ করিতে তাহার লজ্জা করে। অথচ প্রকাশ না করাটাও কেমন যেন খারাপ দেখায়। অতুল নিজে মনে মনে অনেকদিন বিদেশে কাটাইয়া বাড়ি আসিবার কল্পনা করিয়া দেখিয়াছে, সকলে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে, চারিদিকে হইহই সমারোহ লাগিয়া যাইবে, এমনি একটা অভ্যর্থনার আশাই মনে সব চেয়ে প্রবল। মুকুলও নিশ্চয় ও রকম কিছু আশা করিতেছিল, আশা পূর্ণ না হইলে ওর মনে ব্যথা লাগিবাব সম্ভাবনা। অথচ একটু সংক্ষিপ্ত সলজ্জ হাসি ছাড়া দাদাকে সে কিছুই দিতে পারিল না। দাদা নিশ্চয এই ভাবিয়া মনে মনে দুঃখ করিতেছে, এমন পর হইয়া গেছে তার ছোটো ভাই, যে তাকে দেখিয়া ওর এতটুকু আহ্লাদও হয় নাই।

মুকুল বলিল, চল, আমিও যাচ্ছি।

অতুল মুখের দিকে তাকায় না, ডান পাশে একটু আগে আগে চলিতে থাকে। মুকুল জিজ্ঞাসা করিল, বাড়িতে কে কে আছে রে অতুল?

সবাই আছে। পরশু ছোটো মাসি ও চারুদিদি এসেছে।

গোপাল এখনও কাজ করে?

গোপাল মরে গেছে।

মরে গেছে! বলিস কী? কবে মরল?

আর বছর মরেছে। বিয়ে করবে বলে দেশে গিয়েছিল, সেখানে কলেরা হয়ে না কী হয়ে মারা গেল।

মুকুল আরও দমিয়া গেল। গোপালের জায়গায় আর একজন চাকর কাজ করিতেছে, ভাবিতে কেমন যেন অশান্তি বোধ হয়। অমন চাকর আর পাওয়া যাইবে না।

বিবাহ করিতে দেশে গিয়াছিল? এই পাঁচ বছরে গোপালের আগের বউও তাহা হইলে মরিয়াছে। লাজুক গেঁয়ো বউ-এর অমন একটি টাইপও আর সহজে চোখে পড়িবে না।

গাড়িতে মাল তোলা হইলে তাহারা উঠিয়া বসিল।

পটলির বিয়েতে কী গোলমাল হয়েছিল রে?

অতুলের সংকোচ অনেক কমিয়াছে।

ছোড়দির বিয়ের কাণ্ড? সে ভয়ানক দাদা—আরেকটু হলে মারামারিই হয়ে যেত।

কেন?

কুমুদবাবুর একজন বন্ধু—বরযাত্রীদের মধ্যে ওই লোকটাই ছিল সবচেয়ে পাজি, বেণুদিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সে ছোড়দিকে দেখতে গিয়েছিল। বেণুদির বাবা তাকে এই মারে তো সেই মারে—রাগের চোটে কাছাই খুলে গেল। অল্প অল্প শব্দ করিয়া অতুল একটু হাসিল।

মুকুল গম্ভীর মুখে বলিল, দেখতে দিলেই হত পটলিকে।

তখনও সাজানো হয়নি যে!

গাড়ি ঘরঘর করিয়া চলিয়াছে, ফুটবল গ্রাউন্ডের পাশ দিয়া বাঁয়ে একটা রাস্তা বাঁকিয়া গোল কুয়ার চকে গিয়াছে, ওই রাস্তার ধারে হাসপাতাল। ডাকবাংলাটি মুকুল লক্ষ করে নাই, ছাড়াইয়া চলিয়া আসিয়াছে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়াইয়া সেটির অবস্থান দেখিয়া নিয়া সে আবার ঠেস দিয়া বসিল।

কুমুদ লোক কেমন রে?

স্বভাব-চরিত্র ভালো—কিন্তু বড়ো রাগ।

মুকুলের বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। আপনা হইতে ছেলেটা কোনো খবরই দিবে না, প্রশ্নের জবাব যেটুকু বলিবে তাহাও সংক্ষিপ্ত দুর্বোধ্য। পাঁচ বছরে সংসারে এমন কিছুই কি ঘটে নাই যা নিয়া অতুল আজ আগের মতো বকবক করিতে পারে?

অতুল যেন বোবা হইয়া গিয়াছে। বাকি পথটা মুকুল নীরব হইয়া রহিল।

বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া সে একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছে। বিদেশে প্রলোভনের অভাব ছিল না, অনাত্মীয় মানুষের মধ্যে বাস করিতে করিতে তাহার মনের জোরও কেমন যেন কমিয়া গিয়াছিল। সে অনেক অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে। সে জন্য তেমন জোরাল অনুতাপ তার কখনও হয় নাই, কিন্তু আজ মা বোন ও স্ত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াইবার আগে একে একে সমস্ত কথা মনে পড়িয়া নিজেকে তাহার অশুচি মনে হইতে লাগিল।

গাড়ি পাড়ায় ঢুকিয়াছে, দ্বিপ্রহর না হইলে অনেক চেনা মুখ চোখে পড়িত। শৈলেনদের বৈঠকখানায় মুকুল অনেক তাস-পাশা পিটিয়াছে, এখন দরজা বন্ধ। মুকুলের বিদেশযাত্রার কয়েক

দিন আগে সরকারদের মেজো-বউ কাপড়ে আগুন দিয়া পুড়িয়া মরিয়াছিল, এখন দরজায় প্রকাণ্ড একটা তালা ঝুলিতেছে। এদিকে বসন্তদের বাড়ি।

বসন্ত বাড়ির রোয়াকে দাঁড়াইয়া বিড়ি টানিতেছিল, কারণ এমনি সময় সেনেদের মেজো-বউ ছাতে কাপড় শুকাইতে দিতে আসিয়া পথের দিকে আলিসায় ভর দিয়া একটু দাঁড়ায়।

বসন্ত হাঁকিল, মুকুল যে!—এই গাড়োয়ান, রোকো রোকো।

বসন্ত গাড়ির কাছে নামিয়া আসিল। সে বসন্ত আর নাই। তার রং গ্রীষ্মকালেব তৃণের মতো হইয়া গিয়াছে। মুকুলের গাড়িব গাড়োয়ানের মতো তাহার ঘাড় ছাঁটা, চোখে মদের রং।

সিলোন থেকে আসছ?

বন্ধুকে তুই সম্বোধন করিবার সাহসও বসন্ত হারাইয়াছে।

মুকুল সায় দিয়া বলিল, হ্যাঁ। কেমন আছ বসন্ত?

চলে যাচ্ছে একরকম! বলিযা বসন্ত একটু নিস্তেজ হাসি হাসিল। মনটা কীরকম করিতে লাগিল মুকুলের। হাসি গল্প আড্ডা দিয়া অর্ধেক জীবন যার সঙ্গে মন খুলিয়া হইহই কবিয়াছে, আজ তার সঙ্গে শুধু ভদ্রতাব সম্পর্ক।

পথের দিকে কেহই তাকাইয়া ছিল না। বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে, ছেলেমেয়েবা ক্ষুধায কাতর। তাহাদের ভাত না দিয়া উপায় ছিল না। সাত-আটটি ছেলেমেযেকে খাওয়ানো শশীমুখীর একাব কাজ নয়, ননদ বাসন্তী তাহার সাহায্য কবিতেছে। ছেলের আসিতে দেরি দেখিয়া মা তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া ফেলিয়া তাড়াতাড়ি সন্ধ্যাটা সারিয়া নিতে বসিয়াছেন,—সময়মতো স্নান না কবিলে তাঁর মাথাব তালু জ্বলে। ছোটো মাসির পায়ের বাতে তেলমালিশ এখনও শেষ হয় নাই। সুতরাং পথে চোখ পাতিয়া বসিয়া থাকিবার অবসর কাহারও ছিল না।

চারুর জ্বর। সে বিছানায় পড়িয়া আছে।

মুকুল উঠানে আসিয়া দাঁড়াইতে একটা হইচই পড়িয়া গেল। মাসি বারান্দায় পা ছড়াইয়া পাযে তেল মালিশ করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, মুকুল এলি? বাসন্তী ভাতের থালা নামাইয়া রাখিয়া বলিল, ওমা দাদা এসে পড়েছে! ছেলেদের মধ্যে বাসন্তীর বড়ো ছেলে সকলের বড়ো, মামাকে তার স্মরণ ছিল, আকস্মিক উত্তেজনায় খেপিয়া গিয়া গলা ফাটাইয়া সে হাঁকিল, দিদিমা, শিগগিব এসো, মামা এসেছে।

শশীমুখী রান্নাঘরে গিয়া লুকাইল।

কিন্তু সমারোহের ইতি ওইখানেই।

ছেলেমেয়েরা খাওয়া ফেলিয়া মুকুলকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল না, এখনও তাহাদের পেট ভরে নাই। মাসি সমানে পাযে তেল মালিশ করিতে লাগিলেন, মা ছুটিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন না, চারু জ্বরের ঘোরে যেমন ছটফট করিতেছিল তেমনি ছটফট করিতে লাগিল, স্টেশনে যাওয়ার পরিশ্রমে কাতর অতুল দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া রহিল।

বাসন্তী এঁটো হাত সাবধানে ধুইয়া ঘর হইতে একটা চেয়ার আনিয়া রাখিল। মুকুলকে প্রণাম করিয়া বলিল, বসো দাদা।

মুকুল বসিলে—

হ্যাঁ দাদা, মেম-টেম বিয়ে করে আসনি তো?

সিলোনে মেম কী রে?

বাসন্তী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, জাহাজে যেতে হয় যে?

পটলি দোতলায় শুইয়া ছিল, অত্যন্ত ধীরপদে সে নীচে নামিয়া আসিল। কাছে আসিয়া অভিমান করিয়া বলিল, দাদা এল, আমায় কেউ ডাকল না।

মাসি ঘ্যানঘ্যান করিয়া বলিলেন, ডাকতে হবে কেন? তুই ঘুমোচ্ছিলি নাকি?

একটুখানি মাথা হেলাইয়া পটলি বলিল, ঘুমোচ্ছিলাম তো। দয়া করে আমায় ডাকলে অপরাধ হত?

মুকুল আবার বিস্মিত হইয়াছে। এ যেন সে পটলি নয়, আর কেউ। ইহার পিঠে তখন সাপের মতো বেণি দুলিত, দুই হাতে বুকের কাছে বই ধরিয়া স্কুলে পড়িতে যাইত। বেতস-লতার মতো ওর চেহারা ছিল রোগা লিকলিকে, হাঁটিবার পরিবর্তে সারা বাড়ি ও ছিটকাইয়া বেড়াইত, কোথায় যে ওর শেমিজের কাঁধ নামিত আর কোথায় যে লুটাইত আঁচল তার ঠিকানা ছিল না। আর আজ ও চুলের পাতা কাটিয়াছে, চলিবার সময় পা ফেলিয়া পা তুলিতে ওর যেন কষ্ট, মুখটা পর্যন্ত ঢাকিতে পারিলে ওর যেন আজ ভালো মতো লজ্জা নিবারণ হয়।

মুখে কথা আছে কিন্তু গলায় ওর শব্দ নাই।

অতুলের মতো এও মুখের দিকে তাকায় না। দাদাকে দেখিয়া আনন্দ ওর কতখানি হইয়াছে ওই জানে কিন্তু দাদা আসিতে কেহ ডাকে নাই বলিয়া অভিমান হইয়াছে প্রচুর। সেই অবশ্য এ অভিমানের উপলক্ষ কিন্তু অভিমানের আধারটিতে তার স্থান যে কতখানি মুকুল তাহা ভাবিয়া পাইল না। সে বাড়িতে পা দেওয়া মাত্র সকলের আগে ওকে ডাকা হইলে ও দাদার সম্মান রাখিত কী দিয়া?—অভিমান করিবার উপায় যখন থাকিত না?

পুতুলখেলা ছাড়িয়া কয়েক বৎসর যাবৎ ও ছেলেখেলা করিতেছে, একদা যে ভাঙা পুতুলের শোকে চোখে জল আসিলে চোখ মুছাইত আর ক্রমাগত পুতুল কিনিয়া দিত, অত কষ্টে জমানো তিন হাজার টাকা দিয়া যে ওর ছেলেখেলার মানুষটি যোগাড় করিয়া দিয়াছে, তার কথা মনে করিবার অবসর হয়তো ও পায় নাই। দাদা যে বিদেশে—সেটুকু ভালো করিয়া টের পাইবার সুযোগ হয়তো ওর ছিল না।

তোর খোকা কইরে পটলি?

ঘুমুচ্ছে।

দুই চোখে আনন্দ ভরিয়া ঔৎসুক্যের সহিত সে আবার বলিল, তুলে আনব?

থাক থাক, জাগলেই দেখবখন।

আচ্ছা।

পটলির আবার অভিমান হইয়াছে। দাদা আসিয়া খোকাকে দেখিবে, কোলে নিবে, আদর করিবে, এ তাহার অনেক দিনের সাধ। এ সাধ মিটিতে দেরি হইবে না, খোকার ঘুম মিনিটে মিনিটে ভাঙে, কিন্তু দাদা যে কতদূর পর হইয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিয়া পটলির সাধের আর তেমন জোর রহিল না। বাড়িতে পা দেওয়া মাত্র সকলের আগে তার খোকাকে দেখিবার আগ্রহ নাই দাদার! এ তো সে দাদা নয়।

এই ধরনের মনোভাব মুখে ছায়াপাত করে। পটলির মুখ দেখিয়া মুকুল রাগ করিয়া ভাবিল, ঘুমন্ত ছেলেটাকে তুলে আনতে বারণ করলাম এতে ওর রাগ করবার কী আছে?

মাসি বারবার উঃ আঃ শব্দ করিয়াও পায়ের দিকে মুকুলের দৃষ্টি টানিতে না পারিয়া মনে মনে চটিতেছিলেন, পটলিকে ধমক দিয়া বলিলেন, তুই যেন কেমনতরো মেয়ে পটলি। এদ্দিন পরে বড়ো ভাইটা এল, একটা পেন্নাম কর?

মুখ রাঙা করিয়া মাসির দিকে ঝুঁকিয়া চাপাগলায় পটলি বলিল, আঃ, তুমি চুপ কর মাসি, আমার আজ প্রণাম করতে নেই।

'অ!' বলিয়া মাসি থ বনিয়া গেলেন। মুকুলও।

এমনভাবেই তাহারা পর হইয়া গিয়াছে পরিবর্তনের মধ্যে। মুকুল বিমর্ষ হইয়া বসিয়া রহিল। বাড়িটাকে আজ ভারী চাপা, ভারী নোংরা মনে হইতেছে। ছোটো উঠানে আলো বাতাস স্বচ্ছন্দে আসিতে পারে না, সমস্ত উঠানে কত কী আবর্জনা। চোকলা-তোলা মেঝেতে শ্বেতপাথরের স্বপ্নও নাই, দেয়ালগুলি বিবর্ণ ও উপরের দিকে ঝুলভরা, ঘরে ঢুকিলে মুকুলের নিশ্চয় নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবে। মাসির বাতের মালিশের দুর্গন্ধটাই যেন এ বাড়ির আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়াছে, তার রুমালের সিংহলি আতরের গন্ধ অতিথির মতো, পরের মতো এখানে বেমানান!

রান্নাঘরের জানালায় কালিবর্ণ শিকের ফাঁকে শশীমুখী উঁকি দিতেছিল, মুকুলের চোখ পড়া মাত্র তাহার ফরসা মুখ ডগডগে লাল হইয়া যাইতেছে! এ আর এক কৌতুক।

পাঁচ বছর আগে শশীমুখীর এই বারবার উঁকি দেওয়া আর মুখ লাল করার মধ্যে ভালোবাসার প্রকাণ্ড একটা প্রমাণ আবিষ্কার করিয়া সে পুলকিত হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু আজ তাহার অভিজ্ঞতায় ইহার ফাঁকি ধরা পড়িয়া গিয়াছে। শশীমুখীর চাওয়া চোখে, লালিমা মুখে, মনে শুধু কৌতূহল আর লজ্জা। স্বামীকেও চোখে সহাইয়া নিতেছে। এতকাল পরে কল্পনার বাহিরের দেশ হইতে লক্ষকোটি বিপদ-আপদের হাত এড়াইয়া যে স্বামী ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে একটিমাত্র ব্যাকুল দৃষ্টিপাতে সুস্থ দেখিয়া অক্ষত দেখিয়া আড়ালে গিয়া শশীমুখী ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলে নাই, ব্যগ্র উৎসুক চোখে কম্পিত সচেতন অঙ্গুলিতে স্বামীকে ভালো করিয়া দেখিবার ও চিনিবার সাধ নিরালার মিলন মুহূর্তটির জন্য তুলিয়া রাখে নাই, পথের বৈচিত্র্য যেমন করিয়া দেখে, তেমনিভাবে স্বামীকে দেখিতেছে, পরপুরুষের দৃষ্টিপাতে যেমন করিয়া মুখ লাল করে তেমনিভাবে স্বামীর চাহনিতে রাঙা হইয়া উঠিতেছে।

শশীমুখীর সম্বন্ধে মুকুল হতাশ হইয়া গেল। বউ ভালো হইলে নিজেকে কি এত সস্তা করিয়া দেয়? ও এমন ধৈর্যহীনা এমন লোভাতুরা যে আগামী মিলনকে অখণ্ড রাখিতে পারিতেছে না, এখন হইতেই ভাঙিয়া ভাঙিয়া চাখিতে শুরু করিয়াছে।

বিদেশে অন্যায় করিয়া আসার জন্যে মুকুলের হঠাৎ আর কোনো ক্ষোভ রহিল না।

ইতিমধ্যে গলায় কাঁটা বিঁধিয়া বাসন্তীর ছেলে কান্না আরম্ভ করিয়াছিল, মাসির ছোটো মেয়েটাবও লঙ্কা চিবাইয়া ঝাল লাগিয়াছে।

বাসন্তী আদর করিয়া শশীমুখীকে ডাকিয়া বলিল, মাছ বেছে বুলুকে একটু খাইয়ে দাও না বউদিভাই!

মুকুল শুনুক, বুঝুক যে শশীমুখীর সঙ্গে সে বরাবর এমনি মধুর ব্যবহার করিয়াছে, কদাচ কলহ করে নাই। যদিই বা কখনও একটু কথা কাটাকাটি হইয়া থাকে শশীমুখী কি আর সে কথা দাদার কানে তুলিবে? একসঙ্গে থাকিতে গেলে সংসারে অমন কত হয়!

মাসি অত কারও খাতির করেন না।

ওকে মাছ বেছে দিলেই হবে বউমা? মেয়েটা এদিকে ঝাল খেয়ে সারা হয়ে গেল যে!

বাসন্তী বলিল, বউদি একহাতে কজনকে খাওয়াবে মাসি?

মাসি বলিলেন, তাই বলে মেয়েটা চেঁচিয়ে মরবে? ঝাল লাগলে জল পাবে না একটু?

বাসন্তী বলিল, ওই তো রয়েছে গেলাসে জল, খেলেই পারত!

শুনলি মুকুল? ওর অতবড়ো ছেলে কাঁটা বেছে মাছ খেতে পারে না, আর ওই একরত্তি মেয়ে গেলাস থেকে আপনি জল খাবে?

মাসির তুলনাটা শোনো দাদা! মাসির মেয়ের চেয়ে খোকা যে দেড় বছরের ছোটো!

সবটাই তার নিজের অপমান। নিজের বোন নিজের মাসি আজ তাহাকে এমন করিয়া মধ্যস্থ মানে। দুজনকে ধমক দিবার ক্ষমতা আজ তাহাব নাই। ইহাদের হীনতাকে আজ তাহাব পাশ কাটাইয়া যাইতে দিতে হইল।

শশীমুখীর পিঠে চাবির যে গোছাটা এক পরল কাপড়ের নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে, অমনি লোহার চাবি দিয়া এতকাল পরে আজিকার বিশেষ দিনটিতে ভাগ্য একে একে তাহার আপনজনের হৃদয়ের সিন্দুক খুলিয়া ভিতরেব জঞ্জাল দেখাইতেছে, মুকুল যত স্নেহ দিয়াছিল তার খানিক হইয়া আছে রূপাব টাকা, খানিক ধুলা আর খানিক আটকানো ভ্যাপসা বাতাস! মুকুলের মনে হইল, দেশে সে সত্যসত্যই বেড়াইতে আসিয়াছে, বেডাইতে আসা ভিন্ন এই তামাদি হইয়া যাওয়া পাওনার সন্ধানে নিজের সেই শান্তিহীন তৃপ্তিহীন সুখের নীড় ছাড়িয়া এতদূর আসার কোনো মানেই হয় না।

খানিক পরে মা আসিলেন।

মন্ত্রগুলো কি বলে উঠতে পারি? যত তাড়াতাড়ি কবতে যাই তত সব জড়িয়ে যায় জিভে। কী রোগাটাই হয়ে গেছিস মুকুল! এমন ছিরি তুই কী করে করলি? প্রণামোদ্যত ছেলেকে মা বুকে জড়াইযা ধবিলেন, কাঁদিয়া বলিলেন, সোনাব ববন কালি হয়ে গেছে!

গায়ে মাথায় পবম ব্যাকুলতার সঙ্গে হাত বুলাইয়া বুলাইয়া মা ছেলেকে চিনিযা নিতে লাগিলেন,—তাহাব বড় ছেলে, তাহার সোনার চাঁদ ছেলে। পাড়ায় এমন ছেলে নাই, শহরে এমন ছেলে নাই, দেশে এমন ছেলে নাই।

মাব ভালোবাসা সহ্য করিবাব বযস ও হৃদয় মুকুলের ছিল না, নিজেকে সে মুক্ত করিয়া নিল, চেয়াবে বসিযা বলিল, তোমাব শরীরও তো ভালো নেই মা?

কণ্ঠস্ববেব পার্থক্য লক্ষ করিবার বিষয়। মার কথায় যেন কাব্যেব আবির্ভাব আছে, বলিবাব ভঙ্গিতেই তাহা মধুর,—মুকুলের শুধু বক্তব্য।

তবু মুকুল খুশি হইল না। নিজেব কাঠিন্যের কষ্টিপাথরে মাব মমতা সোনার দাগ কাটিয়া গেল, কিন্তু সে দাগে আগের মতো ঔজ্জ্বল্য যেন নাই, কেমন মেটে-মেটে হইয়া গিয়াছে। মার চোখে ঠিক উচিত পবিমাণে জল ঝরিল কই? আসিবে না আসিবে না করিয়া যে সন্তান এতকাল পবে আসিয়াছে তাকে বুকে নিয়াও তার আসাতে মার অবিশ্বাস রহিযা গেল কোথায়? তাব বাঁচিযা থাকাটাই মার কাছে আর ভয়ংকব বিস্ময়ের ব্যাপার যেন নয়, তাব সেই একফোঁটা মুকুল কোথায় সেই লঙ্কায় গিয়া পাঁচ পাঁচটা বছব কাটাইয়া আসিল, ইহার অভিনবত্ব মা আর তেমনভাবে আয়ত্ত করিতে পারিতেছেন না।

বহু পুরাতন বিদায়-নেওয়াব দিনটির কথা মনে করিয়া মুকুল আজ অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে মাকে বিচার করিল। হারানোর বেদনার সঙ্গে পাওয়ার আনন্দের তুলনা করিয়া ক্ষুণ্ণ হইবাব ক্ষমতা সে আয়ত্ত করিয়াছে, আজ তাই এতখানি যাচাই করা, এতখানি দর কষাকষি।

বাস্তবিক, জীবন-যুদ্ধে জয় করিয়া আর হার মানিয়া এতখানি ভোঁতা হইয়া গিয়াছে তার অনুভূতি, যে তার স্বার্থপরতার মধ্যে আজ গ্লানির ফ্যাক্টরি বসিয়াছে। সে বুঝিতে পারে না হৃদয়ের পূর্বকৃত প্রাপ্যের সঞ্চয়ের মধ্যেই ভবিষ্যৎ পাওনার মূল্য। ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়া বেচারির দেনা শোধ করা আজ মায়েরও সাধ্যাতীত।

পাঁচ বছরে পাঁচশো দিন তার জন্য মা যে কাঁদিয়াছেন এই সহজ অনুমানও আজ মুকুলের নাই। আজ মার কাছে তার যা পাওনা ছিল পাঁচ বছর ধরিয়া মা তাহা দিয়া আসিতেছেন। আজ যে স্নেহ ফুরাইয়া যায় নাই, অভ্যস্ত দুঃখের অন্তে মার চোখ দিয়া জলও যে পড়িয়াছে সে গৌরব মায়েরই, এবং সেই গৌরবই মার পরিচয়।

মুকুল হিসাব করিতে শিখিয়াছে কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের মতো হিসাব শেখে নাই। অশিক্ষিতা মেয়ের মতো ওর অনেক দোষ।

তবে সম্মান সে পাইল প্রচুর। আজ না চাহিতে শরবত আসিল, দাদাকে শরবত করিয়া দিতে পারিয়াই পটলি কৃতার্থ। বাসন্তী পাখা আনিয়া কখন বাতাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, হাত ব্যথা হইয়া গেলেও সে থামে নাই। শশীমুখী ময়দা মাখিতে বসিযা গিয়াছে, মুকুল গবম লুচি খাইবে।

দুপুরবেলা ভাতের বদলে লুচি! স্নেহের পরিবর্তে যে সমাদর জুটিতেছে ও যেন তারই অতি-বাস্তব রূপক।

স্নান করিতে যাওয়ার আগে প্রত্যেকের জন্য সে যে উপহার আনিয়াছিল একে একে সকলকে মুকুল বাঁটিয়া দিল।

মাসির জন্য কিছু আনা হয নাই।

মুখ কালো করিয়া মাসি হাসিবার চেষ্টার সঙ্গে বলিলেন, আমি কিছু চাইনে বাবা--অত শখ আমার নেই। তুই বেঁচে থাক, তাই আমার ঢের!

আশীর্বাদের ছলে মাসি যেন গাল দিলেন।

মাসি একটু আড়ালে যাইতেই মা মুকুলকে বলিলেন, ওকে একজোড়া কাপড় দিস।

মুকুল বিমর্ষভাবে বলিল, দেব।

বেশি দামি নয়, সর্বদা ব্যবহারের জন্য দু-তিন টাকা জোড়ায় কাপড় দিলেই হবে।

তাই দেব।

খাওয়া-দাওয়ার পর ঘবে শুইতে যাওয়ার আগে মুকুল চারুর ঘরে গেল।

চারু বলিল, মুকুলদাদা এতক্ষণে বুঝি মনে পড়ল?

মুকুল বলিল, আহা তুই এমন হয়ে গেছিস চারু!

বেঁচে তো আছি!

তোর কাপড় ছেঁড়া কেন? এমন নোংরা বিছানায় তুই শুয়ে আছিস কেন?

আস্ত কাপড় কে দেবে বল? বসো না মুকুলদা! না, কাপড় ময়লা হয়ে যাবে?

এক বোন সুখে আরেক বোন দুঃখে পর হইয়া গিয়াছে। রোগে শোকে পরের গলগ্রহ হইয়া জীবনধারণের লজ্জায় সকলের আগে চারু মুকুলের স্নেহকে বিক্রয় করিয়াছিল, অনেক ভণিতা করিয়া পত্র লিখিয়াছিল যে মুকুলদা, বড়ো কষ্টে আছি, আমায় পঁচিশটা করে টাকা দেবে মাসে মাসে?

টাকা অবশ্য মুকুল দিতে পারে না, বিদেশে বিশেষ কারণে তখন তাহার অনেক খরচ। কিন্তু তাই বলিয়া চারু কি তাহাকে এমনভাবে খোঁচা দিতে পারে? চারুর এমন অবস্থা হইয়াছে জানিলে সে কি সামান্য পঁচিশটা টাকা ওকে না দিয়া থাকিতে পারিত? চারুর কত আত্মীয়স্বজন, যার কাছেই থাক সুখে না থাকিলেও দুঃখ পাইবে না এই ছিল তাহার ধারণা। বাস্তবিক, এই ধারণাই তার ছিল।

তাছাড়া চারুর প্রকৃতি বড়ো হীন হইয়া গিয়াছে।

নিজের চোখে আমার অবস্থা দেখলে, এবারও কি আমার একটা ব্যবস্থা করবে না? নিশ্বাস ফেলিয়া,--তোমার ধর্ম তুমি করবে, আমি আর কী বলব বল। কিন্তু আমাকে পেটভরে খেতেও দেয় না মুকুলদা।

শশীমুখীর সঙ্গে মুকুলের দেখা হইল অনেক পরে। আগে সে যে ঘরে থাকিত সেই ঘরেই তার বিছানা হইয়াছিল। বিবাহে যৌতুক পাওয়া খাটে ফুলশয্যার রাত্রে শোয়া ভাঙা স্প্রিং-এর গদিতে মুকুলের স্বোপার্জিত টাকায় কেনা তোশকে ফুলকাটা বোম্বাই চাদর বিছানো শয্যা। বিবাহের পূর্বে শশীমুখীর সঙ্গে মুকুলের পঁচিশ বৎসর দেখা হয় নাই, ফুলশয্যার বিছানায় তাই সত্যিকারের ফুল ছিল, এবারের বিরহ মোটে পাঁচ বছরের, বিছানায় তাই সুতার ফুল।

দরজার বাহিরে ভিজা মুখখানা আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া শশীমুখী ঘরে ঢুকিল। প্রেমে নয়, উত্তেজনায় নয়, ভয়ে তাহার বুক ঢিপঢিপ করিতেছে। স্বামী যখন আজও কাছে থাকিত কালও কাছে থাকিত, তখনও তাহার মন জোগাইয়া চলা সহজ ছিল না, রোজই ভালোবাসার পরিচয় দিতে হইত, ঘুমের জন্য মরিয়া গেলেও বলিতে হইত ঘুম পায় নাই, হাত অবশ হইয়া আসিলেও বলিতে হইত, আর একটু বাতাস করি।

কিন্তু তখন ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল, মুকুল ভালো করিয়া নির্দেশ করিয়া দিয়াছিল কী ভাবে তাহাকে ভালোবাসিতে হইবে, মুকুলের হৃদয়কে নকল করিয়া চলিলেই তখন বেশ দিন কাটিত। আজিকার অসাধারণ অবস্থায় কী করা দরকার কিছুই শশীমুখী ভাবিয়া পাইতেছে না।

মাস্টারের কাছে পড়া দেওয়ার মতো করিয়া সে তাই বলিল, ভালো ছিলে?

মাটির সাকি

দেহে নাই কান্তি মনে নাই শান্তি।

গরিবের এ দুটি অভাব চিরদিনের।

কিন্তু চিরদিনের অভাবও স্বভাবে পরিণত হয় না, একদিন সহিয়া যায় এই মাত্র। এবং তাহাতেও আপশোশ বড়ো কম নহে!

নিজের একটা অপ্রিয় অকথ্য রূপান্তরের আপশোশ।

ওমনিবাস ট্রেন, ছটা সতেরো মিনিটে ছাড়িয়া বজবজ যাইবে। ট্রেনটি এমনি সংক্ষিপ্ত যে মেয়েগাড়ির বাহুল্য নাই। গাড়ি ছাড়িবার কয়েক মিনিট পূর্বে উঠিয়া সুশ্রী মেয়েটি ঠিক সামনে শক্ত হইয়া বসিয়া আছে। মুখের দিকে চাহিবার ইচ্ছাও যেন হয় না। ভয় করে! মনে হয় ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিলে পাতলা ঠোঁটদুটি শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া উঠিবে, মসৃণ গাল ভাঙিয়া ব্রণের দাগে ভরিয়া যাইবে, ভাসা-ভাসা চোখদুটি বুভুক্ষায় মুমূর্ষু পশুর চোখের মতো পীড়িত ও সকাতর হইয়া উঠিবে, কপালে দেখা দিবে তেলমাখা চটচটে ঘাম! রূপ দেখিলে দুচোখ কুরূপের স্বপ্নে বিভোর হইয়া যায়! কী আতঙ্কেই মিনিটগুলি ভরিয়া উঠিল।

মাত্র দশ মিনিটের পথ, গাড়ি স্টেশনে দাঁড়াইল। লাইনের একদিকে শহরতলি বালিগঞ্জ, অপরদিকে গ্রাম কসবা। আভিজাত্যের ছাপমারা পিচ-বাঁধানো পথটি রেলের গেট পার হইয়াই গোবর আর কাদায় ভরিয়া উঠিয়াছে। দুপাশের দোকানগুলোর গ্রাম্যমূর্তির গায়ে শহুরে ভাবের তালি লাগানো— খালি-গায়ে বুট-পরা মানুষের মতো। কিন্তু এগুলোর দিকে চাহিয়া নিত্যই শঙ্করের মনে হয় যে এ রকম একটা দোকান দিতে পারিলেও বুঝি মন্দ হইত না।

ঘোষালপাড়া ছাড়াইলেই শঙ্করের বাড়ি। বাড়িটি পাকাও বটে দোতলাও বটে কিন্তু যেমন পুরাতন তেমনি ক্ষুদ্র। পথ হইতে দোতলার খোলা ছাদে উঠিবার খোলা সিঁড়ি খানিকটা চোখে পড়ে : মনে হয় চুনবালির বাঁধনহীন কতকগুলো আলগা ইটে পা দিয়া এ বাড়ির লোকের ঊর্ধ্বগতির প্রয়াস। স্থানটি কিন্তু বেশ ফাঁকা আর পরিষ্কার। বাড়ির সামনে একটা পুকুর— ছোটো কিন্তু জল পচা নয়। দক্ষিণে হাত-পঞ্চাশেক মাঠের ব্যবধানে রায়বাহাদুর মহাদেব বোসের বাড়ি। রায়বাহাদুরের অনেক টাকা ছিল বলিয়া এখানে সস্তা জমি কিনিয়া বাড়ি করিয়াছিলেন। রায়বাহাদুর এখন বাঁচিয়া নাই, ছেলে সুকান্ত বাপের টাকা ও বাড়ির মালিক। বড়ো বড়ো ঘর তুলিয়া, দামি আসবাবে সাজাইয়া, ছবির ফ্রেমের মতো চারিদিকে বাগান করিয়া এবং অন্যান্য বহুবিধ সংস্কারের দ্বারা সে বাড়িটিকে বাসোপযোগী করিয়া নিয়াছে। বাগানের একটা যুবতি পুষ্পবতী বকুলিকার ছায়ায় বসিয়া নিত্য অপরাহ্নে সে পত্নী হিমানীর সঙ্গে চা পান করে।

আপিস-ফেরতা পুকুরপাড় ঘুরিয়া নিজের বাড়ির দরজায় যাইবার সময়টুকু শঙ্কর ইহাদের দেখিতে থাকে। মৃদু হাসি ও কথার মাঝে মাঝে চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার বিরাম, হ্রস্বপদ লোমশ কুকুরটিকে কাছে টানিয়া মাথা চাপড়ানো, আশেপাশে দুই চারিটা বকুলফুলের এলোমেলো বর্ষণ, শঙ্করের চোখে ইহা আর পুরানো হইল না। রোজই তার মনে হয় কলেজ-জীবনে পড়া কবিতাগুলির এক একটি বাছিয়া নিয়া উহারা যেন অভিনয় করে।

চেনা আছে, পরিচয় নাই। ও পক্ষে আগ্রহের অভাব এ পক্ষে সংকোচের বাধা। কল্পনাতীত উপভোগ্য জীবনটা উহারা কীভাবে ভোগ করে জানিবার সকরুণ কৌতূহল নিয়া ভাঙা ঘরে শঙ্কর দিন কাটায়।

পয়সার টানাটানি, ছেলেমেয়ের কান্না, আর বিধুর ধুঁকিতে-ধুঁকিতে রান্না-করা, বাসন-মাজার ফাঁকে ফাঁকে অদৃষ্টের নিন্দাবাদ, নটা-এগারোর গাড়িতে আপিসে গিয়া ছটা-সতেরোর গাড়িতে বাড়ি ফেরা। এই তো জীবন!

জীবনের এত অধিক বৈচিত্র্য সহ্য হইয়া গিয়াছে বলিয়া আপশোশ করিয়া মরে।

আজ বকুলতলা খালি দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। সচরাচর ইহা ঘটে না। শেষবেলায় বকুলতলায় আসিয়া বসার নেশা যে কত তীব্র দূর হইতেও সে যে তাহা জানে।

বাড়ি ঢুকিয়াই কারণটা বোঝা গেল। ছেলেমেয়ে তিনজন কাঁদো-কাঁদো মুখে একপাশে দাঁড়াইয়া আছে, বিধু চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে চৌকির মলিন বিছানায় এবং শিয়রের কাছে টুলে বসিয়া হিমানী তার মাথায় ডবল আইসব্যাগ চাপিয়া ধরিয়া আছে।

অবস্থাটা বুঝিতে একটু সময় লইয়া শঙ্কর প্রশ্ন করিল, কী হয়েছে?

হিমানী বলিল, ঘরে। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, এখনও জ্ঞান হয়নি। ছেলেদের চেঁচামেচি শুনে এসে দেখি মেঝেতে পড়ে আছেন।

ঘামে জামাটা ভিজিয়া গিয়াছিল কিন্তু হিমানীর সামনে খোলা চলে না—তলায় গেঞ্জি নাই। স্বামীর খালি গাও হিমানী কোনোদিন দেখে নাই বলিয়াই শঙ্করের বিশ্বাস। বোতামগুলি আলগা করিয়া দিয়া সে বলিল, আমার আপিস এত দূরে যে চেঁচিয়ে ওরা মরে গেলেও শুনতে পাই না।

এই বাহুল্য কথাটা বলিবার উদ্দেশ্য বাহুল্য নয়, হিমানী চুপ করিয়া রহিল।

ছোটো মেয়েটি বাবাকে দেখিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছিল, চোখের শাসনে তার কান্না থামাইয়া শঙ্কর বলিল, আজ এসে দেখছি অজ্ঞান, আর একদিন এসে হয়তো দেখব মরে গেছে!

শঙ্করের আশঙ্কা হালকা করিয়া দিবার কোনো চেষ্টা না করিয়া হিমানী বলিল, এ সময় কোনো আত্মীয়াকে এনে কাছে রাখা উচিত।

শঙ্করের সুর তৎক্ষণাৎ বদলাইয়া গেল।

এখনি? এই তো মোটে সাতমাস। এখন ভয় কীসের?

হিমানীর মুখের উপর দিয়া একটা কালো মেঘ ভাসিয়া গেল, কথা কহিল ক্লিষ্ট স্বরে, এ যে কী ভয়ানক সময় আপনি বুঝবেন না। যত সাবধান হওয়া যাক ভয় কমে না। সর্বদা একজন মেয়েমানুষ কাছে না থাকলে যে কী সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে—

অন্ধকারে সাপের ঠান্ডা স্পর্শ পাওয়ার মতো শিহরিয়া সে চুপ করিল। দেখা গেল তাহার মুখ ভারী বিবর্ণ হইয়াছে। তিনটি সন্তানের জননীর সম্বন্ধে অপুত্রবতীর আশঙ্কার পরিমাণটা শঙ্করের কাছে পরমাশ্চর্যের মতো লাগিল। এ ভাবে হিসাব করিলে সকল অবস্থায় নরনারী-নির্বিশেষে কতরকম সর্বনাশই তো হইতে পারে, মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া আধঘণ্টার ভিতর তার পঞ্চত্বলাভও সৃষ্টিছাড়া কিছু নয়, সে জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকার কোনো অর্থই যে হয় না! কিন্তু ইহার আতঙ্ক অত্যন্তই সুস্পষ্ট, ঠান্ডায় ফ্যাকাশে আঙুলগুলি পর্যন্ত থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। মনে হয় বুকের ভিতর ধুকধুকানিরও সীমা নাই। শঙ্কর বলিল, আপনার শরীর আজ ভালো নেই মনে হচ্ছে।

জ্বরে অচৈতন্য স্ত্রীকে অতিক্রম করিয়া সদাপরিচিতার শরীর একটু ভালো না থাকার জন্য দুর্ভাবনা ভালো শোনাইল না। মুখ তুলিয়া ম্লান হাসিয়া হিমানী বলিল, রোজ যেমন থাকি আজও তেমনি আছি।

আমার কথা বাদ দিন। শরীর ভালো থেকেই বা কী হবে! ডাক্তার চ্যাটার্জি এসেছিলেন, রক্ত নিয়ে গেছেন। ওষুধও লিখে দিয়েছেন, জ্ঞান হলে একদাগ খাওয়াতে হবে।

আমার জন্য কিছুই করার রাখেননি দেখছি। ডাক্তারের ভিজিট?

লাগেনি। উনি আমাদের বন্ধু।

তবে পীড়াপীড়ি করব না। কিন্তু আপনার চা খাওয়ার সময় পার হয়ে গেছে, আপনি এবার ছুটি নিন।

হিমানী ব্যাকুল হইয়া বলিল, না, না, আমায় ওঁর কাছে থাকতে দিন। চা এখানেই দিয়ে যাবে।

লণ্ঠনটা নতুন, ধোঁয়া হয় না, কিন্তু কমানো রহিয়াছে বলিয়া আলো অনুজ্জ্বল। এই আলোতেই হিমানীর মুখখানা যেন স্পষ্টতর দেখাইতেছে। সেদিকে চাহিয়া থাকিয়া শঙ্করের মনে হইল আপিস যাইবার সময় সে কি কল্পনাও করিতে পারিয়াছিল যে ফিরিয়া আসিয়া গৃহে এমন দুর্ভাবনা ও এত বড়ো বিস্ময় সঞ্চিত থাকিতে দেখিবে। হিমানীর আজকার ব্যবহার অদ্ভুত। চার বছরের প্রতিবেশী ইহারা কিন্তু গরিব প্রতিবেশীকে কবে কতটুকু আমল দিয়াছিল? সংবৎসরে হিমানী ও বিধুর মধ্যে একটি বাক্যবিনিময়ও হইয়াছে কিনা সন্দেহ। আর আজ নিজে হইতে আসিয়া এমন সেবাই আরম্ভ করিয়া দিয়াছে যে প্রয়োজন শেষ হইলেও উঠিয়া যাইতে চায় না। টাইমপিসটায় দশটা বাজে। বেলা একটা হইতে একভাবে বিধুর শিয়রে বসিয়া আছে তিন-চার বার নিজে ডাকিতে আসিয়া একরকম ধমক খাইয়াই সুকান্ত ফিরিয়া গিয়াছে. কেরানির কুশ্রী বধূর সেবার জন্য ধনীর তরুণী প্রিয়ার এ কী লোলুপতা! মহত্ত্ব সন্দেহ নাই, উদারতারই পরিচয়, কিন্তু কী অস্বাভাবিক!

আধঘণ্টা পরে সুকান্ত আবার আসিল। কোনো কথা না বলিয়া গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অসীম কুণ্ঠার সঙ্গে শঙ্কর মিনতি করিয়া হিমানীকে বলিল, আর তো দরকার নেই, এবার আপনি যান। কতক্ষণ এ ভাবে ঠায় বসে থাকবেন?

অপ্রত্যাশিতভাবে এবার কিন্তু প্রতিবাদ আসিল সুকান্তর নিকট হইতে—থাক শঙ্করবাবু, কিছু বলবেন না, একেই সেবা করতে দিন।

অবাক হইয়া শঙ্কর বলিল, কিন্তু—

সুকান্ত মাথা নাড়িল—কিন্তু নয়। বাড়ি গিয়ে ছটফট করার চেয়ে এখানে শান্তিতে থাকা ভালো। আমার যদি একটু বসবার ব্যবস্থা করে দেন ওর সেবা করাটা দেখতে পাবি।

মেঝেতে মাদুর বিছাইয়া দিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই শঙ্কর দেখিল হিমানী কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া আছে। সুকান্ত একপ্রকার দুর্বোধ্য হাসি দিয়া সে দৃষ্টিকে নন্দিত করিল, তারপর ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলাইয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল।

খাদ্য আসিয়াছিল সুকান্তর বাড়ি হইতে। ছেলেমেয়েরা খাইয়া ঘরের এককোণে ক্ষুদ্র বিছানায় জড়সড় হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শঙ্কর বিছানার পাশে মাটিতে বসিল। বুকের ভিতর চাপবাঁধা দুর্ভাবনা তবু হঠাৎ তাহার যেন হাসি পাইল। ঘরে আজ দুইজোড়া স্বামী-স্ত্রী জড়ো হইয়াছে কিন্তু জোড়ায় জোড়ায় কী অসীম পার্থক্য! শয্যায় পড়িয়া আছে চামড়া-ঢাকা একটা কঙ্কাল, বাসর-রাত্রিতেও যার ওষ্ঠে মধুর বদলে জুটিয়াছিল দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে পচা খাদ্যকণার দুর্গন্ধ, আজ সাত বছরের বেশি যে তাহার মনকে উপবাসী রাখিয়া দুবেলা যোগাইয়াছে শুধু রাঁধা ভাত। তিনটি পেটমোটা শিশুর শিয়রে বসিয়া আছে একটা কলেপেষা জীবন্ত ইক্ষুদণ্ড, জীবনটা যার স্রষ্টা কবির সৃষ্টির খাতায় ভুলিয়া যাওয়া সাদা পৃষ্ঠা। আর রুগ্‌ণার শিয়রে যে স্ত্রীটি বসিয়া আছে, যে স্বামীটি

বসিয়া আছে তাহারই ছেঁড়া মাদুরে—রূপযৌবন অর্থ-সম্মান হাসি-উৎসবের কী সমারোহ উহাদের জীবনে!

রাত্রি এগারোটার সময়েও বিধুর জ্ঞান হইল না। কিছুক্ষণ হইতে হিমানী উশখুশ করিতেছিল, হঠাৎ ব্যাকুল হইয়া সুকান্তকে বলিল, ডাক্তারবাবুকে আর একবার নিয়ে এসো।

সুকান্ত নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

হিমানী বলিল, দুজন এনো, কনসাল্ট করবেন।

সুকান্তর মুখে বিস্ময়ের চিহ্নও নাই, শুধু অভিজ্ঞতা। সামান্য একটু মাথা নাড়িয়া এমনভাবে স্বীকৃতি জানাইল যেন দুজন ডাক্তার আনিবার কথা সেও ভাবিতেছিল।

প্রতিবাদের ইচ্ছা শঙ্করের মনে জাগিয়াছিল, কিন্তু কীসের প্রতিবাদ করিবে? ইহাদের ভাব দেখিয়া এ কথা তো কল্পনাও করা যায় না যে কলিকাতার সমস্ত ডাক্তার আনিয়া বিধুর চিকিৎসা করার চেয়ে বড়ো কর্তব্য ইহাদের আর কিছু আছে!

টর্চ জ্বালিয়া সুকান্ত চলিয়া গেল। পাড়াটা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে—সেও যেন আজ অসুস্থ এবং ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোর উপর তাহার শুশ্রূষার ভার। জানালার বাহিরেই চাঁদ ওঠার ইঙ্গিত, রোয়াকে বিধুর হাতে মাজা পিতলের ঘটিটা চকচক করিতেছে। বিধুর পায়ের আঙুলে রেড়ির তেলে ভেজা ন্যাকড়া জড়ানো, হঠাৎ শঙ্কর তাহা লক্ষ করিল। আজ দুর্ভাবনা—অতন্দ্র নিশায় আলো নিভাইলে ওই পায়ে যদি জ্যোৎস্না আসিয়া পড়ে?

হিমানীর পা দুটি চৌকির তলার আবছা অন্ধকারে। জরি-বসানো চটির দু-একটা জরি শুধু চিকচিক করিতেছে। পা দুটি যেন অন্ধকারে মোড়া সোনা, কয়েকটি সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া পরিচয় মিলিতেছে। ওই পায়ের গোড়ালি কি ফাটা? আঙুলের চিপায় কি জলে ক্ষয় পাওয়া সাদা ঘা?

শঙ্করের মনে হইল হিমানীর পা দুটি চৌকির তলা হইতে টানিয়া আনিয়া এই একান্ত অসম্ভব সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া না নিলে চিরদিন তাহার মন কেমন করিবে।

চোখদুটা জ্বালা করিতেছে দেখিয়া শঙ্করের কৌতুক বোধ হইল। থাকিবার মধ্যে চোখে আছে একটু ক্ষীণদৃষ্টি—সে চোখ আবার জ্বালা করে!

আপনি খাবেন না? খেয়ে নিন। ভেবে আর কী করবেন!

শঙ্কর চাহিয়া দেখিল হিমানী মুখের দিকে চাহিয়া আছে। স্ত্রীর অসুখের কথা ভাবিতেছিল না বলিয়া তাহার একবিন্দু লজ্জা হইল না। বলিল, আজ খাব না।

আপনি না খেলে এঁর কোনো উপকার হবে না।

আমার অপকার হবে। অম্বলে বুক জ্বলে যাচ্ছে।

সকলেরই দেখছি সমান অবস্থা। আমারও অম্বল হলে বুক জ্বলে যায়।

বসিয়া থাকিতে থাকিতে শঙ্কর কুঁজা হইয়া গিয়াছিল, অকস্মাৎ সোজা হইয়া বসিল।

আপনার অম্বল!

হিমানী ম্লান হাসিল, আর কলিক। যেদিন ধরে মনে হয় ব্যথায় বুঝি দম আটকাবে। মাগো, সে যে আমার কী কষ্ট!

শঙ্কর আবার কুঁজা হইয়া গেল—বিশেষভাবে হতাশ হইলেই তার মেরুদণ্ডটা ধনুকের মতো বাঁকিয়া যায়।

হিমানী একটু ভাবিয়া বলিল, কিন্তু ও জন্য আমার নালিশ নেই।

কলিকের ব্যথা থাকার জন্য আবার নালিশ কী থাকিতে পারে শঙ্কর বুঝিতে পারিল না। বলিল, কেন।

হিমানী নতমুখে অস্বাভাবিক গলায় বলিল, শুনলে আপনি লজ্জা পাবেন, ও যে আমার প্রাপ্য। প্রত্যেকটি মেয়ের জন্য ভগবান নির্দিষ্ট ব্যথা মেপে রাখেন, মাথা পেতে নিজের ভাগ নিতেই হবে। ব্যথার এক রূপ এড়িয়ে গেলে অন্যরূপে দেখা দেবেই।

কী অদ্ভুত মন্তব্য! সংকোচে নয় মন্তব্যের ভারে শঙ্কর মাথা হেঁট করিল। কথাগুলি যেন এক বোঝা অভিযোগ—একটি সুদীর্ঘ জীবনের ব্যর্থতার মতো অসম্ভব ভারী।

কিন্তু শয্যাশায়িনী ওই সংক্ষিপ্তা মানবীটির অভিযোগও তো নিখিল মানবতার ইতিকথায় প্রক্ষিপ্ত নয়! ওর বুকের দৃশ্যমান পাঁজরা, ওর কালিপড়া চোখের অত্যধিক স্নেহের কালো ছানি, ওর জীবনযাত্রার অধিকারীর অন্তহীন বঞ্চনার তবে মানে কী? ভগবানের মাপিয়া রাখা ব্যথার ভাগের সঙ্গে মানুষের গুঁজিয়া দেওয়া ব্যথায় ওর শিরায় রক্তের রংও বুঝি ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে।

হিমানীর কথাটা সে বুঝিল, না বোঝার মতো করিয়া। ও নিত্য অপরাহ্ণে বকুলতলায় স্বামীর সঙ্গে চা পান করিতে পায়। ভোরবেলা মোটরে চাপিয়া লোকালয় ছাড়িয়া গিয়া খোলা মাঠের মাঝখানে নির্জন পথপ্রান্তে ক্ষণকাল বিশ্রাম করে। লক্ষ্য ছাপানো মনের সঙ্গে নিত্য ওর ঘনিষ্ঠতা জন্মে,—আঙুলের সোনার কাঠি দিয়া সেতারের ঘুমন্ত রাগরাগিণীর ও ঘুম ভাঙায়। গন্ধতেলে খোঁপা বাঁধে, সাবান মাখিয়া স্নান করে। ঘরে পরিয়া বেনারসি ছিঁড়িয়া ফেলে।

বিধুর কী আছে?

সহানুভূতির অভাব ছিল না কিন্তু হিসাবে হিমানীর হার হইল।

সুকান্ত ডাক্তার নিয়া ফিরিবার পূর্বে বিধুর জ্ঞান হইল। রক্তবর্ণ চোখ মেলিয়াই সকলকে চমকাইয়া দিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। হিমানীর হাত হইতে দুইটা আইসব্যাগই খসিয়া পড়িল। ছোটো খোকা ঘুম ভাঙিয়া করুণ সুরে কাঁদিতে লাগিল। শঙ্কর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিধুর আর্তনাদের শব্দার্থ এই :

মাগো এ ডাইনি কে! খোকা! ওরে খোকা!

বার কয়েক গলা চিরিয়া খোকাকে ডাকিয়া সে দিব্য সুর করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল, খোকারে.

হিমানী আইসব্যাগ দুটি তুলিয়া আবার মাথায় চাপিয়া ধরিল। খানিক পরে শ্রান্ত হইয়া বিধু বোধ হয় ঘুমাইয়াই পড়িল।

হিমানী জিজ্ঞাসা করিল, খোকা কোনটি?

নেই।

নেই!

নাঃ। ওর মনে থাকতে পারে, পৃথিবীতে নেই। জ্যোৎস্না রাতে খোকা একদিন ছাত থেকে পাকা উঠানে পড়ে গিয়েছিল।

হিমানী চমকিয়া বলিল, সত্যি?

হ্যাঁ। জ্যোৎস্না উঠলেই খোকাকে নিয়ে ও ছাতে উঠত কেন কে জানে! রান্নার ফাঁকে ফাঁকে কতবার যে ছুটে যেত ঠিকানা নেই, জিজ্ঞাসা করলে বলত, জ্যোৎস্না দেখতে ভালো লাগে।

ও কথা সত্যি নয়।—হিমানীর কণ্ঠে কাতরতা।

তা ঠিক। জ্যোৎস্না দেখে ওর ভালো লাগা অসম্ভব। কিন্তু কেন যে উঠত ভেবে পাই না।

মুখ আড়ালে রাখিয়া হিমানী নীরব হইয়া রহিল। তেল কমিয়া গিয়াছিল, বার কয়েক দপদপ করিয়া আলোটা নিভিতে আরম্ভ করিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শঙ্কর যখন তেলের বোতলটা নিয়া

আসিল আলো প্রায় নাই। দেখা গেল জ্যোৎস্না আসিয়া সত্যই বিধুর পায়ের কাছে বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়াছে। বিধু কিন্তু পা গুটাইয়া নিয়াছিল।

তেল ভরিবার চেষ্টায় আলোটা একেবারে নিভিয়া গেল। প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে হিমানী বলিল, কতদিন আগে শঙ্করবাবু?

কীসের?

কতদিন আগে খোকা ছাত থেকে—?

আলো জ্বালিবার চেষ্টা করিতে করিতে শঙ্কর বলিল, পাঁচ ছমাস হল বইকী।—চৈত্রের প্রথমে।

কান্না শুনিনি তো।

শঙ্কর মাথা নাড়িল, ও এখানে কাঁদেনি। খোকার সঙ্গে হাসপাতালে গিয়েছিল, সেখান থেকেই ওকে ওর মার কাছে রেখে এসেছিলাম।—লণ্ঠনটা কেরাসিন কাঠের ভাঙা টেবিলে বসাইয়া গম্ভীর গলায় বলিল, কী জানেন, মড়াকান্না আমার একেবারে সহ্য হয় না। মাথা ঘোরে।

যেন সে ছাড়া জগতের আর সব মানুষের মড়াকান্না সহ্য হয়, যে কাঁদে তারও! মানুষ যে কাঁচা মাটির পাত্র, একবার ভাঙিলে, চোখের জলে গুলিয়া আবার গড়া যায় এ কথা সে যেন জানে না।

হিমানী কাঁদো-কাঁদো হইয়া বলিল, মড়াকান্না সত্যি বড়ো বিশ্রী। কিন্তু কাঁদতে না পারলে আরও বিশ্রী হয়। আমার ছোটোভাইটি যখন মরে যায় আমি কাঁদতে পারিনি।

শঙ্কর বলিল, কেন?

কী জানি। নিজের হাতে মানুষ করেছিলাম বলে বোধ হয়। ছমাসের ভাইকে সাতবছরের করেছিলাম, সে মরলে কি কেউ কাঁদতে পারে?

শঙ্কর নীরবে মাথা নাড়িয়া জানাইল—পারে না।

হিমানী যেন তাহাতে খুশি হইল না,—ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, অন্তত পারা উচিত নয়। ও-রকম ভাই-এর সঙ্গে পেটের ছেলের কী তফাত আছে! মরলে অজ্ঞান হতে হয়, কাঁদতে নেই।

বলিয়া সে নিজের মনে বার কয়েক শিরশ্চালনা করিল। আবোলতাবোল মন্তব্যগুলির মধ্যে ইহা কোনটির প্রতি সংশয়ের প্রতীক বুঝিতে না পারিয়া শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

ডাক্তার চ্যাটার্জি এবং কলিকাতার আর একজন নামকরা ডাক্তারকে নিয়া সুকান্ত ফিরিল। চ্যাটার্জি রক্ত পরীক্ষা করিয়াছিলেন, বললেন, রক্তে মেলিগ্‌ন্যান্ট ম্যালেরিয়ার জীবাণুর অন্ত নাই। অনাজন বিনা বাক্যব্যয়ে ইনজেকশনের পিচকারিতে কুইনাইন ভরিলেন।

শঙ্কর বলিল, হাড়ে লেগে ছুঁচটা যেন না ভাঙে ডাক্তারবাবু।

এই মন্তব্যে ঘরের আবহাওয়াটা অকস্মাৎ বীভৎস রকমের করুণ হইয়া উঠিল।

ডাক্তার বিদায় নেওয়ার খানিক পরে হিমানী শান্তভাবেই স্বামীর সঙ্গে চলিয়া গেল।

ফিরিয়া আসিতে যতটা সময় লাগিল তাহাতে বোঝা গেল বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল।

একটা কথা বলতে এলাম, বলিয়া ভূমিকা করিল।

কী কথা বলুন।

পাঁচ ছমাস আগে জ্যোৎস্না উঠলে আমরাও ছাদে উঠতাম। খোকার মৃত্যুর জন্য আমাদের কী পাপ হয়নি?

শঙ্কর আশ্চর্য হইয়া বলিল, আপনাদের কেন পাপ হবে?

ছাদে উঠে বিধু আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকত, কী দেখত জানিনে। আমাদের জন্যেই কি ছাদে উঠত?

শঙ্কর বলিল, হবে হয়তো। কিন্তু সে দোষ আপনাদের নয়।

হিমানীর চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, বলিল, আমারই দোষ, আমি সত্যি ডাইনি। না জন্মাতেই আমার সব খোকাকে আমি মেরেছি, কারও খোকা মরলে আমি ছাড়া আর কার পাপ হবে? জানেন জ্যোৎস্নায় নামতে আজ আমার গা ছমছম করছে। আপনার সেই খোকা যদি আঁচল ধরে টানে?

টানিলে শঙ্কর কী করিবে? পিতা বলিয়া এখন কী আর সে তার কথা শুনিতে চাহিবে।

হিমানী বলিল, আমার সঙ্গে একটু আসবেন?

সুকান্ত নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মৃদুস্বরে বলিল, ভয় কী, এসো।

সকালে সুকান্ত খবর নিতে আসিল বিধু কেমন আছে। চেহারা দেখিয়া সে যে সমস্তরাত্রি ঘুমায় নাই বুঝিতে কষ্ট হয় না। শঙ্কর টুলটা আগাইয়া দিয়া বলিল, বসুন।

দাঁড়ান, খবরটা দিয়ে আসি আগে, বলিয়া সুকান্ত চলিয়া গেল। পাঁচমিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বিনা আহ্বানেই টুলটাতে বসিয়া পড়িল।

সকাল বেলার আলোতে রাত্রির আলোর ইঙ্গিতটুকুও নাই, এবং তাহা নিঃসন্দেহে পরম আশ্চর্যের ব্যাপার। তথাপি বিধুর পায়ের আঙুলে জড়ানো রেড়ির তেলের ন্যাকড়াটা শঙ্কর কখন যেন খুলিয়া নিয়াছে।

সুকান্ত বলিল, বুঝলেন শঙ্করবাবু, জীবনে একফোঁটা সুখ নেই।

এ কথা সকলেই জানে, শঙ্কর কিছু বলিল না।

আপনার এখান থেকে গিয়ে কী চেঁচামেচি আর কান্না যে আরম্ভ করে দিলে যদি দেখতেন। কোনো অভাব নেই তবু কেন যে ওর মাথা এমনভাবে খারাপ হয়ে গেল!

অভাবের প্রাচুর্যে আধমরা স্ত্রীর দিকে চাহিয়া শঙ্কর এবারও কিছু বলিতে পারিল না।

মহাসংগম

পশুপতি থুড়থুড়ে বুড়া হইয়া পড়িয়াছে।

এই মাঘে তার বয়স সাতাশি পূর্ণ হইল। দুটো একটা যুগ নয়, পশুপতি প্রাণপণ চেষ্টায় সাত যুগের বেশি পৃথিবীতে টিকিয়া আছে।

বিপুল সুদীর্ঘ জীবন।

কিন্তু তার সামনে যে মৃত্যু, সে আরও বিপুল, আরও সুদীর্ঘ! মৃত্যুকে কে ঠেকাইয়া রাখিবে? সাতাশি বছরের আয়ু নয়, সে বরং মৃত্যুকেই কাছে ডাকিতেছে বেশি। পৃথিবীতে যে যতদিন বেশি বাঁচিবে সে তত গিয়া পড়িবে মরণের কাছাকাছি। একদিন দেখা যাইবে তার দেহে তার মনে, তার ক্ষীণ স্পন্দিত প্রাণের জগতে মরণকে যেন অনায়াসে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। জীবনেই যেন হইয়াছে জীবনের মরণের মহাসংগম।

পশুপতি বিকল হইয়া পড়িয়াছে, অথর্ব হইয়া পড়িয়াছে। গায়ের চামড়া তার বিবর্ণ, লোল, সহস্র কুঞ্চনে কুঞ্চিত। মাথায় কুড়ি বছরের পুরানো চকচকে টাকটি পর্যন্ত তার ঢিলা নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। কানে সে ভালো শুনিতে পায় না। একটি অলৌকিক মর্মরিত জগতে সে বাস করে। বিরাট বায়ুস্তর হইতে কোটি মিশ্রিত শব্দ অহরহ তার দুই কানে আঘাত করে, কাছে কলরব করে মানুষ পশু আর পাখি, সব মিলিয়া তার শুধু একটি অবিচ্ছিন্ন চাপা গুঞ্জনধ্বনির অনুভূতি হয়। বাড়ির লোকে তার সঙ্গে কথা বলে চেঁচাইয়া।

বাড়ির লোকে তাই তাহার সঙ্গে কথা কয় কম। কত চেঁচাইবে।

চোখে এখনও সে অল্প অল্প দেখিতে পায়, কিন্তু চোখের পাতা দুটি সিসার মতো ভারী হইয়া সর্বদাই তার চোখ দুটিকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়, টানিয়া খুলিয়া রাখিতে তাহার কষ্ট হয়, পরিশ্রমও যেন হয়। ভ্রু পাকিয়া প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। মুখে আর একটাও দাঁত নাই। চোয়ালের দুপাশ দিয়া গালের গোড়া হইতে দুটি নিস্তেজ নীল শিরা তার শীর্ণ গলাটি বাহিয়া নীচে নামিয়া গিয়াছে। মেরুদণ্ডটি তাহার ধনুকের মতো বাঁকা। উঠিয়া দাঁড়াইলে মাথাটি সে কোনোমতে নিজের কোমরের লেভেল ছাড়াইয়া উপরে তুলিতে পারে না। দুই হাতে মোটা একটা লাঠিতে ভর দিয়া তাহাকে দাঁড়াইতে হয়। লাঠি না থাকিলে সে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া যাইবে। দেহের ভরকেন্দ্র তাহার পায়ের আয়ত্তাধীন সীমানা ছাড়াইয়া অনেকখানি সামনে আগাইয়া গিয়াছে।

উবু হইয়া বসিলে তাহার দুই হাঁটু মাথার কাছে ঠেলিয়া ওঠে।

পশুপতি থাকে চাঁদপুতিয়ার শ্রীমন্ত সরকারের বাড়ি।

শ্রীমন্ত তার কেহ নয়। দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়াছে। পশুপতির একটি ছেলে ছিল। হয়তো এখনও আছে। কেহ তার খবর রাখে না। অনেককাল আগে সে পলাইয়া গিয়াছিল সেই বর্মা মুলুকে। মাঝখানে একবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল সেইখানেই বিবাহাদি করিয়া সে সুখে বসবাস করিতেছে। তারপর তার আর কোনো খবর পাওয়া যায় নাই।

শ্রীমন্ত মোক্তার। মফস্বলে মোক্তারি করিয়াও অনেকে পাকা দালান তোলে কিন্তু শ্রীমন্ত এখনও সেটা পারিয়া ওঠে নাই। বাড়িটা তার বড়ো, কিন্তু কাঁচা। সদরের ঘরটা শ্রীমন্তের মোক্তারি ব্যবসার

জন্য লাগে। অন্দরের ঘরগুলি তার দখল করিয়া থাকে নিকটতম আত্মীয়স্বজন। বাড়ির একেবারে পিছন দিকে রান্নাঘরের পাশে নিচু ভিটাতে একখানা ছোটো ঘর আছে। মাঝখানে বেড়া দিয়া ঘরখানাকে দুভাগে ভাগ করিয়া ফেলা হইয়াছে, তাহারই একটা ভাগে কতকগুলি চাষের যন্ত্রপাতির সঙ্গে বাস করে পশুপতি।

পাশের ভাগটাতে থাকে কুন্দ, তার দুটি ছেলেকে লইয়া। ধরিলে কুন্দ, হয়তো শ্রীমন্তের কেহ হয়, না ধরিলে সে পরের চেয়েও পর। কিন্তু শ্রীমন্ত বোধ হয় সম্পর্কটা ধরিয়াই এই খোপটাব ঘুঁটেগুলি অন্যত্র সরাইয়া তাহাকে থাকিতে দিয়াছে। কারণ পশুপতি তার পিতৃবন্ধু, মাননীয় ব্যক্তি। পশুপতির পাশের খোপে যাহাকে তাহাকে শ্রীমন্ত থাকিতে দিতে পারে না।

রাতটা পশুপতি তার ঘরে ছোটো একটি চৌকিতে শুইয়া কাটায়। দিনের বেলা ঘরের সামনে সংকীর্ণ দাওয়াটির একপ্রান্তে দুপরল চটের উপর পুরু করিয়া বিছানো একটা কাঁথায় বসিয়া থাকে। পাশে একটা ওয়াড়বিহীন তেলচিটা বালিশ দেওয়া আছে। বসিয়া বসিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলে কাত হইয়া বালিশে মাথা রাখিয়া সে শয়ন করে।

গ্রীষ্মকালে এখানে থাকে ছায়া। ঘরের ডাইনে সূর্য উঠিয়া বাঁদিকে অস্ত যায়। শীতকালে ঘবেব আড়াল হইতে সূর্য সামনে সরিয়া আসে। বড়ো ঘবেব চাল ডিঙাইয়া, রান্নাঘরের পাশে ঝাঁকালো আমগাছটার মাথার উপর দিয়া সমস্ত শীতকালটা পশুপতির বসিবার স্থানটিতে রোদ আসিয়া পড়ে।

মোটা একটা লেপ গায়ে দিয়াও সমস্ত রাত পশুপতি শীতে হিহি করিয়া কাঁপে, দেহে তাব উত্তাপ এত কম যে শীতে হাড়ের ভিতরে পর্যন্ত যেন একটা জ্বালা কাঁপুনি ধরাইয়া দেয়। সকালে তার ঘরের সম্মুখ দিয়া যে যায় তাহাকেই সে জিজ্ঞাসা করে, রোদ উঠল গা? হ্যাঁগো, দাওয়াতে রোদ এল, আঁ?

কাঁপানো জড়ানো গলায় সে সকলের কাছে রোদের, উত্তাপের, জীবনের আবির্ভাবের সুসংবাদটি শুনিতে চায়। কেহ সংক্ষেপে জবাব দিয়া বলে, এই উঠল ; কেহ নিজের বিপুলতর প্রয়োজনে কিছু না বলিয়াই চলিয়া যায়, কেহ নির্বিকার চিত্তে শোনায় হতাশার বাণী : রোদ কি এত সকালে ওঠে? ঢের দেরি এখনও দাওয়ায় রোদ আসতে।

কুন্দ কোন সকালে উনান ধরাইয়া ডাল চাপাইয়াছে। সে এক সময় আসিযা বলে, কী হাড় কাঁপানো জাড় গো বাবা এ বছর! ছেলে-পুলে মোলো। একটু আগুন দেব গো দাদামশায়?

আগে রাত্রে শুইতে যাওয়ার সময় উনান হইতে এক মালসা আগুন কুন্দ পশুপতির কাছে রাখিয়া যাইত। কিন্তু একবার মালসার আগুন তার বিছানায় লাগিয়া যাইবার উপক্রম হওয়াব পর হইতে এ ব্যবস্থা রহিত হইয়া গিয়াছে. আগুন পোহাইতে গিয়া বুড়ো কি শেষে পুড়িয়া মরিবে! সকালে চারিদিকে অনেক লোক, সে ভয় নাই।

পশুপতি সাগ্রহে বলে, দে দিদি, একটুকু আগুন দে তো।

কুন্দ মালসায় একটু আগুন করিয়া পশুপতির কাছে রাখিয়া যায়।

রোদ উঠিলে কুন্দ অথবা তার বড়ো ছেলে কেশব পশুপতিকে ধরিয়া দাওয়ায় লইয়া যায়। কুন্দর দুবছরের ছোটো ছেলেটির মতো সেও যেন অবোধ অসহায় শিশু। বার্ধক্যের গোড়াতেই পিছু চলিতে আরম্ভ করিয়া এখন সে যেন আবার তার সেই আদিম অথর্ব শৈশবে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

পশুপতি দাওয়ায় বসিয়া থাকে নির্বাক নিস্পন্দ জড়পিণ্ডের মতো। তার ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, হৃদয়ে অনুভূতি নাই, মস্তিষ্কে চিন্তা নাই। ঠান্ডায় সে ভিতরে বাহিরে জমিয়া গিয়াছে। চোখ বুজিয়া সূর্যদেবতার অন্ত্যজ ভক্তের মতো সে শুধু সবিনয়ে ব্যাকুল আগ্রহে সূর্যকিরণকে সর্বাঙ্গ দিয়া শুষিয়া লইতে থাকে।

সে বাঁচিতেছে। রাত্রে সে একেবারে মরিয়া গিয়াছিল, এখন আবার বাঁচিতেছে।

দেহে খানিকটা উত্তাপ সঞ্চিত হইলে সে ঘোলাটে চোখ মেলিয়া তাকায়।

প্রভাতে আপন আপন ক্ষুধা তৃষ্ণা হিংসা ও ভালোবাসা লইয়া শ্রীমন্তের বৃহৎ পরিবারটি জাগিয়া উঠিয়াছে। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত খেলা ও কর্তব্য পালন চলিবে। পৃথিবীর মাটিতে গাছের ডালে, আকাশে সর্বত্র বিচিত্র চঞ্চল প্রাণ। কিন্তু পশুপতির স্থান এই সজাগ উদ্‌বিগ্ন ব্যস্ততার বাহিরে, দাওয়ার এই কাঁথাটির উপর। তার স্তিমিত নিষ্প্রভ জগতে আবছা মানুষগুলি চলাফেরা করে, কেহ কাছে আসিলে মনে হয় কুয়াশার ভিতর হইতে উঠিয়া আসিল। মাঝে মাঝে কারও চিৎকার করিয়া বলা কথার দু-এক টুকরা কথা তার কাছে ভাসিয়া আসে,—বহুদূর হইতে ভাসিয়া আসে। পৃথিবীব মানুষের জীবনে, পৃথিবীর আলো শব্দ ও গন্ধে পশুপতিব দাবি নিঃশেষ হইযা আসিয়াছে।

না থাক। পশুপতির বিশেষ কোনো ক্ষোভ নাই। সংসারে নিজেকে প্রয়োজনীয করিয়া বাখিবার উৎসাহও তার শেষ হইয়া আসিয়াছে। কতকগুলি অভ্যাস, কতকগুলি নিয়ম এখনও তাহাকে পালন কবিয়া চলিতে হয়, সে তাহা অনেকটা যন্ত্রের মতোই করিয়া যায়—প্রায় বিগড়াইযা-আসা যন্ত্রের মতো। জীবনের অসংখ্য বন্ধন একে একে শিথিল হইয়া আসিয়াছে, জীবনের প্রতি মমতাও বুঝি তার গিয়াছে কমিযা, মানুষেব প্রতিও। আপনার বয়সের দুর্বিষহ ভারটা বহিয়া বহিয়া সে বুঝি ভয়ানক স্বার্থপর হইযা পড়িয়াছে। মানুষেব, তাহাকে যে আশ্রয দিয়াছে সেই উপকারক মানুষটি ও তাব পরিবারের, দৈনন্দিন সুখদুঃখেব প্রতি তার আসিয়াছে উদাসীনতা।

তবু, ওব মধ্যেই শরীব একটু ভালো থাকিলে সে একটু কৌতূহল বোধ কবে, মনে মনে কী যেন সে ভাবে। ইশারায় শ্রীমন্তকে ডাকিযা সে বলে, খেঁদির জন্য পাত্র দেখা হচ্ছে? হোক, ভালো করে খোঁজখবব কব বাবা, মেয়ে বড়ো লক্ষ্মী।

গভীর দায়িত্ববোধের উপযোগী মুখভঙ্গি করিয়া পশুপতি জবাবেব প্রতীক্ষা করে।

শ্রীমন্তের বয়স পঞ্চাশ পার হইয়াছে। মাথার চুল তাবও প্রায় অর্ধেক সাদা হইয়া আসিল। সে অবাক হইয়া বলে, খেঁদির পাত্র? সাতবছরে পড়ল না মেয়ে, এখনি পাত্র কীসের?

কথাটা সে দুবাব বলিলে পশুপতি শুনিতে পায়। তার মাথার মধ্যে কেমন একটা গোল বাধিয়া যায়। সায় দিয়া বলে, তা বটে খেঁদি এখনও ছোটো বটে খুব।

নিঝুম হইয়া একটু ভাবিয়া সে আবার বলে, খেঁদি নয় গো, বলছি মুখীর কথা। বলছি মুখীর কথা, তুমি শুনছ খেঁদি। মুখীর কী হল—পাত্তরের?

যেমন-তেমন একটা জবাব দিয়া শ্রীমন্ত তাহাকে বুঝায়। পশুপতির চোখ মিটমিট করে। ক্ষণে ক্ষণে মাথা নাড়িযা সে শ্রীমন্তের অর্ধেক-শোনা অর্ধেক না-শোনা কথায় সায় দিয়া যায়।

মুখীর বিবাহের জন্য তাহার চিন্তা ও উদ্‌বেগের যেন সীমা নাই।

কিন্তু পশুপতির হৃদয়-যন্ত্রটি একেবারে বিকল ও অসাড় হইয়া যায নাই। কুন্দর জন্য তার বুকে মমতা আছে।

হয়তো এই মমতার মর্মকথাটি এই যে কুন্দর সেবা তার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেটা দোষের কথা নয়। মানুষের ধর্মই এই, সাতাশি বছর বয়সেও মানুষকে এই ধর্মই পালন করিতে হয়। সেবা হোক, মমতা হোক, তোযামোদ হোক, অর্থ হোক, দুপক্ষের প্রয়োজন আছে বলিয়াই সংসারে এ সবের আদান-প্রদান চলে।

শোয়ার আগে কুন্দ যখন পশুপতির খবর লইতে আসে, রাত্রি তখন অনেক। চারিদিক নিস্তব্ধ। পশুপতি এক একদিন ফিসফিস করিয়া বলে, দরজা বন্ধ কর দিদি।

কুন্দ দরজা বন্ধ করিলে পশুপতি আরও বেশি ফিসফিস করিয়া বলে, দেখ তো আছে কী নেই? কুন্দ হাতের ডিবরি নামাইয়া চৌকির তলে উঁকি দেয়। টিনের ছোটো তোরঙ্গ চৌকির কোণের পায়ার সঙ্গে দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া এখনও বাঁধা আছে, কেহ লইয়া যায় নাই।

পশুপতি শঙ্কিত হৃদয়ে অপেক্ষা করে। কুন্দ সিধা হইয়া তার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলে, আছে দাদামশাই, যাবে কোথা? পশুপতি নিশ্চিত হইয়া বলে, তোকে দিয়ে যাব দিদি, তোর কেউ নেই তোকেই দিয়ে যাব।

এটা স্তোকবাক্য নয়, টিনের তোরঙ্গটি পশুপতি সত্যসত্যই তাহাকে দিয়া যাইবার কামনা পোষণ করে। কুন্দও যে লোভ না করে এমন নয়। কিন্তু বাক্সে কী আছে পশুপতি স্পষ্ট করিয়া কিছু বলে না। তার ভাসাভাসা জবাবে এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে বাক্সে গহনা আছে, টাকা আছে, অনেক লোভনীয় দামি জিনিস আছে. কুন্দ এতটা বিশ্বাস করে না। কিছু টাকা আছে. দু-একশো। বাক্সোটা কুন্দ একদিন সন্তর্পণে নাড়িয়াও দেখিয়াছে। ভিতরে ঝমঝম শব্দ হয়।

কুন্দর ছোটো ছেলেটিকে পশুপতি ভালোবাসে।

সকালে দাওয়ায় দুটি মুড়ি ছড়াইয়া কুন্দ ছেলেটাকে তার কাছে বসাইয়া দিয়া যায়। খোকার দিকে তাকাইয়া ফোকলা মুখে পশুপতি একটু হাসে। দুটি শুষ্ক শীর্ণ হাত তার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলে, আ আ—মণি আ—সোনা আ—

বেশ একটু সুর করিয়াই যেন বলে। দু-আঙুলে একটি মুড়ি খুঁটিয়া মুখে তুলিতে গিয়া তার কচি দাঁত কটি চিকমিক করিয়া খোকাও হাসে।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। খোকাকে কোলে করিয়া আদর করিবার সামর্থ্য পশুপতিব নাই। হাত বাডাইয়া ওকে সে ছুঁইতে পারে, ডাকিয়া ডাকিয়া কাছে আনিতে পারে, ওর গায়ে মাথায বুলাইতে পারে হাত। আর কিছু পারে না।

খোকা টলিতে টলিতে হাঁটিতে পারে। একদিন সে পশুপতির গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পডিয়াছিল। খোকা জানিত মার মতো পশুপতিও এতে খুশি হইবে এবং যে ভাবেই সে ঝাঁপ দিবে দুহাতে তাহাকে সে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলিবে। কিন্তু খোকাকে সামলানো দূরে থাক, পশুপতি নিজেই হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গিয়াছিল।

দুজনেই সেদিন কাঁদিয়াছিল—জীবনের দুই প্রান্তের দুটি শিশু। খোকার কান্না বাড়িব লোকে শুনিয়াছিল আর পশুপতির কান্না দেখিয়াছিল। দন্তহীন মুখখানি হাঁ করিয়া অবলা প্রাণীর মতো সে কাঁদিয়াছিল। সামান্য বাথাও সে আজকাল সহিতে পারে না। দেহের কোথাও তুচ্ছ এতটি আঘাত লাগিলে বহুক্ষণ অবধি তার সর্বাঙ্গ বেদনায় কন্‌কন্‌ করিতে থাকে।

অথচ আঘাত মাঝে মাঝে লাগেই।

কুন্দর অনেক কাজ। সব সময় তাহাকে হাতের কাছে পাওয়া যায় না। লাঠিতে ভর দিয়া পশুপতিকে উঠিতে হয়। তিনটি পায়ের সাহায্যে কষ্টে সে নিচু দাওয়া হইতে নীচে নামে, আরও কষ্টে দাওয়ায় ওঠে। চৌকাট ডিঙাইয়া ঘরে যায় এবং বাহিঁরে আসে। পড়িয়া যাওয়ার মতো ভয়ানক ব্যাপার কদাচিৎ ঘটে, কিন্তু প্রায়ই পায়ে হোঁচট লাগে, লাঠিটা মাথায় ঠুকিয়া যায়, চৌকির কোণে হাঁটুর কাছে ঠোক্কর লাগে। কোনো রকম শ্বাস রোধ করিয়া ঘরের শয্যায় অথবা দাওয়ার আশ্রয়ে পৌঁছিয়া পশুপতি অনুশ্বাসীয় হাহা শব্দে কাতরতা প্রকাশ করে, তার স্তিমিত চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়ে।

একদিন কুন্দর বড়ো ছেলে কেশব তাহাকে প্রাণান্তকর আঘাত দিয়াছিল। খোকার মতো সেও এক রকম পশুপতির গায়ের উপরে আছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তবে ইচ্ছা করিয়া নয়।

কেশব ষোলো-সতেরো বয়সের দুরন্ত শয়তান ছেলে। স্কুলে যায় না, লেখাপড়া করে না, একটু একটু শ্রীমন্তের মুহুরিব কাজ শেখে, ফাই-ফরমাশ খাটে, খায় আর ঘুরিয়া বেড়ায়। মাঝে মাঝে কুন্দ ও পশুপতির কাছে পয়সা আদায় করে।

যত সে শয়তান ছেলে হোক, প্রাণ যে তার প্রচুর তাহাতে সন্দেহ নাই। সে গাছে ওঠে, কাঠ চেলায়, মারামারি করে, আর প্রবল নিষ্ঠুর অত্যাচারীর মতো সর্বদা তার চেয়ে অসহায় মানুষ ও পশুকে নির্যাতন করার সুযোগ খোঁজে।

তাহার এই অধীব চঞ্চল প্রাণাবেগের কাছেই পশুপতি বোধ হয় আত্মবিক্রয় করিয়াছে. ছেলেটাকে সে ভালোবাসে, ভয় করে, পূজা করে এবং ঘৃণা করে। সামনে সজনে গাছের ডালে কবে এক অজানা পাখি বাসা করিয়া ছিল, ডিম ফুটিয়া বড়ো হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে. তবু গাছে উঠিয়া কেশবের তাহা নিজের চোখে দেখা চাই। সজনে গাছের ডাল ভারী বিশ্বাসঘাতক। কত মোটা ডাল কত সহজে ভাঙিয়া যায়—ভিতরে শাঁস নাই। কেশব টিপ করিয়া পড়িয়াছিল পশুপতির সামনে। সে আতঙ্ক উত্তেজনা পশুপতি বাকি জীবনে ভুলিবে না। আর গাছ হইতে পড়িয়া কেশবকে সঙ্গে সঙ্গে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পালাইয়া যাইতে দেখিবাব বিস্ময়। কেশব ঘরে ঢোকে উঠান হইতে একলাফে দাওয়া ডিঙাইয়া এবং এক এক সময় অকারণে ঘর হইতে বাহির হইয়া দাওয়ায় একটা বাঁশের খুঁটি ধরিয়া বোঁ করিয়া এক পাক ঘুরিয়া যায়। এবং তারপব আরও অকারণে ওই উঠানের প্রান্তে শ্রীমন্তের উদাসীন ছেলেমেয়ে বউদের দিকে আড়চোখে চাহিতে থাকে।

কিন্তু তাহার বাহাদুরিটা সম্যক বুঝিতে পারে শুধু পশুপতি। হৃদয়ের যতটুকু উষ্ণতা তার আজও জীবনেব কামনা করে তাই দিয়া কেশবকে সে বোধ হয় হিংসা করে, তাই ভালোও বাসে। শিহরন আজ পশুপতিব দুর্লভ নয় কিন্তু ছেলেটার কাণ্ডে তার যে শিহরন জাগে তাহা অভিনব, তাহা মৌলিক। তার ভীরু দুর্বল বুক আতঙ্কে ঢিপঢিপ করে, ব্যাকুল হইয়া কেশবকে মুখে এ সব কাণ্ড করিতে বারণ করে, কিন্তু দুচোখ প্রাণপণে কুঁচকাইযা এই চিত্তাকর্ষক অভিনয় দেখিতেও ছাড়ে না।

শেষে বলে, শোন কাছে আয় দিনি! আয় না দাদা, আয়। ওরে আয় না!

কেশবকে কাছে আনিয়া সে করিবে কী? কিছু না। শুধু বসাইয়া রাখিবে। নিজে তো দিবারাত্রি বসিয়াই আছে, এই উত্তাল প্রাণশক্তিকেও সে একটু কাছে বসাইয়া রাখিবে। হয়তো প্রাণপণে দেখিবে ও দুই হাতে স্পর্শ কবিবে। কিন্তু সেটা বাহুল্য। জীবনের এই অসংযমকে নিজের কাছে সংযত করিয়া রাখাই তাহার আসল কামনা।

একদিন এমনি দুবন্তপনার মধ্যে অত বড়ো ছেলে পশুপতির গায়ের উপর পড়িয়া গেল। তেমনভাবে পড়িলে পশুপতি বাঁচিত কিনা সন্দেহ, মাটিতে প্রথমে একটা হাত ফেলিয়া কেশব নিজেকে খানিকটা সামলাইয়া লইয়াছিল। তবু তার হাঁটুর আঘাতে পশুপতির বাঁকা কোমর যেন ভাঙিয়া গেল। দুদিন তার উঠিবার সামর্থ্য রহিল না।

কেশব প্রায়ই নানা কারণে শাস্তি পায়। সেদিন তার শাস্তিটা হইল ভীষণ। শ্রীমন্তের হাতের শেষ থাপড়টাতে সে ঘুবিয়া পড়িয়া গেল।

এবং শুধু কেশবের উপর দিয়া নয়, কুন্দকেও অনেক কথার মার সহ্য করিতে হইল। ছেলেকে যদি সে শাসন না করে এ বাড়িতে তবে তার স্থান হইবে না, এমন আশঙ্কাজনক কথাটাও যেন শোনা গেল।

কোমরের ব্যথায় সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া আসিলেও ওর মধ্যেই পশুপতির কী রকম একটা ব্যথিত আনন্দ হইয়াছিল। বাড়িতে যে হইচই বাধিয়াছিল, দু-তিনজনে তাহাকে যে পাখা করিয়াছিল, কেশব যে চেঁচাইয়া কাঁদিয়াছিল, এ সব দিয়া যেন এই সত্যটাই যাচাই হইয়া গিয়াছে যে জগতে আজও তার

মূল্য আছে। তাহাকে দুবার আহা শুনাইয়া কেশবকে একটু বকিয়া এ ব্যাপার তো সকলে শেষ করিয়া দিতে পারিত! তাব বদলে একেবারে সমারোহ বাধিয়া গিয়াছিল!

কয়েক বছর ধরিয়া পশুপতির মনে একটা কষ্ট ছিল। তার মনে হইত, এতকাল বাঁচিয়া আছে বলিয়া সকলে বুঝি বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছে, মরণকে এ ভাবে ঠেকাইয়া রাখিয়া মানুষের কাছে সে বুঝি অপরাধ করিতেছে। কবে সে মরিবে তারই প্রতীক্ষায় কারও আর ধৈর্য নাই। ব্যাপারটা চুকিয়া গেলে সকলে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। ছেলে বর্মা পালানোর আগে বৃদ্ধবয়সে যে পরিমাণ আরাম ও সুখ পশুপতি কল্পনা করিত তার কিছুই সে পায় নাই। চারিদিক হইতে আসিয়াছে শুধু অবহেলা, অনাদর। সকলে তাহাকে যেন ছাঁটিয়া ফেলিতে চায়। দিনের পর দিন যত সে অসহায় হইয়া পড়িয়াছে, মানুষকে তার প্রয়োজন হইয়াছে যত বেশি, মানুষ তার তত দূরে সরিয়া গিয়াছে। মানুষের সুখ-দুঃখে পশপুতি আর ভাগ বসাইবার কামনা রাখে না, জীবনের সমারোহে তার বরং বিতৃষ্ণাই আসিয়াছে। কিন্তু মরিতে মরিতেও বাঁচিযা আছে বলিয়া সকলে রাগ করিবে, তার অপরিহার্য সেবা ও যত্ন সে পাইবে না, জীবনের শেষ দিনগুলো কষ্ট ও অসুবিধায় ভবিয়া থাকিবে, এটা সহ্য করা একটু কঠিন। দুমাসের জন্য কেহ বিদেশ যাওয়ার আয়োজন করিলে মানুষের কাছে হঠাৎ তাহাব দাম বাড়িয়া যায়। সে চিরকালের জন্য বিদেশের চেয়েও সুদূর বিদেশে চলিয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, অথচ মানুষের কাছে তার দাম গেল কমিয়া।

কোমরে ঘা খাইয়া সকলকে ব্যস্ত করিতে পারিয়া পশুপতির এই দুঃখটা কমিয়া আসিয়াছে। সে বুঝিতে পারিয়াছে, মৃত্যুর সঙ্গে তার নিবিড় ঘনিষ্ঠতাকে মানুষ অবহেলা করে নাই, মর্যাদা দিয়াছে। জগতে সে নিরাশ্রয়, তার ছেলে থাকিয়াও নাই। তাহার দেহ পঙ্গু, মন কুয়াশায আধ অন্ধকার। তবু পথে পথে তাহাকে যে আজ ভিক্ষা করিতে হয় না, একটি ঘেরা আশ্রয় ও দুটি অন্ন যে তাহার জুটিতেছে, সে শুধু তার বয়সের জন্য, মরিতে তার বেশি দিন বাকি নাই বলিযা। বেশি কিছু হয়তো মানুষ দেয় নাই, কিন্তু যতদিন সে না মরে ততদিন তার বাঁচিযা থাকার অধিকারকে স্বীকার করিয়াছে সকলেই।

এবং জীবনেব সঙ্গে তাহার সম্পর্ক প্রায় চুকিয়া আসিয়াছে বলিয়াই পরেব বাড়ি থাকিয়া পরান্ন ভোজনে তাহার লজ্জাও নাই।

সেদিনের ব্যাপার পশুপতিকে এই সান্ত্বনা দিয়াছে কিন্তু তার পর হইতে কুন্দ ও কেশব একটু বদলাইয়া গিয়াছে। কুন্দ করিয়াছে রাগ আর কেশব পাইয়াছে ভয়।

কুন্দ মুখে কিছু বলে নাই, রাগ দেখাইয়াছে কাজে। তার কাছে যে পরিমাণ সেবা পশুপতি না চাহিয়াই পাইত এখন আর সে রকম পায় না। পশুপতির টিনের তোরঙ্গটি চৌকির পায়ার সঙ্গে আজও বাঁধা আছে। তাছাড়া বুড়া অসহায় মানুষকে একেবারে ত্যাগ করিবার ইচ্ছা কুন্দর ছিল না। সে সাহসও ছিল না। সাহস না থাকার কাবণ এই। পশুপতিকে শ্রীমন্ত ও তার পরিবার যতই ভুলিয়া যাক কুন্দ যে তার সেবা করে এটা তাহারা জানিত এবং এই ব্যবস্থাই সকলে মানিয়া লইয়াছিল। রান্না করার মতো এও কুন্দর একটা কর্তব্য।

তবে ইচ্ছা করিলে আইন বাঁচাইয়া রাজার আইনও ভাঙা যায়। কুন্দও তেমনিভাবে নিজেকে বাঁচাইয়া পশুপতিকে মাবিতেছিল। শেষেব দিকে শীত আরও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ভোরে মৃতপ্রায় বৃদ্ধটিকে এক মালসা আগুন দেওয়ার সময় কুন্দ করিয়া উঠিতে পারে না। কোনোদিন রোদ উঠিয়া পড়িলেও পশুপতিকে সেখানে পৌঁছাইয়া দিতে না আসে কুন্দ না আসে কেশব, সারারাত শীতে জমিয়া গিয়া নিজে নিজে বাহিরে যাওয়ার শক্তিও পশুপতি তখন খুঁজিয়া পায় না। কোনোদিন দেখা যায় তার ছেঁড়া চট ও ছেঁড়া কাঁথা রাত্রে কেহ তুলিয়া রাখে নাই, বাড়ির লোম-ওঠা বুড়া কুকুরটা

তার উপরে কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া আছে। পশুপতির ভিজানো সাগু মাঝে মাঝে শক্ত থাকিয়া যায়, তার মাছের ঝোলে মশলা বেশি হয়, তার বলক-তোলা বরাদ্দ দুধটুকু অর্ধেকের বেশি সে পায় না। রাত্রে সরাসরি কুন্দ নিজের ঘরে গিয়া দরজা দেয়।

পশুপতি মাঝের বেড়া ভেদ করিয়া ডাকে, ও কুন্দ? ও দিদি, শুলি নাকি? শোন দিদি একবার।

কুন্দ ছেলেকে শিখাইয়া দেয়। কেশব হাঁকিয়া বলে, মা ঘুমিয়ে পড়েছে।

পশুপতি খানিক চুপ করিয়া থাকে। তারপর আবার বলে, এই তো শুলো, একবারটি ডাক না কেশব? ডাক দাদা ডাক তোর মাকে।

কুন্দ আবার ছেলেকে শিখাইয়া দেয়। কেশব বলে, মার জ্বর গো দাদামশায়, ডাকতে মানা করে শুয়েছে।

পশুপতি তারপর চুপ করিয়া যায়। বড়ো শীতল পৃথিবী, বড়ো প্রাণহীন। হয়তো আজ রাত্রে সেও একেবারে শীতল হইয়া যাইবে। এমন তো কত লোকে যায়, বিছানায় শুইয়া শীতার্ত আধ-ঘুম-আধ জাগরণের মধ্যে। পঞ্চাশ বছর বয়সের সময় পশুপতির ছেলে বর্মা পালাইয়াছে, সাতান্ন বছর বয়সের সময় মরিয়াছে তার বউ। আজ ত্রিশবছর ধরিয়া এমনি নিঃসঙ্গ অন্ধকারে পশুপতি আরও নিঃসঙ্গ আরও গাঢ় অন্ধকারের প্রতীক্ষা করিয়াছে।

ও ঘরে ছোটো ছেলেটা কাঁদিয়া উঠিলে কোনো জাগ্রতা মাতার আদরে হঠাৎ তার কান্না থামিয়া যায় পশুপতির বুঝিতে বাকি থাকে না। কিন্তু কুন্দকে আর সে ডাকে না। বরফের মতো শীতল নির্বোধ পা দুটি হইতে দেহের দিকে জমজমাট মৃত্যুর ক্রমিক অগ্রগমনে বাধা পড়ায় কষ্টে লেপ কাঁথা সরাইয়া লাঠি খুঁজিয়া সে চৌকির নীচে নামে। উবু হইয়া বসিয়া লাঠিটা পাঠাইয়া দেয় চৌকির তলে সেইখানে, যেখানে তার টিনের তোরঙ্গটি আছে। লাঠি দিয়া নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া তোরঙ্গটির অস্তিত্বে সে নিঃসন্দেহ হয়। তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় আবার চৌকিতে ওঠে।

তখন ঈশ্বরকে পশুপতির মনে পড়ে। পৃথিবীর আর কারও ঈশ্বরের সঙ্গে পশুপতির ঈশ্বরের মিল নাই। অনাদি অনন্ত কোনো কিছুকে মনে আনিবার চেষ্টা করিলে মাথা বোধ হয় তার ফাটিয়া যাইবে, সাধারণ মানুষ সীমাহীনকে যে অনুভূতি দিয়া যতটুকু উপলব্ধি করে ততটুকু জোরালো অনুভূতিও পশুপতির নাই। তার ভাবিবার শক্তি ক্ষীণ, অনুভূতি দুর্বল। তার ঈশ্বর একটা নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে খানিকটা আলো মাত্র।

যে আলোকে একদিন সে দুচোখ দিয়া পৃথিবীতেই ঢের বেশি উজ্জ্বল, ঢের বেশি ব্যাপকভাবে দেখিতে পাইত। পশুপতির ঈশ্বর আলোর একটু স্মৃতি মাত্র।

কিন্তু তাহা দিয়াই সে তার চিরন্তন ভবিষ্যতের স্বর্গ নির্মাণ করিতে পারে। স্বর্গের কামনাও তার এতখানি নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে।

এ শীতটাও কোনোরকমে কাটিয়া যায়। বসন্তের আবির্ভাবে পশুপতির দেহে মনে জীবনের ক্ষীণতম জোয়ারটিও আসে না বটে, কিন্তু তার অবশিষ্ট ক্ষীণ জীবনটুকুর অপচয় বন্ধ হইয়া যায়। কুন্দর অবহেলা সহিতে না পারিয়া তাহাকে শীতের শেষে পশুপতি কয়েকটা টাকা দিয়াছে। কেশবও গোপনে একটা টাকা আদায় করিয়া লইতে ছাড়ে নাই। কুন্দর রাগ অবশ্য এমনি কমিয়া আসিতেছিল, টাকাটা হাতে পাওয়ায় তাড়াতাড়ি কমিয়া গিয়াছে। পশুপতি ডাকিলে এখন সে মাঝে মাঝে সাড়া দেয়। পশুপতির সাগু নরম হয়, মাছের ঝোলে মশলা কম থাকে, দুধ কমে না। কেশব দাওয়ার খুঁটি ধরিয়া পাক খায়, তাহার কাছে বসে, দুটো একটা কাজও করিয়া দেয়।

শ্রীমন্তের মেয়ে মুখীর বিবাহ হয় ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি। বিবাহের দিন বিকাল বেলা কেশবকে দিয়া টিনের তোরঙ্গটির দড়ির বাঁধন খোলাইয়া সেটি পশুপতি চৌকির তলা হইতে বাহিরে আনায়।

কেশবকে ঘরের বাহির করিযা দিয়া দরজা বন্ধ করে। বেড়ার ফাঁকে চোখ রাখিয়া কেশব কিন্তু ভিতরের ব্যাপার সব দেখিতে পায়। একটা রিপু করা ফরসা শার্ট ও একটি কুচানো পাতলা কাপড় বাহির করিয়া পশুপতি তোরঙ্গ বন্ধ করে এবং দরজা খোলে।

কেশবকে ডাকিয়া বলে, যেমন ছিল তেমনি আবার পায়ার সাথে বাঁধ দিনি দাদা, বুঝি কেমন বাহাদুর।

তোরঙ্গটি বাঁধিয়া চৌকির তলা হইতে বাহির হইয়া কেশব জিজ্ঞাসা করে, জামা-কাপড় কী হবে দাদামশায়?

পশুপতি ফোকলা হাসি হাসে।

দেখিস কী হবে দেখিস।

সন্ধ্যার সময় জামা-কাপড় পরিয়া সে বাবু সাজে। আটবছরের পুরানো চটি জোড়াটি কিন্তু তার চেয়েও নানাদিকে এত বেশি বাঁকিয়া দুমড়াইয়া গিয়াছে যে কোনোমতেই পায়ে দেওয়া যায় না। না যাক। এই বয়সে অত বেশি বাবু পশুপতির না সাজিলেও চলিবে।

ঘরের বাহিরে গিয়া কেশবকে দিয়া দরজায় সে পিতলেব তালাটি লাগায় এবং কেশবকে নির্ভব করিয়া হাজির হয একেবারে বিবাহের আসরে। সকলের মাঝখানে বসিবার ইচ্ছা থাকিলেও সে সাহস পায় না। একদিকে বেড়া ঘেঁষিয়া বসিয়া থাকে।

বিবাহ-বাড়ির আলোয় পশুপতির নিবিড় অন্ধকার রাত্রি আজ একটু আলো হইয়াছে। এতগুলি মানুষের দেহের উত্তাপ সে যেন অল্প-অল্প অনুভব করিতে পারিতেছে। নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে আজ পশুপতির একটু সজাগ মনে হয়। জীবনের ঘোলাটে অস্পষ্ট স্মৃতিগুলিও যেন খানিকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মানুষেব সঙ্গে পশুপতির আলাপ করিতে ইচ্ছা হয়। তার ডাইনে যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি নিঃশব্দে শুধু তামাক টানিতেছেন তার বুকে খোঁচা দিয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিতে সাধ যায় : মহাশয়ের নাম?

তারপর একটু হাসিয়া : আমার নাম আজ্ঞে পশুপতি ঘোষ দস্তিদার। এখানেই ইস্কুলে মাস্টারি করি, ভার্নাকুলার মাস্টার আজ্ঞে আমি। মেয়ের বাপ আমার বন্ধুপুত্রও বটে ছাত্রও বটে—বড়ো মানে আমাকে, বড়ো খাতির করে।

বসিয়া বসিয়া পশুপতি ঝিমায়। তার চোখ ঢুলিয়া ঢুলিয়া আসে। একসঙ্গে অতীতে ও বর্তমানে থাকিবার সাধ্য তার নাই বলিয়া, যখন সে অতীতের কথা ভাবে তখন এই বিবাহ-সভা তার কাছে মুছিয়া যায়, চারিদিকে আলো ও গণ্ডগোলে সে যখন এখানে ফিরিয়া আসে তখন অতীতকে তার মনে থাকে না। তাই চোখে পূর্ণ দৃষ্টি, দুকানে তীক্ষ্ণ শ্রবণ-শক্তি ও মুখে সুস্পষ্ট ভাষা লইয়া একদিন এমনি সভায় সে যে অভিনয় করিত তার এতটুকু নকলও করিতে পারে না।

তারপর একসময় সে সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়ে। কেহ অবাক হইয়া তার দিকে তাকায়, কেহ তার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে কেহ তাকাইয়াও দেখে না।

পশুপতির ঘুমের আড়ালে শ্রীমন্তের মেয়ে মুখীর বিবাহোৎসব চলিতে থাকে।

আত্মহত্যার অধিকার

বর্ষাকালেই ভয়ানক কষ্ট হয়।

ঘরের চালটা একেবারে ঝাঁঝরা হইয়া গিয়াছে।

কিছু নারিকেল আর লতা-পাতা মানসম্ভ্রম বজায় রাখিয়াই কুড়াইয়া সংগ্রহ করা গিয়াছিল। চালের উপর সেগুলি বিছাইয়া দিয়া কোনো লাভ হয় নাই। বৃষ্টি নামিলেই ঘরের মধ্যে সর্বত্র জল পড়ে।

বিছানাটা গুটাইয়া ফেলিতে হয়, ভাঙা বাক্‌সো-পেটরা কয়টা এ কোণে টানিয়া আনিতে হয়, জামা-কাপড়গুলি দড়ি হইতে টানিয়া নামাইয়া পুঁটলি করিয়া, কোথায় রাখিলে যে ভিজিবে কম, তাই নিয়া মাথা ঘামাইতে হয়।

বড়ো ছেলেটা কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে। আদর করিয়া তাহার কান্না থামানো যায় না, ধমক দিলে কান্না বাড়ে। মেয়েটা বড়ো হইয়াছে, কাঁদে না, কিন্তু ওদিকের দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া এমন করিয়াই চাহিয়া থাকে যে নীলমণির ইচ্ছা হয় চড় মারিয়া ওকেও সে কাঁদাইয়া দেয়। এতক্ষণ ঘুমাইবার পর একঘণ্টা জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইল বলিয়া ও কী চাহনি? আকাশ ভাঙিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে, ঘরের চাল সাতবছর মেরামত হয় নাই। ঘরের মধ্যে জল পড়াটা নীলমণির এমন কী অপরাধ যে মেয়েটা তাহাকে ও রকমভাবে নিঃশব্দে গঞ্জনা দিবে?

ছোটো ছেলেটাকে বুকের মধ্যে লুকাইয়া নিভা একবার এধার একবার ওধার করিয়া বেড়াইতেছিল।

হঠাৎ বলিল, ওগো, ছাতিটা একবার ধরো, একেবারে ভিজে গেল যে! লক্ষ্মী, ধরো একবার ছাতিটা খুলে, ওরও কি শেষে নিমুনিয়া হবে?

নীলমণি বলিল, হয় তো হবে। বাঁচবে।

নিভা বলিল, বালাই ষাট্‌—শ্যামা, তুইও তো ধরতে পারিস ছাতিটা একটু?

শ্যামা নীরবে ভাঙা ছাতিটা নিভার মাথার উপর ধরিল। ছাতি মেলিবার বাতাসে প্রদীপের শিখাটা কাঁপিয়া গেল। প্রদীপে তেল পুড়িতেছে। অপচয়! কিন্তু উপায় নাই। চাল-ভেদ করা বাদলে ঘর যখন ভাসিয়া যাইতেছে তখনকার বিপদে প্রদীপের আলোর একান্ত প্রয়োজন। জিনিসপত্র নিয়া মানুষগুলি এ কোণ-ও কোণ করিবে কেমন করিয়া?

এক ছিলিম তামাক দে শ্যামা। নীলমণি হুকুম দিল।

শ্যামা বলিল, ছাতিটা ধরো তবে?

নীলমণি আকাশের বজ্রের মতো ধমকাইয়া উঠিল, ফেলে দে ছাতি, চুলোয় গুঁজে দে। আমি ছাতি ধরব তবে উনি তামাক সাজবেন, হারামজাদি!

তামাক অবিলম্বেই হাতের কাছে আগাইয়া আসিল। ঘরের পশ্চিম কোণ দিয়া কলের জলের মতো মোটা ধারায় জল পড়িয়া ইতিমধ্যেই একটা বালতি ভরিয়া গিয়াছে। সেই জলে হাত ধুইয়া শ্যামা বলিল, তামাক আর একটুখানি আছে বাবা।

দুঃসংবাদ!

এত বড়ো দুঃসংবাদ-প্রদানকারিণীকে একটা গাল দিবার ইচ্ছা নীলমণিকে অতিকষ্টে চাপিয়া যাইতে হইল।

নীলমণি ভাবিল · বিনা তামাকে এই গভীর রাত্রির লড়াই জিতিব কেমন কবিয়া? ছেলের কান্না দুই কানে তিরের ফলার মতো বিঁধিয়া চলিবে, মেয়েটার মুখের চাহনি লঙ্কাবাটার মতো সারাক্ষণ মুখে লাগিয়া থাকিবে, নিমুনিয়ার সঙ্গে নিভার ব্যাকুল কলহ চাহিয়া দেখিতে দেখিতে শিহরিয়া শিহরিয়া মনে হইবে বাঁচিয়া থাকাটা শুধু আজ এবং কাল নয়, মুহূর্তে মুহূর্তে নিষ্প্রয়োজন,—আর ঘরে এখন তামাক আছে একটুখানি!

তামাক আনানো হয় নাই কেন জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া নীলমণি চুপ করিযা রহিল। প্রশ্ন করা অনর্থক, জবাব সে পরশু হইতে নিজেই সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে—পয়সা নাই। ছেলেটা বিকালে এক পয়সার মুড়ি খাইতে পায় নাই—তামাকের পয়সা কোথা হইতে আসিবে। নিজে গেলে হয়তো দোকান হইতে ধার আনিতে পাবিত,

কিন্তু—

নীলমণি খুশি হয। এতক্ষণে ছুতা পাওয়া গিয়াছে।

তামাক নেই বিকেলে বলিসনি কেন?

আমি দেখিনি বাবা।

দেখিনি বাবা! কেন দেখনি বাবা? চোখের মাথা খেয়েছিলে?

তুমি নিজে সেজেছিলে যে? সারাদিন আমি একবারও তামাক সাজিনি বাবা।

তা সাজবে কেন? বাপের জন্য তামাক সাজলে সোনার অঙ্গ তোমার ক্ষয়ে যাবে যে!

নীলমণির কান্না আসিতেছিল। মুখ ফিরাইয়া সহসা উদ্‌গত অশ্রু সে দমন করিযা লইল। না আছে তামাক না থাক। পৃথিবীতে তার কী-ই বা আছে যে তামাক থাকিলেই সব দুঃখ দূব হইয়া যাইত!

বাহিরে যেন অবিবল ধারে জল পড়িতেছে না, ঘরের বায়ু যেন সাহারা হইতে আসিযাছে, নীলমণিব চোখ-মুখ এত জ্বালা কবিতেছিল। খানিকক্ষণ হইতে তাহার হাঁটুর উপর বড়ো বড়ো ফোঁটায জল পড়িতেছিল—টপ্‌টপ। অঞ্জলি পাতিযা নীলমণি গুনিয়া গুনিয়া জলের ফোঁটাগুলি ধবিতে লাগিল। সিদ্ধ করা চামড়ার মতো ফ্যাকাশে ঠোঁট নাড়িয়া সে কী বলিল, ঘরের কেহই তাহা শুনিতে পাইল না। ছেলেমানুষের মতো তাহার জলেব ফোঁটা সঞ্চয় করাব খেলাটাও কেহ চাহিয়া দেখিল না। কিন্তু হাতে খানিকটা জল জমিলে তাই দিয়া মুখ ধুইতে গিয়া নীলমণি ধরা পড়িয়া গেল।

নিভা ও শ্যামা প্রতিবাদ কবিল দুজনেই।

শ্যামা বলিল, ও কী করছ বাবা?

নিভা বলিল, পচা গলা চাল-ধোয়া জল, হ্যাঁগো, ঘেন্নাও কি নেই তোমার?

নীলমণি হঠাৎ একটু হাসিযা বলিল, হোক না পচা জল। চাল-ধোয়া জল তো! এও হয়তো কাল জুটবে না নিভা!

ইহাকে সূক্ষ্ম রসিকতা মনে করিয়া নীলমণি নিজের মনে একটু গর্ব অনুভব করিল। এমন অবস্থাতেও রসিকতা করিতে পারে, মনের জোর তো তাহার সহজ নয়। ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলাইয়া আনিয়া নিভার মুখের দিকে পুনরায় চাহিতে গিয়া কিন্তু তাহার হাসি ফুটিল না। নিভার দৃষ্টির নির্মমতা তাহাকে আঘাত করিল।

অবিকল শ্যামার মতো চাহিয়া আছে! এত দুঃখ, এত দুর্ভাবনা ওর চোখের দৃষ্টিকে কোমল করিতে পারে নাই, উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতে পারে নাই, রূঢ় ভর্ৎসনা আর নিঃশব্দ অসহায় নালিশে ভরিয়া রাখিয়াছে।

নীলমণি মুষড়াইয়া পড়িল।

সব অপরাধ তাহার। সে ইচ্ছা করিয়া নিজের স্বাস্থ্য ও কার্যক্ষমতা নষ্ট করিয়াছে, খাদ্যের প্রাচুর্যে পরিতুষ্ট পৃথিবীতে নিজের গৃহকোণে সে সাধ করিয়া দুর্ভিক্ষ আনিয়াছে, ঘরের চাল পচাইয়া ফুটা করিয়াছে সে, তাহারই ইচ্ছাতে রাতদুপুরে মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছে। শুধু তাই নয়। ওদের সমস্ত দুঃখ দূর করিবার মন্ত্র সে জানে। মুখে ফিসফিস করিয়া হোক, মনে মনে নিঃশব্দে হোক, ফুস মন্তরটি একবার আওড়াইয়া দিলেই তাহার এই ভাঙা ঘর সরকারদের পাকা দালান হইয়া যায়, আর ঘরের কোনার ওই ভাঙা বাক্সোটা চোখের পলকে মস্ত লোহার সিন্দুক হইয়া ভিতরে টাকা ঝমঝম করিতে থাকে ;—টাকার ঝমঝমানিতে বৃষ্টির ঝমঝমানি কোনোমতেই আর শুনিবার উপায় থাকে না।

কিন্তু মন্ত্রটা সে ইচ্ছা করিয়া বলিতেছে না।

ঘণ্টাখানেক এমনিভাবে কাটিয়া গেল।

নিভা একসময় জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁগা, রাত কত?

তা হবে, দুটো তিনটে হবে।

একটা কিছু ব্যবস্থা কর? সারারাত জল না ধরলে এমনি বসে বসে ভিজব?

বসে ভিজতে কষ্ট হয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজো।

নিভা আর কিছু বলিল না। ছেঁড়া আলোয়ানটি দিয়া কোলের শিশুকে আরও ভালো করিয়া ঢাকিয়া রুক্ষ চুলের উপর খসিয়া-পড়া ঘোমটাটি তুলিয়া দিল। স্বামীর কাছে মাথায় কাপড় দেওয়ার অভ্যাস সে এখনও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।

ছাতি ধরিয়া আর দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া শ্যামা তার গা ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল, মধ্যে মধ্যে তার শিহরনটা নিভা টের পাইতে লাগিল।

কাঁপছিস কেন শ্যামা? শীত করছে?

শ্যামা কথা বলিল না। একটু মাথা নাড়িল মাত্র।

নিভা বলিল, তবে ভালো কবেই ছাতিটা ধর বাপু, খোকার গায়ে ছিটে লাগছে।

আঁচল দিয়া সে খোকার মুখ মুছিয়া লইল। ফিসফিস করিয়া আপন মনে বলিল, কত জন্ম পাপ করেছিলাম, এই তার শাস্তি। নীলমণি শুনিতে পাইল, কিন্তু কিছু বলিল না। মন তাহার সজাগ, নির্মমভাবে সজাগ, কিন্তু চোখের পাতা দিয়া দুই চোখকে সে অর্ধেক আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। দেখিলে মনে হয়, একান্ত নির্বিকার চিত্তেই সে ঝিমাইতেছে।

কিন্তু নীলমণি সবই দেখিতে পায়। তাহার স্তিমিত দৃষ্টিতে শ্যামার মুখ তেরচা হইয়া বাঁকিয়া যায়, প্রদীপের শিখাটা ফুলিয়া ফাঁপিয়া ওঠে, দেয়ালের গায়ে ছায়াগুলি সহসা জীবন পাইয়া দুলিয়া উঠিতে শুরু করে। মুখ না ফিরাইয়াই নীলমণি দেখিতে পায় ঘরের ও-কোণে গুটাইয়া রাখা বিছানার উপর উপুড় হইয়া নিমু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিরক্তির তাহার সীমা থাকে না। তাহার মনে হয় ছেলেটা তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। দুই পা মেঝের জলস্রোতে প্রসারিত করিয়া দিয়া আকাশের গলিত মেঘে অর্ধেকটা শরীর ভিজাইতে ভিজাইতে ওইটুকু ছেলের অমন করিয়া ঘুমাইয়া পড়ায় আর কী মনে হয়? এর চেয়ে ও যদি নাকি সুরে টানিয়া টানিয়া শেষ পর্যন্ত কাঁদিতে থাকিত তাও নীলমণির ভালো ছিল। এ সহ্য হয় না। সন্ধ্যায় ও পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই, ক্ষুধার জ্বালায় মাকে বিরক্ত করিয়া পিঠের জ্বালায় চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ঘুমাইয়াছিল। হয়তো ওর রূপকথার পোষা বিড়ালটি এই বাদলে রাজবাড়ির ভালো ভালো খাবার ওকে চুরি করিয়া আনিয়া দিতে পারে নাই। হয়তো ঘুমের

মধ্যেই ওর গালে চোখের জলের শুকনো দাগ আবার চোখের জলে ভিজিয়া গিয়াছিল। এত রাত্রে দুঃখের এই প্রকৃত বন্যায় ভাসিতে ভাসিতে ও তবে ঘুমায় কোন হিসাবে?

নিমুকে তুলে দে তো শ্যামা।

নিভা প্রতিবাদ করিয়া বলিল, কেন, তুলবে কেন? ঘুমোচ্ছে ঘুমোক।

ঘুমোচ্ছে না ছাই। ইয়ার্কি দিচ্ছে। ঢং করছে!

হ্যাঁ, ইয়ার্কি দিচ্ছে! ঢং করছে! যেমন কথা তোমার! ঢং করার মতো সুখেই আছে কি না।

আধ-ঢাকা চোখ নীলমণি একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলিল। ওরা যা খুশি করুক, যা খুশি বলুক। সে আর কথাটি কহিবে না।

খানিক পরে নিভা বলিল, দেখো, এমন করে আর তো থাকা যায় না। সরকারদের বাইরের ঘরটাতে উঠিগে চলো।

নীলমণি চোখ না খুলিয়াই বলিল, না।

নিভা রাগ করিয়া বলিল, তুমি যেতে না চাও থাকো, আমি ওদের নিয়ে যাচ্ছি।

নীলমণি চোখ মেলিয়া চাহিল।

না—যেতে পাবে না। ওরা ছোটোলোক। সেবার কী বলেছিল মনে নেই?

বললে আর করছ কী শুনি? রাতদুপুরে বিরক্ত করলে অমন সবাই বলে থাকে।

নীলমণি ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, বলে থাকে? রাতদুপুরে বিপদে পড়ে মানুষ আশ্রয় নিতে গেলে বলে থাকে,—এ কী জ্বালাতন? ওইটুকু শিশুর জন্য একটু শুকনো ন্যাকড়া চাইলে বলে থাকে কাপড়-জামা সব ভিজে। ময়লা হবার ভয়ে ফরাশ তুলে নিয়ে ছেঁড়া শতরঞ্চি অতিথিকে পেতে দেয়? যেতে হবে না। বাস্।

নিভা অনেক সহ্য করিয়াছে। এবার তাহার মাথা গরম হইয়া গেল।

ছেলেমেয়ে বউকে বর্ণাবাদলে মাথা গুঁজবার ঠাঁই দিতে পারে না, অত মান-অপমান জ্ঞান কী জন্যে? আজ বাদে কাল ভিক্ষে করতে হবে না?

নীলমণি বলিল, চুপ।

এক ধমকেই নিভা অনেকখানি ঠান্ডা হইয়া গেল।

চুপ করেই আছি চিরটা কাল। অন্য মানুষ হলে—

হাতের কাছে, ঘটিটা তুলিয়া লইয়া নীলমণি বলিল, চুপ। একদম চুপ। আর একটি কথা কইলে খুন করে ফেলব।

কথা কেউ বলছ না। নিভা একেবারে নিবিয়া গেল।

শ্যামা ঢুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, বাপের গর্জনে সে চমকাইয়া সজাগ হইয়া উঠিল। কান পাতিয়া শুনিয়া বলিল, মা ভুলু দরজা আঁচড়াচ্ছে।

গরিবের মেয়ে, হা-ঘরের বউ, নিভার মেরুদণ্ড বলিতে কিছু অবশিষ্ট ছিল না, কিন্তু তার বদলে যা ছিল নিরপরাধ মেয়ের উপর ঝাঁঝিয়া উঠিবার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

আঁচড়াচ্ছে তো কী হবে? কোলে তুলে নিয়ে এসে নাচো!—ভালো করে ছাতি ধরে থাক শ্যামা, মেরে পিঠের চামড়া তুলে দেব!

নীলমণি বলিল, আমার লাঠিটা কই রে?

শ্যামার মুখ পাংশু হইয়া গেল। সে মিনতি করিয়া বলিল, মেরো না বাবা। দরজা না খুললে ও আপনিই চলে যাবে।

তোকে মাতব্বরি করতে হবে না, বুঝলি? চুপ করে থাক।

বাঁ পাটি আংশিকভাবে অবশ, হাতে ভর দিয়া নীলমণি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের কোনায় তাহার মোটা বাঁশের লাঠিটি ঠেস দেওয়া ছিল, খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গিয়া লাঠিটি সে আয়ত্ত করিল। উঠানবাসী লোমহীন নির্জীব কুকুরটার উপর তাহার সহসা এত রাগ হইয়া গেল কেন কে জানে। বেচারি খাইতে পায় না, কিন্তু প্রায়ই অদৃষ্টে প্রহার জোটে, তবু সে এখানেই পড়িয়া থাকে, সারারাত শিয়াল তাড়ায়। শ্যামা একটু করুণার চোখে না দেখিলে এতদিনে ওর অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়া যাইত। কিন্তু নীলমণি কুকুরটাকে দেখিতে পারে না। ধুঁকিতে ধুঁকিতে লাথি-ঝাঁটা খাইয়া মৃত্যুর সঙ্গে ওর লজ্জাকর সকরুণ লড়াই চাহিয়া দেখিয়া তাহার ঘৃণা হয়, গা জ্বালা করে।

শ্যামা আবার বলিল, মেরো না বাবা, আমি তাড়িয়ে দিচ্ছি।

নীলমণি দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, মারব? মার খেয়ে আজ রেহাই পাবে ভেবেছিস? আজ ওর ভবযন্ত্রণা দূর করে ছাড়ব।

ভবযন্ত্রণা নিঃসন্দেহ, কিন্তু শ্যামা শুনিবে কেন? পেটের ক্ষুধায় এখনও তাহার কান্না আসে, ছেঁড়াকাপড়ে তাহার সর্বাঙ্গ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, তাহার বুকে ভাষা আছে, মনে আশা আছে, ভবযন্ত্রণা সহ্য করিতে তাহার শক্তির অকুলান হয় না, বরং একটু বাড়তিই হয়। ওইটুকু শক্তি দিয়া সে [illegible] জীবন হইতেও রস নিংড়াইয়া বাহির করে,—হোক পানসা, এও তুচ্ছ নয়। ভুলুর মতো কুকুরটিরও মরিবার অথবা তাহাকে মারিবার কল্পনা শ্যামার কাছে বিষাদের ব্যাপার। তাহার সহ্য হয় না।

ছাতি ফেলিয়া উঠিয়া আসিয়া শ্যামা নীলমণির লাঠি ধরিল। কাঁদিবার উপক্রম করিয়া বলিল, না বাবা, মেরো না বাবা, তোমার পায়ে পড়ি বাবা।

নীলমণি গর্জন করিয়া বলিল, লাঠি ছাড় শ্যামা, ছেড়ে দে বলছি! তোকেই খুন করে ফেলব আজ!

শ্যামা লাঠি ছাড়িল না। তারও কি মাথার ঠিক আছে? লাঠি ধরিয়া রাখিয়াই সে বারবার নীলমণির পায়ে পড়িতে লাগিল।

নিভা বলিল, কী জিদ মেয়ের! ছেড়েই দে না বাবু লাঠিটা।

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে নীলমণি বলিল, জিদ বার করছি!

লাঠিটা নীলমণিকে মেয়ের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইল ; কিন্তু বেড়ার ঘরের বেড়ার অনেকগুলি বাতাই আলগা ছিল।

মেয়েকে মারিয়া নীলমণির মন এমন খারাপ হইয়া গেল বলিবার নয়। না মারিয়া অবশ্য উপায় ছিল না। ও রকম রাগ হইলে সে কখনও সামলাইতে পারে নাই, কখনও পারিবেও না। মন খারাপ হওয়ার কারণটাও হয়তো ভিন্ন! কে বলিতে পারে? মেয়েকে না মারিয়াও তো মাঝে মাঝে তার মরিতে ইচ্ছা করে।

জীবনে লজ্জা, দুঃখ, রোগ, মৃত্যু, শোকের তো অভাব নাই। মন খারাপ হইবার, দশ বছর জ্বর ভোগ করিয়া যেমন হয় তেমনি মন খারাপ হইবার কারণ জাগিয়া থাকার প্রত্যেকটি মুহূর্তে এবং ঘুমানোর সময় দুঃস্বপ্নে।

কয়েক মিনিট আগে বৃষ্টি একটু ধরিয়া আসিয়াছিল ; হঠাৎ আবার আগের চেয়েও জোরে আরম্ভ হইয়া গেল। নীলমণির মান-অপমান জ্ঞানটা এবার আর টিকিল না।

লণ্ঠনে তেল আছে শ্যামা।

শ্যামা একবার ভাবিল, চুপ করিয়া থাকিয়া রাগ আর অভিমান দেখায়। কিন্তু সাহস পাইল না।

একটুখানি আছে বাবা।

জ্বাল তবে।

নিভা জিজ্ঞাসা করিল, লণ্ঠন কী হবে?

সরকারদের বাড়ি যাব। ফের চেপে বৃষ্টি এল দেখছ না?

যেন সরকাবদের বাড়ি যাইতে নিভাই আপত্তি করিয়াছিল।

শ্যামা বলিল, দেশলাই কোথা রাখলে মা?

নিভা বলিল, দেশলাই? কেন, পিদিম থেকে বুঝি লণ্ঠন জ্বালানো যায় না? চোখের সামনে পিদিম জ্বলছে, চোখ নেই?

নীলমণি বলিল, ওব কি জ্ঞান-গম্মি কিছু আছে?

নিজের মুখের কথাগুলো খচখচ কবিয়া মনের মধ্যে বেঁধে! এ যেন তোতাপাখির মতো অভাবগ্রস্তের মানানসই মুখস্থ বুলি আওড়ানো। বলিতে হয় তাই বলা; না বলিলে চলে না সত্য; কিন্তু আসলে বলিযা কোনো লাভ নাই।

সাত বছরেব পুরানো লণ্ঠন জ্বালানো হইল।

নিভা মাথা নাড়িয়া বলিল, না বাপু, ছাতিতে আটকাবে না। আর একখানা কাপড় জড়িয়েনি। দে তো শ্যামা, শুকনো কিছু দে তো। আর এক কাজ কব—দুটো তিনটে কাপড় পুঁটলি কবে নে। ওখানে গিয়ে সব্বাইকে কাপড় ছাড়তে হবে। আমার দোক্তার কৌটো নিস।

নীলমণি একটু মিষ্টি করিয়াই বলিল, হুঁকোটা নিতে পারবি শ্যামা? লক্ষ্মী মা-টি আমার,—পারবি? জল ফেলেই নে না, ওখানে গিয়ে ভরে নিলেই হবে। জলেব কী অভাব!—আমাকটুকু ফেলে যাসনে ভুলে।

সব ব্যবস্থাই হইল, নিমুব কান্নায় কর্ণপাত না করিয়া তাকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া দাঁড করাইযা দিয়া পিঠে একটা ছেঁড়া চটেব বস্তা চাপাইয়া দেওয়া হইল।

দরজা খুলিযা তাবা উঠানে নামিয়া গেল। উত্তরের ভিটার ঘরখানা গত বৎসরও খাড়া ছিল, এবারকার চতুর্থ বৈশাখী ঝড়ে পড়িয়া গিয়াছে; সময়মতো অন্তত দুটি খুঁটি বদলাইতে পারিলেও এটা ঘটিত না। ভুলু বোধ হয় ওই ভগ্নস্তূপটির মাঝেই কোথাও মাথা গুঁজিয়া ছিল, মানুষের সাড়া পাইয়া বাহির হইযা আসিল। তখন ঘরের দরজায় তালা লাগানো হইয়া গিয়াছে। দরজা আঁচড়াইয়া ভুলু সকরুণ কান্নার সঙ্গে কুকুরের ভাষায় বলিতে লাগিল, দরজা খোলো দরজা খোলো।

বাড়ির সামনে একহাঁটু কাদা, তার পরেই পিছল এঁটেল মাটি। ছেলে লইয়া আছাড় খাইতে খাইতে বাঁচিয়া গিয়া নিভা দেবতাকেই গাল দিতে আরম্ভ করিয়া দিল। কষ্ট নীলমণিরই বেশি, শুকনো ডাঙাতেই বাঁ পায়ের পদক্ষেপটি তাকে চট করিয়া ডিঙাইয়া যাইতে হয়,—এখন তার পা আর লাঠি দুই-ই কাদায় ঢুকিয়া যাইতে লাগিল।

লাঠি টানিয়া তুলিলে পা আটকাইয়া থাকে, পা তুলিলে লাঠি পোঁতা হইয়া যায়। নিভার তাকাইবার অবসর নাই। শ্যামার ঘাড়ে কাপড়ের পুঁটলি, হুঁকা-কলকি, লণ্ঠন আর নিমুর ভার। তবু শ্যামাই নীলমণির বিপদ উদ্ধার করিয়া দিতে লাগিল।

ঘোষেদের পুকুরটা পাক দিলে সরকারদের বাড়ি। পুকুরটা ভরিয়া গিয়া পাড় ছাপাইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম কোনাব প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছটার তল দিয়া তিন-চার হাত চওড়া এক সংক্ষিপ্ত স্রোতস্বিনী

সৃষ্টি হইয়াছে। তেঁতুল গাছটাব জমকালো আবছা চেহারা দেখিলে গা ছমছম করে। ভরপুর পুকুরের বুকে শ্যামার হাতের আলো যে লম্বা সোনালি পাত ফেলিয়াছে, প্রত্যেক মুহূর্তে হাজার বৃষ্টির ফোঁটায় তাহা অজস্র টুকরায় ভাঙিয়া যাইতেছে।

নীলমণি থমকিয়া দাঁড়াইল। কাতর স্বরে বলিল, ও শ্যামা, পার হব কী করে!

শ্যামা বলিল, জল বেশি নয় বাবা, নিমুর হাঁটু পর্যন্তও ওঠেনি। চলে এসো।

সুখের বিষয় স্রোতের নীচে কাদা ধুইয়া গিয়াছিল, নীলমণির পা অথবা লাঠি আঁটিয়া গিয়া তাহাকে বিপন্ন করিল না। তবু, এতখানি সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও, নীলমণির দুচোখ একবার সজল হইয়া উঠিল। বাহির হওয়ার সময় সে কাপড়টা গায়ে জড়াইয়া লইয়াছিল, এখন ভিজিয়া গায়ের সঙ্গে আঁটিয়া গিয়াছে। খানিকক্ষণ হইতে জোর বাতাস উঠিয়াছিল, নীলমণির শীত করিতে লাগিল। জগতে কোটি কোটি মানুষ যখন উষ্ণ শয্যায় গাঢ় ঘুমে পাশ ফিরিয়া পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিতেছে,—সপরিবারে অক্ষম দেহটা টানিয়া টানিয়া সে তখন চলিয়াছে কোথায়? যে প্রকৃতির অত্যাচারে ভাঙা ঘরে টিকিতে না পারিয়া তাহাকে আশ্রয়ের খোঁজে পথে নামিয়া আসিতে হইল, সেই প্রকৃতিরই দেওয়া নির্মমতায় হয়তো সরকাররা দরজা খুলিবে না, ঘুমের ভান করিয়া বিছানা আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে। না, নীলমণি আর যুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তাহার শক্তি নাই, কিন্তু আক্রমণ চারিদিক হইতে ; পেটের ক্ষুধা, দেহের ক্ষুধা, শীত বর্ষা, রোগ, বিধাতার অনিবার্য জন্মের বিধান,—সে কোন দিক সামলাইবে? সকলে যেখানে বাঁচিতে চায়, লাখো মানুষের জীবিকা একা জমাইতে চায়, কিন্তু কাহাকেও বাঁচাইতে চায় না, সেখানে সে বাঁচিবে কীসের জোরে?

স্রোত পার হইয়া গিয়া লণ্ঠনটা উঁচু করিয়া ধরিয়া শ্যামা দাঁড়াইয়া আছে। পাশেই ভরাট পুকুরটা বৃষ্টির জলে টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। নীলমণি সাঁতার জানিত না। কিন্তু জানিত যে পুকুরের পাড়টা এখানে একেবারে খাড়া। একবার গড়াইয়া পড়িলেই অথই জল, আর উঠিয়া আসিতে হইবে না।

নিভা তাড়া দিতেছিল। শ্যামা বলিল, বাবা, চলে এসো। দাঁড়ালে কেন?

নীলমণি চলিতে আরম্ভ করিল, ডাইনে নয় বাঁয়েও নয়। সাবধানে, সোজা শ্যামার দিকে।

হঠাৎ শ্যামা চিৎকার করিয়া উঠিল, মাগো, সাপ!

পরক্ষণে আনন্দে গদগদ হইয়া বলিল, সাপ নয় গো সাপ নয়, মস্ত শোল মাছ! ধরেছি ব্যাটাকে। ইঃ, কী পিছল!

তাড়াতাড়ি আগাইবার চেষ্টা করিয়া নীলমণি বলিল, শক্ত করে ধর, দুহাত দিয়ে ধর,—পালালে কিন্তু মেরে ফেলব শ্যামা!

সরকাররা বছর তিনেক দালান তুলিয়াছে। এখনও বাড়িসুদ্ধ সকলে বাড়ি বাড়ি করিয়া পাগল। বলে, বেশ হয়েছে, না? দোতলায় দুখানা ঘর তুললে, বাস্, আর দেখতে হবে না।

অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর সরকারদের বড়োছেলে বাহিরের ঘরের দরজা খুলিল। বলিল, ব্যাপার কী? ডাকাত নাকি?

নীলমণি বলিল, না ভাই, আমরা। ঘরে তো টিকতে পারলাম না ভায়া, সব ভেসে গেছে, ভাবলাম, তোমাদের বৈঠকখানায় তো কেউ শোয় না, রাতটুকু ওখানেই কাটিয়ে আসি।

বড়োছেলে বলিল, সন্ধ্যাবেলা এলেই হত!

নীলমণি কষ্টে একটু হাসিল : সন্ধ্যায় কি বৃষ্টি ছিল ভাই! দিব্যি ফুটফুটে আকাশ—মেঘের চিহ্ন নেই। রাতদুপুরে হঠাৎ জল আসবে কে জানত।

নিভা ছাতি বন্ধ করিয়া ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মাসিকের ছবির সদ্যস্নাতার অবস্থায় পড়িয়া শ্যামা লজ্জায় মার অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। নিভার এটা ভালো লাগিতেছিল না। কিন্তু বড়োছেলের সামনে কিছু বলিবার উপায় নাই।

বড়োছেলে বলিল, বেশ থাকুন। কিন্তু চৌকি পাবেন না, চৌকিতে আমার পিসে শুয়েছে। আপনাদের মেঝেতে শুতে হবে।

তা হোক ভাই, তা হোক। ভিজতে না হলেই ঢের। একখানা কম্বলটম্বল?

ওই কোণে চট আছে।

বড়োছেলে বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল।

নীলমণি ঝাঁঝালো হাসি হাসিয়া বলিল, দেখলে? তখনি বলেছিলাম শুধু জুতো মারতে বাকি রাখবে!

নিভা বলিল, ঘরে যে থাকতে দিয়েছে তাই ভাগ্যি বলে জেনো।

নীলমণি তৎক্ষণাৎ সুর বদলাইয়া বলিল, তা ঠিক।

ঘরে অর্ধেকটা জুড়িয়া চৌকি পাতা, বড়োছেলের পিসে আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়া তাহাতে কাত হইয়া শুইয়া আছে। শ্যামা লণ্ঠনটা মেঝেতে নামাইয়া রাখিয়াছিল বলিয়া চৌকির উপরে আলো পড়ে নাই, তবু এ বাড়ির আত্মীয়কেও ফরাশ তুলিয়া লইয়া শুধু শতরঞ্চির উপরে শুইতে দেওয়া হইয়াছে, এটুকু টের পাইয়া নীলমণি একটু খুশি হইল। বড়োছেলের পিসে।— আপনার লোক। সে যদি ও রকম ব্যবহার পাইয়া থাকে তবে তাহারা যে লাথি-ঝাঁটা পায় নাই, ইহাই আশ্চর্য।

চারিদিকে চাহিয়া নীলমণির খুশির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল। সুখশয্যা না জুটুক, নিরাপদ, শুষ্ক মনোরম আশ্রয় তো জুটিয়াছে। ঘরের এদিকে একটিমাত্র ছোটো জানালা খোলা ছিল, নিভা ইতিমধ্যেই সেটি ভালো করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বাস্, বাহিরের সঙ্গে আর তাদের কোনো সম্পর্ক নাই। আকাশটা আজ একরাত্রেই গলিয়া নিঃশেষ হইয়া যাক, ঝড় উঠুক, শিল পড়ুক, পৃথিবীর সমস্ত খড়ের ঘরগুলি ভাঙিয়া পড়ুক,—তাহারা টেরও পাইবে না।

নীলমণির মেজাজ যেন ম্যাজিকে ঠান্ডা হইয়া গিয়াছে। তাহার কণ্ঠস্বর পর্যন্ত মোলায়েম শোনাইল।

ও শ্যামা, দাঁড়িয়ে থাকিসনি মা, চটগুলো বিছিয়ে দে চট করে। একটু গড়াই। আহা, ভিজে কাপড়টা ছেড়েই নে আগে, মারামারির কী আছে। এতক্ষণই গেল না হয় আরও খানিকক্ষণ যাবে। ওগো, শুনছ? দাও না, খোকাকে চৌকির একপাশেই একটু শুইয়ে দাও না, দিয়ে তুমিও কাপড়টা ছেড়ে ফ্যালো। গলা নামাইয়া ফিসফিস করিয়া, ভদ্রলোক ঘুমোচ্ছেন, অত লজ্জাটা কীসের শুনি? লজ্জা করে দরজা খুলে বারান্দায় চলে যাও না!

কাপড় ছাড়া হইল। বাহিরে এখন পুরাদমে ঝড় উঠিয়াছে। ঘরের কোথাও এতটুকু ছিদ্র নাই, কিন্তু বাতাসের কান্না শোনা যায়। চাপা একটানা শাঁ শাঁ শব্দ। তাদের,—নীলমণি আর তার পরিবারকে, নাগালের মধ্যে না পাইয়া প্রকৃতি যেন ফুঁসিতেছে।

নীলমণির মনে হইল, এ একরকম শাসানো। পঞ্চভূতের মধ্যে যাহার ভাষা আছে সে ক্রুদ্ধ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছে, আজ বাঁচিয়া গেলে। কিন্তু কাল? কাল কী করিবে? পরশু? তার পরদিন? তারও পরের দিন?

শ্যামা চট বিছাইতেছিল, বলিল, মাগো কী গন্ধ!

নিভা বলিল, নে ঢং করতে হবে না, তাড়াতাড়ি কর।

নীলমণি বলিল, ঝেড়ে ঝেড়ে পাত না।

নিভা বলিল, না না, ঝাড়িসনি! ধুলোয় চাদ্দিক অন্ধকার হয়ে যাবে।

নিভা ছেলেকে স্তন দিতেছিল, কথাটা শেষ করিয়াই সে দমক মারিয়া চৌকির দিকে পিছন করিয়া বসিল।

নীলমণি চাহিয়া দেখিল, বড়োছেলের পিসে চাদর ফেলিয়া চৌকিতে উঠিয়া বসিয়াছে। লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয় পিসের মূর্তি দেখিয়া নীলমণি শিহরিয়া উঠিল। একটা শব যেন সহসা বাঁচিয়া উঠিয়াছে। মাথার চুল প্রায় ন্যাড়া করিয়া দেওয়ার মতো ছোটো ছোটো করিয়া ছাঁটা, চোখ যেন মাথার অর্ধেকটা ভিতরে চলিয়া গিয়াছে, গালের ঢিলা চামড়ার তলে হাড় উঁচু হইয়া আছে। বুকের সবগুলি পাঁজর চোখ বুজিয়া গোনা যায়। বুকের বাঁপাশে কী ঠিক চামড়ার নীচেই হৃৎপিণ্ডটা ধুকধুক করিতেছে।

পিসে নিশ্বাসের জন্য হাঁপাইতেছিল। খানিকপরে ক্ষীণস্বরে বলিল, একটা জানলা খুলে দিন।

নীলমণি সভয়ে বলিল, দে তো শ্যামা, জানালাটা খুলে দে।

শ্যামা আরও বেশি ভয়ে ভয়ে বলিল, ঝড় হচ্ছে যে বাবা!

হোক, খুলে দে।

শ্যামা পশ্চিমের ছোটো জানালাটি খুলিয়া দিল। ঝড় পুবদিক হইতে বহিতেছিল, মাঝে মাঝে এলোমেলো একটু বাতাস আর ছিঁটে-ফোঁটা একটু বৃষ্টি ঘরে ঢোকা ছাড়া জানালাটি খুলিয়া দেওয়ায় বিশেষ কোনো মারাত্মক ফল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ভীরু নিভা ছেলের গায়ে আর এক পরত কাপড় জড়াইয়া দিল।

পিসে বলিল, ঘুমের ঘোরে কখন চাদর মুড়ি দিয়ে ফেলেছি, আর একটু হলেই দম আটকাত! বাপ!

নীলমণি জিজ্ঞাসা করিল, আপনার অসুখ আছে নাকি?

পিসে ভর্ৎসনার চোখে চাহিয়া বলিল, খুব মোটা-সোটা দেখছেন বুঝি? অসুখ না থাকলে মানুষের এমন চেহারা হয়? চার বচ্ছর ভুগছি মশায়, মরে আছি একেবারে। যম ব্যাটাও কানা, এত লোককে নিচ্ছে আমায় চোখে দেখতে পায় না। যে কষ্টটা পাচ্ছি মশায়, শত্রুও যেন--

ব্যারামটা কী?

পিসে রাগিয়া বলিল, টের পান না? এমন করে শ্বাস টানছি দেখতে পান না? পাবেন কেন, আপনার কী! যার হয় সে বোঝে।

বোঝা গেল, পিসের মেজাজটা খিটখিটে।

নীলমণি নম্রভাবে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, আহা সেরে যাবে, ভালো মতো চিকিচ্ছে হলেই সেরে যাবে।

পিসে বলিল, হুঁ, সারবে। আমকাঠের তলে গেলে সারবে। চিকিচ্ছের কি আর কিছু বাকি আছে মশায়? ডাক্তার কবরেজ জলপড়া কিচ্ছুটি বাদ যায়নি। আজ চার বছর ডাঙায়-তোলা মাছের মতো খাবি খাচ্ছি, কোনো ব্যাটা সারাতে পারল!

কথার মাঝে মাঝে পিসে হাপরের মতো শ্বাস টানে, এক একবার থামিয়া গিয়া ডাঙায় তোলা মাছের মতোই চোখ কপালে তুলিয়া খাবি খায়। নীলমণির গায়ে কাঁটা দিতে লাগিল। বাতাস! পৃথিবীতে কত বাতাস! তবুও ফুসফুস ভরাইতে পারে না। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে সে উপবাসী, পঞ্চাশ মাইল গভীর বায়ুস্তরে ডুবিয়া থাকিয়া ওর দম আটকাইল।

পিসে বলিল, কী করে জানেন? বলে, ভয় কী, সেরে যাবে। বলে, সবাই টাকা নেয় চিকিৎসে করে, শেষে বলে, না বাপু, তোমার সারবে না। এ সব ব্যারাম সারে না। আমি বলি ওরে চোর ডাকাত ছুঁচোর দল! সারাতে পারবি না তো মেরে ফ্যাল, দে মরবার ওষুধ দে।

উত্তেজনায় পিসে জোরে জোরে হাঁপাইতে লাগিল। নীলমণি কথা বলিল না, তাহার বিনিদ্র আরক্ত চোখ দুটি কেবলই মিটমিট করিয়া চলিল।

তেল কমিয়া আসায় আলোটা দপদপ করিতেছে, এখনই নিবিয়া যাইবে। ছেলেকে বুকে জড়াইয়া হাতকে বালিশ করিয়া নিভা দুর্গন্ধ ছেঁড়া চটে কাত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। শ্যামা বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে।

নীলমণির হুঁকা-কলকি শ্যামা জানালায় নামাইয়া রাখিয়াছিল। আলোটা নিবিয়া যাওয়ার আগে নীলমণি বাকি তামাকটুকু সাজিয়া লইল। তারপর ঠেস দিয়া আরাম করিয়া পিসের শ্বাস টানার মতো শাঁ শাঁ শব্দ করিয়া জলহীন হুঁকায় তামাক টানিতে লাগিল।